মুনতাসীর মামুন

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ

স্বত্ব
মিসবাহউদ্দিন মুনতাসীর

সনিকে—৮৯

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৯২
ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬

প্রকাশক
পরিচালক
সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র
রুম ১১০৭, কলাভবন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা—২

মুদ্রক
কাজী মুকুল
ডানা প্রিন্টার্স
জি. পি. গ—১৬ মহাখালী
ঢাকা—১২
দূরালাপনী ৬০২০১৯

প্রচ্ছদ
কাজী হাসান হাবিব

মূল্য ঃ একশো টাকা

পরিবেশক
ডানা পাবলিশার্স
৩৬, বাংলাবাজার (দোতালা)
ঢাকা—১

বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের অনুরোধে প্রাপ্ত বি সি আই সি-এর খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলে উৎপাদিত হ্রাসকৃত মূল্যের 'লেখক' কাগজে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

আমার দাদা

মরহুম আশেক আলী খান

আমার নানা

মরহুম এ, কে, এম, ইরমানুল হক

এই বই যাঁরা দেখে যেতে চেয়েছিলেন

সূচীপত্র

ভূমিকা ১

পূর্ববঙ্গ ঃ চিহ্নিত করণ ১৯

ঔপনিবেশিক সমাজ গঠন
ও শ্রেণী বিন্যাস ৭১

সামাজিক আন্দোলন : প্রতিক্রিয়া ১৪৪

জনমত ঃ সংবাদপত্র ও সভাসমিতির
উদ্ভব ও বিকাশ ২৩৬

উপসংহার ৩০০

পরিশিষ্ট ১ ৩০৪

পরিশিষ্ট ২ ৩০৬

পরিশিষ্ট ৩ ৩০৮

গ্রন্থপঞ্জী ৩১০

নির্ঘন্ট ৩২৭

সংকেত-সূচী

ASDD	*Agricultural Report of the Dacca District* (A C. Sen), Calcutta, 1885.
CENSUS	*Census of India.*
FPRPBA	*Further Papers Relating to the Reconstruction of the Provinces of Bengal and Assam*, London, 1905.
IESS	David L. Sills (ed), *International Encyclopaedia of Social Science*, Vol V&VI, New York, 1972.
JSS	*Journal of Social Studies.*
RNP	*Report on Native Papers.*

মুখবন্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি ডিগ্রীর জন্যে অনুমোদিত অভিসন্দর্ভ 'পূর্ববঙ্গের সমাজ জীবনের কয়েকটি দিক : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৮৫৭-১৯০৫)'-এর সংশোধিত রূপ বর্তমান গ্রন্থ 'উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ।' এর রচনাকাল ১৯৮০-৮২।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে এবং বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশের সময় আমি আমার বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন, এবং সহকর্মীদের সহযোগিতা পেয়েছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিসন্দর্ভ রচনায় আমাকে ঢাকার গ্রন্থগার-সমূহ, যেমন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং বাংলা একাডেমীর শহীদুল্লা পাঠকক্ষের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। তবে স্বল্প সময়ের জন্যে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী এণ্ড রেকর্ডস, ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী এবং কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরী ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে উপকৃত হয়েছি। উপরোক্ত গ্রন্থাগারসমূহের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীরা সব সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি তাঁদের সবার কাছে ঋধিত। তবে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার গবেষণা নির্দেশক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এ, এফ, সালাহ্উদ্দিন আহমদের কাছে যিনি শুরু থেকেই এ বিষয়ে কাজ করার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন এবং যুগিয়েছিলেন উৎসাহ। এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের কাছে যিনি অভিসন্দর্ভ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর উপদেশ, উৎসাহ ব্যতিরেকে এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হত বলে মনে হয় না।

বর্তমান গ্রন্থের বেশ কিছু অংশ বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা', 'এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা', 'সমাজ নিরীক্ষণ' এবং 'সাহিত্য পত্র' এ। চতুর্থ অধ্যায়ের একটি অংশের

বিস্তৃতরূপ ১৯৮৪ সালে 'উনিশ শতকে পূর্ব বাংলার সভা সমিতি' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। অপর অংশের বিস্তৃত রূপ 'উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র' নামে ছ'খণ্ডে প্রকাশের ভার নিয়েছে বাংলা একাডেমী যার প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে গত বছর। তবুও বর্তমান গ্রন্থে এ অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ত ভাবে উপস্থাপিত করা হল গ্রন্থের সামগ্রিকতা রক্ষার জন্য। উৎসাহী পাঠক বিস্তৃত আলোচনার জন্য উল্লিখিত গ্রন্থ দু'টি দেখতে পারেন।

বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্রকে ধন্যবাদ জানাই। ডানা প্রেসের কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে এ ফেব্রুয়ারীতে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হত না। বইয়ের নির্ঘন্ট তৈরি করে দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গবেষণা সহকারী জনাব মোঃ মইজউদ্দিন খান। তাঁরা সবাই ধন্যবার্দাহ।

কোন গ্রন্থই নিখুঁত নয়। বর্তমান গ্রন্থতো নয়ই। ভবিষ্যতে কোন গবেষক হয়ত আরো সুষ্ঠুভাবে এ কাজ সম্পন্ন করবেন। সে আশায় রইলাম।

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৮৬

মুনতাসীর মামুন

ভূমিকা

ক. সামাজিক ইতিহাস

সামাজিক ইতিহাসের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দেয়া দুরূহ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামাজিক ইতিহাসের ভিত্তি বিবরণ বা বর্ণনা। অবশ্য, সামাজিক ইতিহাসের সংজ্ঞা ও পরিসর নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। সামাজিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন, সমাজের জীবন ও সংস্কৃতির বিবরণই সামাজিক ইতিহাসের উদ্দেশ্য। অনেকে আবার এর পরিধি আরো সংকীর্ণ করে দৈনন্দিন জীবন, সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান (ইন্স্টিটিউশন), রীতিনীতি, দৃষ্টিভঙ্গী এবং শিল্পকলার মধ্যে সীমিত রেখেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ইতিহাস নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আরো জটিলতার।[১]

সামাজিক ইতিহাস, হবসবমের ভাষায়, নির্দিষ্ট কোন একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে না। এবং এর বিষয়বস্তুও কোনভাবে অন্যকোন বিষয় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা সম্ভব নয়, এর ব্যাপ্তি এবং পরিধি বিশাল। যেমন, একজন অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকের কাছে একজন কবির বিশেষ কোন কবিতা হয়ত গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু একজন সামাজিক ঐতিহাসিকের কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ।[২]

পাশ্চাত্যে, এতোদিন তিন ধরনের কাজকে প্রধানতঃ সামাজিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করা হত। এক, গরীব জনসাধারণের ইতিহাস, দুই, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার বা দৈনন্দিন জীবনের চিত্র এবং তিন অর্থনীতির মিশ্রণে তৈরী এক ধরনের সমাজ চিত্র। আসলে ১৯৫০-এর পূর্বে, হবসবমের ভাষায়, পাশ্চাত্যেও সামাজিক ইতিহাস নিয়ে তেমন কোন চিন্তা ভাবনা হয় নি। সুতরাং একাডেমিক বিষয় হিসেবে, সামাজিক ইতিহাস তুলনামূলকভাবে নতুন।[৩]

এ পরিপ্রেক্ষিতে, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সামা-

জিক ইতিহাসের একটা সূক্ষ্ম তফাৎ করা সম্ভব। যেমন, শুধু শাসকবদলের ক্রমপঞ্জী বা বিবরণ, অথবা শুধু অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা—এসব প্রয়াসকে সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাস হিসেবে আখ্যা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে সামাজিক ইতিহাসের কোন সংজ্ঞা দেওয়া বোধ হয় দুরূহ। কারণ, সবকিছু নিয়েই সমাজ, সবকিছুই উৎসারিত সমাজ থেকে। সেজন্য বলা যায়, সব ইতিহাসই সামাজিক ইতিহাস, ঐতিহাসিক তাকে যে কোন নামেই সম্বোধন করুন না কেন।[৪]

বাঙ্গালী পাঠক ও গবেষকদের কাছে, 'সামাজিক ইতিহাস' শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ১৩৩৯ সালে (বাংলা সন) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যা-য়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রকাশিত হওয়ার পর। ব্রজেন্দ্রনাথ সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে উনিশ শতকে প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্র থেকে শুধু সংবাদ সংকলন করেছিলেন। কিন্তু সংকলিত সংবাদগুলিকে তিনি কি কি ভাগে ভাগ করেছিলেন তা দেখলে স্পষ্ট হবে তিনি সমাজ ইতিহাসে কি অন্তর্ভূক্ত করতে চেয়েছিলেন—শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম।

সামাজিক ইতিহাস নিয়ে বাংলা ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন বিনয় ঘোষ। ব্রজেন্দ্রনাথের পদ্ধতি অনুসরণ করেই বিনয় ঘোষ চারখণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র।'[৫] তবে বিনয় ঘোষ, তাঁর সংকলনে অর্থনীতি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যা ব্রজেন্দ্রনাথ করেন নি। সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ সম্পর্কে উপরোক্ত দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গী এখানেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ছাড়া, সমাজ বিশ্লেষণে বিনয় ঘোষের মনোভাব সার সংকলকের। এর প্রমাণ, একই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর লেখক/গবেষকের উদ্ধৃতি।[৬]

উপরোক্ত দু'জনের গ্রন্থ ছাড়া, এ পর্যন্ত বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে, ইংরেজী ও বাংলাভাষায় বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। তবে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে আমি বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত কয়েকটি গ্রন্থের ওপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।

বাংলাদেশে, উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাস নিয়ে অপেক্ষাকৃতভাবে গবেষণা হয়েছে কম। নির্দিষ্টভাবে, সামাজিক ইতিহাসের শিরোনাম নিয়ে পঞ্চাশের দশকে প্রকাশিত হয়েছিল আবদুল করিমের গ্রন্থ—'সোস্যাল

হিস্ট্রি অব মুসলিমস ইন বেঙ্গল।'[৭] ষাটের দশকে প্রকাশিত হয়েছিল আবদুর রহিমের দু'খণ্ডে রচিত 'সোস্যাল এণ্ড কালচারাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল।'[৮]

আবদুল করিম তাঁর গ্রন্থটিকে বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস রচনায় পথিকৃত বলে উল্লেখ করেছেন, যে সমাজ বিকাশে সহায়তা করেছিলেন সুলতান, সুফী এবং মুসলমান পণ্ডিত বর্গ। তিনি মুসলমান সমাজের গঠন ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের কথা আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, সম্পূর্ণ বিষয়টিকে তিনি দেখতে চেয়েছেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে, তাই সমাজতাত্ত্বিক কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে চান নি। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে যে সব সামাজিক প্রশ্ন এসেছে তাই তিনি আলোচনা করেছেন।

তথ্যের প্রাচুর্য আছে করিমের গ্রন্থে কিন্তু তাঁর রচনা প্রধানত বর্ণনামূলক। মুসলমান সমাজের গঠন আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বল্লেখ করেছেন, ঐ সমাজ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, উচ্চ এবং নিম্ন। উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সৈয়দ, আলীম, শেখ ও সরকারী আমলারা এবং বাকী সবাই ছিলেন নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্ত এ অন্তর্ভুক্তির মাপকাঠি কি তা তিনি উল্লেখ করেন নি। তা'ছাড়া সৈয়দ, আলীম প্রভৃতি কি পেশা না মর্যাদা সম্পন্ন উপাধি? এ সবও তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নি। ফলে শ্রেণী সম্পর্কিত তাঁর আলোচনা অস্পষ্ট। অর্থনীতি আলোচনা ছাড়া শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা কি ভাবে সম্ভব?

আবদুর রহিম, আঠারো শতক পর্যন্ত বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে, মানুষ, ইতিহাস এবং ভুগোলই হচ্ছে তিনটি প্রধান উপাদান যা বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক বিকাশে সহায়তা করেছিল।[৯] তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গী উনিশ শতকের ধারণা থেকে উদ্ভুত।[১০] রহিম গুরুত্ব আরোপ করেছেন, রাজনৈতিক জীবনের ওপর প্রকৃতির প্রভাবের। কিন্তু এ গ্রন্থও বিশ্লেষণ অপেক্ষা তথ্যে আকীর্ণ। মুসলমান সমাজের বিকাশ সম্পর্কে আবদুল করিমের মতের সঙ্গে তাঁর মতের কোন অমিল নেই। এবং করিমের মতই শ্রেণী সম্পর্কে তাঁর আলোচনা স্বচ্ছ নয়। সমাজে তিনি চারটি শ্রেণী নির্ণয় করেছেন—শাসক/সুলতান, অভিজাত, মধ্যশ্রেণী এবং সাধারণ মানুষ। কিন্ত সুলতান কি ভাবে আলাদা শ্রেণী তা তিনি উল্লেখ

করেন নি। মধ্যশ্রেণীর সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি এ ভাবে—"a class of people who worked with their brain for their livelihood" (Vol I, p. 212). এবং যেহেতু তিনি প্রতিটি শ্রেণীর সামাজিক বা রাজনৈতিক ভূমিকা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নি তাই এ সম্পর্কিত আলোচনা হয়েছে ধোঁয়াটে।

এ দু'টি বই ছাড়া ষাট ও সত্তর দশকে সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল চারটে উল্লেখযোগ্য বই। বইগুলি লিখেছেন, আজিজুর রহমান মল্লিক[১১] (১৯৬১), আনিসুজ্জামান[১২] (১৯৬৪) সালাহউদ্দিন আহমদ[১৩] (১৯৬৫), এবং সুফিয়া আহমদ[১৪] (১৯৭৪)। এ চারটি বই সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, সে জন্যে এখানে এ সব গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনায় বিরত থেকেছি।

উপরোক্ত বইগুলি থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অধিকাংশ গবেষকই গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়কে। এর একটি কারণ, পাকিস্তানী হিসেবে তৎকালীন শাসকদের মনোভঙ্গী হয়ত তাঁদের খানিকটা প্রভাবিত করেছিল। তাঁদের চিন্তার পটভূমিতে ছিল সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমাজের সমীকরণ। আরো একটি কারণ প্রচ্ছন্ন ছিল। তা'হল, পশ্চিমবঙ্গে উনিশ শতকের বাংলা নিয়ে যাঁরা কাজ করেছিলেন তাঁরা প্রায় ক্ষেত্রেই সচেতন বা অসচেতনভাবে সমস্ত কর্মকাণ্ডে হিন্দুদের অবদানই বড় করে দেখিয়েছিলেন। ফলে, এ অঞ্চলে যাঁরা কাজ করেছিলেন তাঁদের মনেও বোধহয় এ বোধ কাজ করেছিল এবং তাঁরাও সচেতন বা অসচেতন ভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিপরীতে মুসলমান সম্প্রদায়কে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। সেজন্য বলা যায়, সামগ্রিকভাবে সমাজকে বিচার না করার ফলে তাঁদের ইতিহাস হয়েছে খণ্ডিত, অনেক ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের ইতিহাস মাত্র।

উপরোক্ত গবেষকদের সবাই অভিন্ন বাংলার পটভূমিকায় কাজ করেছেন। কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে সব কর্মকাণ্ড হয়েছে সেগুলির ওপরই জোর দিয়েছেন তাঁরা বেশী। অবশ্য তার কারণও আছে। উনিশ শতকে কলকাতাকে কেন্দ্র করেই বাংলা আবর্তিত হয়েছিল এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করতে গেলে তথ্যাবলী সংগ্রহ করাও খুব দুরূহ নয়। কিন্তু অন্যভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, তাঁদের এ আলোচনাও খণ্ডিত। কারণ তাঁরা বলেছেন, তাঁরা আলোচনা করেছেন অখণ্ড বাংলা নিয়ে

কিন্তু তাঁদের আলোচনা প্রায় ক্ষেত্রে আবর্তিত হয়েছে কলকাতাকে কেন্দ্র করেই। সমাজ ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু সমাজ গঠন নিয়ে কেউই আলোচনা করেন নি। অথচ, সমাজ গঠন আলোচনা ব্যতিরেকে কিভাবে একটি সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব? সমাজ গঠন শব্দটি বর্ণনামূলক, তাত্ত্বিক কোন সংজ্ঞা নয়। সমাজ গঠন বলতে আমরা নির্দিষ্ট একটি সমাজের কথা বুঝি যার অবস্থান নির্দিষ্ট কোন রাষ্ট্র বা ভৌগোলিক সীমায় এবং নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পট-ভূমিতে। 'সমাজ' ও 'সমাজ গঠন' শব্দটি নির্দিষ্ট এক অর্থ বহন করে যার মধ্যে অন্তর্গত রাজনৈতিক ও আদর্শগত উপাদান। এখানে উল্লেখ্য যে, নির্দিষ্ট একটি সমাজ গঠনের চরিত্র নির্ধারণ করে ঐ সময়ের প্রধান উৎপাদন পদ্ধতি। সমাজ গঠন নির্ধারণ করতে পারলে সমাজ, সম্প্রদায় এবং শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনাও সহজতর হয়। উল্লিখিত ঐতিহাসিকদের, সমাজ গঠন নিয়ে আলোচনা না করার একটি কারণ বোধহয় পদ্ধতি। তাঁরা প্রায় সবাই সনাতন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, ফলে দেখা দিয়েছে এ জটিলতা।

এই সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থ। নাম—'উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫)'। অভিন্ন বাংলার ওপর কাজ না করে শুধু পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ নিয়ে গবেষণার অবশ্য কয়েকটি কারণ আছে। আগেই উল্লেখ করেছি, পূর্ববর্তী গবেষকরা অভিন্ন বাংলা নিয়ে আলোচনা করার কথা উল্লেখ করলেও, বাংলার এক বিশাল অংশ—পূর্ববাংলা তাঁদের রচনায় অনালোচিত থেকে গেছে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলের পূর্ববঙ্গের একটি চিত্র তুলে ধরতে পারলে, অখণ্ড বাংলার ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের পুরো চিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বলা যেতে পারে, এ গ্রন্থ পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির পরিপূরক। তা'ছাড়া বর্তমানে, স্বাধীন বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অতীতের সমাজ গঠনের অন্বেষণ ও মূল্যায়ন আবশ্যক।

বর্তমান গ্রন্থে 'বাংলা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অভিন্ন বাংলার পরি-প্রেক্ষিতে, 'পূর্ববঙ্গ' বা 'বাংলাদেশ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে বর্তমান বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে। এই গ্রন্থে আমার প্রয়াস হচ্ছে, পূর্ববর্তী গবেষকদের মতো, খণ্ডিত বা সম্প্রদায়গত ভাবে সমাজ বিচার না করে, সামগ্রিকভাবে পূর্ববঙ্গের সমাজ গঠন বিশ্লেষণ করা, সমাজের কয়েকটি

দিকের চিত্র তুলে ধরা। পরবর্তী অনুচ্ছেদ দু'টিতে, বর্তমান গ্রন্থের সময়-কাল ও এর গুরুত্ব এবং পূর্ববঙ্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই আঞ্চলিকতা সম্পর্কে জ্ঞানাশ্রিত স্পষ্টতা না থাকলে পূর্ববঙ্গের সমাজ বোঝা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

খ. আঞ্চলিকতা

একটি মাত্র নরগোষ্ঠী থেকে বাঙালীর উৎপত্তি হয়নি। কয়েকটি নরগোষ্ঠীর মিলিত ফল বাঙালী।[১৫] অতি প্রাচীনকালে, এসব নরগোষ্ঠী বাস করেছে কোমবদ্ধ হয়ে এবং একটি কোমের সঙ্গে অপরটির যোগাযোগ ছিল ক্ষীণ। সভ্যতার বিস্তৃতির ফলে, বিভিন্ন কোমের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল বৃহত্তর কোম, যেমন গঙ্গা, রাঢ়া, পুন্ড্রা প্রভৃতি। এই কৌমচেতনা প্রাচীন যুগেতো বটেই, মধ্যযুগেও ছিল এবং এখনও বহমান।[১৬]

কৌমচেতনার সঙ্গে ক্রমে যুক্ত হয়েছিল আঞ্চলিক স্মৃতি এবং চেতনার। বঙ্গা, রাঢ়া পুন্ড্রা প্রভৃতি জনপদগুলি পাল (আনুমানিক ৭৫০ থেকে ১১৭৪ খৃষ্টাব্দ) ও সেন রাজারা (আনুমানিক ১০৯৫-১২৪৫ খৃষ্টাব্দ) বিভিন্ন জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আঞ্চলিক চেতনা তবু লুপ্ত করা সম্ভব হয়নি।[১৭]

অমোর আলোচ্য সময়ের কথা (১৮৫৭-১৯০৫) আলোচনা করতে গিয়ে, এ পরিপ্রেক্ষিতে, সর্বভারতের পটভূমিকায় জাতীয়, আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক চেতনার কথা আলোচনা করা দরকার। জাতীয় চেতনার ক্রমবিকাশ হয়েছিল পশ্চিম ইউারাপে এবং এর পেছনে কাজ করেছিল পুঁজিবাদী শক্তি। এর কারণ, বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণী চেয়েছিল সামন্ত-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের বেড়াজাল ভেঙ্গে নতুন বাজারের সৃষ্টি করতে বা 'Co-extensive with a definite culturally-politically unified or unifiable territory, could be brought into existence with popular support.'[১৮] ভাষা ছিল এ চেতনার একটি প্রধান মাধ্যম। বুর্জোয়ারা, নিজ রাজনৈতিক স্বার্থে তখন সচেতন করে তুলে-ছিল জনগণকে তাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সত্ত্বা সম্পর্কে এবং এ জন্যে প্রয়োজনবোধে সৃষ্টি করা হয়েছিল বিভিন্ন 'মিথ'। এটিই হল জাতীয়তাবাদ এবং তা সাহায্য করেছিল বুর্জোয়াদের জনগণকে সংগঠিত

করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসনাধীন রাষ্ট্রগুলিতে জাতীয় আন্দোলন ছিল প্রাথমিকভাবে উপনিবেশের বিরুদ্ধে, যাতে বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে এবং নিরবচ্ছিন্ন গতিতে সমাজকে পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তরিত করতে পারে। সুতরাং জাতীয়তাবাদের উৎস শুধু হৃদয়াবেগ বা দেশের প্রতি ভালোবাসাই নয়, অন্যকিছুও।[১৯]

ঔপনিবেশিক শাসনামলে দেখা গেছে, নিজেদের স্বার্থেই বৃটিশরা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল যার সঙ্গে যোগ ছিল মেট্রোপলিটনের। ঐ সময় বিভিন্ন অঞ্চলের অসংহত বুর্জোয়াদের উৎসাহিত করা হয়েছিল বিদেশী পুঁজি ও ব্যবসার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যে। উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক বা সর্বভারতীয় পর্যায়ে উঠতি ভারতীয় বাঙ্গালী বুর্জোয়াদের স্থান ছিল অধস্তন। কিন্তু তারা চায় নি নিজেদের বাজারের উপর বিদেশীদের আধিপত্য। নিজেদের বিকাশের জন্যে তাদের প্রয়োজন ছিল ঐ বাজারের। কিন্তু এ বিরোধী ভূমিকা কখনও ছিল না বিপ্লবাত্মক বরং তা ছিল সমঝোতাপূর্ণ। সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে, আমার আলোচ্য সময়ে বুর্জোয়ারা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে চলেছিল এবং গুরুত্ব আরোপ করেছিল এর বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের ঐক্যের।[২০]

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতে জাতীয় চেতনা বলে কিছু গড়ে ওঠেনি। আমার আলোচ্য সময়ে লক্ষ্য করি জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটেছিল এবং এর দু'টি ধারা ছিল বহমান—একটি সর্বভারতীয়, অপরটি আঞ্চলিক। প্রথমটির ভিত্তি ছিল—সর্বভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য। দ্বিতীয়টির ভিত্তি ছিল স্ব স্ব অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এবং নিজ অঞ্চলের লোক সমষ্টির ঐ অঞ্চলের বাজার ও সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ।[২১] জাতীয় চেতনার মধ্যে আঞ্চলিক চেতনার এই অবস্থানের ভিত্তিতে আবার অনুপ্রবেশ করেছে প্রাচীন বাংলার অতীত এবং ঐতিহ্য।

প্রাচীন বাংলা সম্পর্কে নীহার রঞ্জন রায় লিখেছিলেন, "ভূমি নির্ভর কৃষি জীবনের কারণে" কৌম ও আঞ্চলিক চেতনা কাজ করেছিল। আঞ্চলিক চেতনার মধ্যে ভূমি নির্ভরতার এই অনুপ্রবেশ আমার আলোচ্য সময়ে ক্রিয়াশীল দেখতে পাই বিকাশমান মধ্য বা বুর্জোয়া-শ্রেণীর মধ্যে। ঐ সময় একই সঙ্গে সর্বভারতীয়, আঞ্চলিক (বাংলা)

ও উপ-আঞ্চলিক (পূর্ববঙ্গ)—এই চেতনাত্রয় কাজ করেছিল। বুর্জোয়া-শ্রেণীর জন্যে সর্বভারতীয় পরিসরে সুবিধা ছিল বেশী। সে জন্যে সে চেয়েছিল সর্বভারতীয় চেতনার বিকাশ। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার আঞ্চলিক চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল সে, যেমন, বঙ্গভঙ্গের সময়। কলকাতার বিরুদ্ধে আবার পূর্ববঙ্গের কাঠামোগত দুর্বল মধ্য-শ্রেণীর উপ-আঞ্চলিক চেতনা কাজ করেছিল। ঐ মধ্যশ্রেণীর মতে, তাদের অঞ্চলের উৎপাদিত কাঁচামাল চলে যাচ্ছিল কলকাতায়, কিন্তু পাচ্ছিল না ন্যায্যমূল্য। পূর্ববঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল অবহেলিত। এ সব কিছুর পরিচয় পাবো আমরা তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণীর বাহন সংবাদ/সাময়িকপত্রগুলিতে (দ্রষ্টব্যঃ তৃতীয় অধ্যায়)। এই চেতনায় সহায়তা করেছিল আবার ভূমি নির্ভর জীবন, শিল্পের অভাব। এই উপ-আঞ্চলিক চেতনা পূর্ববঙ্গবাসীর মন থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি কখনও। সে চেতনা আবার বাঙালী জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে (১৯৭১) সহায়তা করেছিল; অবশ্য এই রূপান্তরণ আমার আলোচনার পরিসরের বাইরে।

এবার আলোচনা করবো কি ভাবে বিভিন্ন সময়ে বাংলাকে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং কি ভাবে তার এক অংশ পরিণতি পেয়েছে বর্তমান বাংলাদেশে। প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদের মধ্যে 'বঙ্গ' ও 'বাঙাল' ছিল মাত্র দু'টি জনপদ কিন্তু এ দু'টি নাম থেকেই 'বর্তমান এবং মধ্যযুগীয় সমগ্র বাংলাদেশ' নামটির উৎপত্তি।[২২] গৌড় নামের অধীনে যদিও বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন শশাংক (আনুমানিক ৬০৬ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের অধিপতি হয়েছিলেন তিনি) এবং পাল ও সেন রাজারাও সে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা সফল হয় নি। 'সে সৌভাগ্য ঘটিল বঙ্গ নামের।'[২৩] তবে তা পরিণতি লাভ করেছিল আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫) সময় যখন সমগ্র বাংলা, 'সুবা বাংলা' নামে পরিচিত হয়েছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার, সঙ্গে গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল দ্বারা শাসিত হত। লেফটেনান্ট গভর্ণরের অধীনে নতুন বাংলা প্রদেশের সূচনা করেছিলেন লর্ড ডাল-হৌসী (১৮৪৮-১৮৫৬), ১৮৫৪ সালে। বাংলা প্রদেশের উপবিভাগগুলি ছিল—বেঙ্গল প্রপার, বিহার, উড়িষ্যা এবং ছোটনাগপুর। ঐ সময়

বাংলা প্রদেশের ভৌগোলিক সীমানা ছিল 'উত্তরে হিমালয় পর্বত শ্রেণী, পর্বতের উপত্যকায় নেপাল, ভুটান আর সিকিম রাজ্য, দক্ষিণে গর্জন-মুখর বঙ্গোপসাগর, উপকূলে নোয়াখালী চট্টগ্রামের শ্যামল বন মেখলা, পূর্বে আসাম গারো খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ধূসর দেওয়াল আর পশ্চিম বিহার আর উড়িষ্যার বনভূমি। এই ছিল ইংরেজ আমলের বাংলা, ৫টা বিভাগে ভাগ করা ২৮টা জেলার বাঙলা।'[২৪]

১৮৭০ সালে বাংলা থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং সংশ্লিষ্ট পর্বত, কাছাড় ও সিলেট আলাদা করে নিয়ে গঠন করা হয়েছিল নতুন প্রদেশ আসাম। নতুন প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন চিফ কমিশনার। ১৮৯৮ সালে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল দক্ষিণ লুসাই পর্বত।[২৫] ১৯০৫ সালে, মোটামুটি আজকের বাংলাদেশ ও আসাম নিয়ে গঠিত হয়েছিল আবার পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ। পাকিস্তান আমলেও ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ পরিচিত ছিল পূর্ববঙ্গ নামে, (তারপর পূর্ব পাকিস্তান নামে) ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে তা পরিণত হল স্বাধীন বাংলাদেশে।

বর্তমান গ্রন্থ আজকের বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, আলোচনাকালে পূর্ববঙ্গকে বাংলা থেকে একেবারে আলাদা করে বিচার করা যাবে না বা সমীচীনও হবে না। ভাষা এবং জাতি হিসেবে বাঙালীর 'একত্বতা' গড়ে উঠলেও পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের এমন কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে যা দু'টি অঞ্চলকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। প্রকৃতিগত দিক থেকেও পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ, পূর্ব-বঙ্গ নদী মাতৃক অঞ্চল। এ ছাড়া সংস্কৃতগতভাবেও যে প্রাচীনকালে দু'টি অঞ্চলের খুব মিল ছিল এমন কথা বলা যায় না। যেমন রাঢ় (বা পশ্চিমবঙ্গ) এর ওপর প্রভাব পড়েছিল বেশী উত্তর ভারতীয় 'কালচারাল ইডিওমস' এর যার উদাহরণ ঐ অঞ্চলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য।[২৬]

এ পরিপ্রেক্ষিতে, অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন এ বলে যে, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব রাঢ় অঞ্চল থেকে কিছু কম ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক প্রশ্নে প্রায় এক এবং উত্তরাঞ্চল ও রাঢ় ঐ প্রশ্নে স্বতন্ত্র। এর একটি কারণ বোধ হয় এই যে, পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের আগমন এবং তারপর তাদের সংগঠিত ধর্মজীবন ও কৃষি বাণিজ্যের প্রভাব

ব্যপ্ত হয়ে পড়েছিল উত্তরাঞ্চলে। এক কথায়, মুসলমানদের আগমন, মসজিদ নির্মাণ ও তাকে ঘিরে পতিত জমি উদ্ধার ও সংগঠন, বিশেষ করে সুফীদের প্রভাব গ্রাস করেছিল উত্তরাঞ্চলকে। এখনও ঐ সব অঞ্চলে সুফীদের সম্পর্কে বিভিন্ন কিংবদন্তী সেই স্মৃতিই বহন করে। এ ভাবে, একসময়, উত্তরাঞ্চল রাঢ়ের সংলগ্ন ও সাংস্কৃতিক প্রভাবে থাকা সত্ত্বেও কালক্রমে ঐ প্রশ্নে তা পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিকতার বলয়ে লীন হয়ে গিয়েছিল।

তাই এ পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে নয় বরং অভিন্ন বাংলার পটভূমিতে পূর্ববঙ্গের স্বাতন্ত্র্যের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, এর সাংস্কৃতিক বা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য কি? ঔপনিবেশিক আমলে সমাজ গঠন এবং শ্রেণীবিন্যাসই বা ছিল কেমন? বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে এ অঞ্চলের জনমানসের প্রতিক্রিয়ার চরিত্রই বা ছিল কি?

গ. গ্রন্থের সময়কাল

বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য সময় ১৮৫৭ থেকে ১৯০৫। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে এ সময়টিকে কেন বেছে নিয়েছি? এ সময় প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটেছিল ভারতবর্ষে যার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী, বিকাশ হয়েছিল মধ্যশ্রেণীর, ভাবনার জগতে হয়েছিল আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের ফলে, আন্দোলনের বিভিন্ন মাধ্যমের বিকাশ ঘটেছিল।

১৮৫৭ ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক বিশেষ সময়, কারণ, কোম্পানীর বিরুদ্ধে ঐ সময় প্রথমবারের মত ব্যাপক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। এ বিদ্রোহের দিক ছিল দু'টি। এক, এই প্রথম ব্যাপক আকারে কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছিল যেখানে কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষও অংশগ্রহণ করেছিলেন। দুই, এ ঘটনা, এ ধারণারও সৃষ্টি করেছিল যে ইংরেজ শাসন একেবারে আমোঘ নয়, এর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ/বিদ্রোহ সম্ভব। এ বিদ্রোহ পরবর্তীকালে পরোক্ষভাবে হলেও ঔপনিবেশিক সরকার বিরোধী আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পরই কোম্পানীর শাসনের অবসান হয়েছিল এবং ঘটেছিল প্রশাসনিক রদবদল, অর্থাৎ ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন বৃটিশ সরকার। বৃটিশ সরকারের শাসনভার গ্রহণ ভারত-বর্ষের প্রশাসনেতো বটেই, বিকাশমান মধ্যশ্রেণীর মনেও অভিঘাতের সৃষ্টি

করেছিল। রাণী ভিক্টোরিয়া রূপান্তরিত হয়েছিলেন জননীতে এবং এ মোহ ভাঙ্গতে সময় লেগেছিল অর্ধশতাব্দীরও বেশী।

এ সময়ে প্রসার ঘটেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পেশাজীবী বা মধ্যশ্রেণীর। মধ্যশ্রেণী ঔপনিবেশিক সরকারের সহায় কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে নিজ সুবিধা আদায়ের জন্যে চাপেরও সৃষ্টি করেছিল সে, কিন্তু কখনও উৎখাত করতে চায়নি ঔপনিবেশিক শাসকে। এ সময়ই ব্রাহ্ম আন্দোলন উঠেছিল তুঙ্গে এবং এরপর হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদে আক্রান্ত হয়েছিল হিন্দু সম্প্রদায়, স্থাপিত হয়েছিল বিভিন্ন সভাসমিতি ও সংবাদপত্র, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শুরু হয়েছিল আন্দোলন। এ সব কিছুর কেন্দ্র ছিল কলকাতা কিন্তু সব আবার কলকাতায়ই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছিল বাইরেও।

বাংলার আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরেক মাইল ফলক ১৯০৫ সাল। এ সময় ঔপনিবেশিক সরকার নিজ স্বার্থে বাংলা বিভক্ত করেছিল, যা পরিচিত বঙ্গ ভঙ্গ নামে। বাংলায়, বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এবং বোধ হয় প্রথমবারের মত মধ্যশ্রেণী পরিচালিত আন্দোলনগুলির সংকীর্ণ গণ্ডি খানিকটা অতিক্রম করেছিল। এ আন্দোলনে পূর্ববঙ্গেরও ছিল এক বিশেষ ভূমিকা। বঙ্গ ভঙ্গ আবার মধ্যশ্রেণীর হিন্দু মুসলমানের বিরোধকে জাগ্রত ও গভীর করে তুলেছিল যার রেশ এখনও মিলিয়ে যায় নি।

এ সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে, আমার মনে হয়েছে ১৮৫৭ থেকে ১৯০৫—এ সময় বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে। এই অঞ্চলের নৈসর্গিক ও ভূমি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ক্রিয়াশীল বাংলার সমাজের মধ্য-শ্রেণী, এই মধ্যশ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্বমুখর হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়, বাংলার সমাজের মধ্যশ্রেণী ও বাংলার সমাজের অন্তর্গত হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ওপর ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত আন্দোলনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আলোচ্য সময় চিহ্নিত করেছে। ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের পরিসরে বিকাশমান আঞ্চলিক চেতনা, যার মধ্যে ক্রিয়াশীল শ্রেণী ও সম্প্রদায় বোধ, তাকে আমি বুঝবার প্রয়াস করেছি আলোচ্য সময়ের ফ্রেমে।

ঘ. গ্রন্থের অধ্যায়সমূহ

বর্তমান অভিসন্দর্ভে অধ্যায়ের সংখ্যা চারটি। প্রথম অধ্যায়—'পূর্ববঙ্গ : চিহ্নিতকরণ'। জাতীয়তা নির্ধারণকারী দু'টি প্রধান উপাদান—ভাষা ও 'একজনত্ব'—পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের একই। এবং আমার আলোচ্য সময়ে দু'টি অঞ্চল যুক্ত ছিল একই নামের অধীনে। ফলে সমস্যা দেখা দেয়—আলাদাভাবে পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করা কি সম্ভব? এ সমস্যা সমাধানকল্পেই এ অধ্যায়। এ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, উভয় অঞ্চলের অধিবাসীরা বাঙালী বলে পরিচিত হলেও, বিভিন্ন কারণে, দু'অঞ্চলের অধিবাসীদের মানসিক গঠন অনেকক্ষেত্রে ভিন্নতর এবং ভৌগোলিক কারণও দু'টি অঞ্চলকে প্রদান করেছে আলাদা বৈশিষ্ট্য।

পূর্ববঙ্গ নদীমাতৃক।[২৭] এ ছাড়া, এর ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, বিশেষ করে নদীপ্রবাহ একে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে চিহ্নিত করেছে আলাদাভাবে এবং নদীপ্রবাহই নিয়ন্ত্রণ করেছে বাঙালীর জীবন। যেমন জলবায়ু বাঙালীকে কিছুটা আয়েসী করে তুললেও নদী ও সমুদ্র তার মধ্যে সৃষ্টি করেছে আত্মরক্ষার সহজ প্রবণতা ও প্রতিরোধক্ষমতা। অবশ্য নদীর ভাঙ্গন তাকে করে তুলেছে আবার নৈরাজ্যবাদীও। জলবায়ু তার স্থাপত্য, শিল্পে সৃষ্টি করেছে আলাদা বৈশিষ্ট্য।

ঔপনিবেশিক আমলের গোড়ার দিকে পূর্ববঙ্গ ছিল জলাজঙ্গলে ঢাকা একটি অঞ্চল। ঔপনিবেশিক আমলেই আবার জলাজঙ্গল থেকে পতিত জমি উদ্ধার পর্ব শুরু হয়েছিল। অনাহার, মহামারী ইত্যাদির সংগে লড়াই করে পূর্ববঙ্গবাসী উদ্ধার করেছিলেন পতিত জমির। কিন্তু একান্তভাবে কৃষিনির্ভর পূর্ববঙ্গ পরিণত হয়েছিল শুধু কাঁচামালের আড়ত হিসেবে। ভারতবর্ষের 'সুন্দর' একটি প্রদেশ হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনিক দিক থেকে এ অঞ্চলটি ছিল সবসময় অবহেলিত এবং কালক্রমে পরিণত হয়েছিল কলকাতার পশ্চাদভূমিতে। ১৯৭১ সালের পূর্বপর্যন্ত সেই পশ্চাদভূমির ভূমিকা থেকে পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ আর মুক্তি পায়নি।

প্রথম অধ্যায়ের পটভূমিতে রচিত হয়েছে, দ্বিতীয় অধ্যায়, যার শিরোনাম—'ঔপনিবেশিক সমাজ গঠন ও শ্রেণীবিন্যাস।' এই অধ্যায়ে আমি পদ্ধতির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি। বাংলাদেশের পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকরা কমবেশী আকৃষ্ট সনাতন পদ্ধতির প্রতি এবং তাই সামাজিক ইতিহাস রচনা করলেও তাঁরা স্পষ্টভাবে সমাজ গঠন ও

শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করেন নি। অথচ সমাজ গঠন ও শ্রেণী-বিন্যাস ব্যতীত সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া দুরূহ। তাই এ অধ্যায়ে, উপাদান ব্যবহার, ঔপনিবেশিক সমাজ গঠন ও শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

উৎপাদন পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারলে সমাজ গঠনের প্রশ্নটি স্পষ্ট হয়ে যায়। বাংলাদেশের সমাজ কি সামন্তবাদী না ধনতান্ত্রিক ছিল এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। এ অধ্যায়ে, সামন্তবাদী ও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, আমার আলোচ্য সময়ে যে উৎপাদন পদ্ধতি এখানে ছিল তা অধস্তন ঔপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতি। এবং এ পদ্ধতিই নির্ধারণ করেছিল পূর্ববঙ্গের সমাজ কাঠামো ও শ্রেণীবিন্যাস। মোটাদাগে, এর ফলে তিনটি শ্রেণী আমরা পাই—জমিদার, পেশাজীবী মধ্যশ্রেণী এবং সাধারণ মানুষ। এ ছাড়া ব্যবসায়ী শ্রেণীর ওপরও বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে যদিও তারা মধ্যশ্রেণীর অন্তর্গত। এখানে উল্লেখ্য যে, এ অধ্যায়ে শ্রেণী তিনটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য/টাইপ কি ছিল তাই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক সরকার তার শাসনব্যবস্থা বজায় রেখেছিল জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর দ্বারা। কিন্তু কি ভাবে? পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণ তা উল্লেখ করেন নি। এখানে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে কি ভাবে সাধারণ মানুষের ওপর শাসকের চিন্তাধারা চাপিয়ে দিতে সহায়তা করেছিল উপরোক্ত দুই শ্রেণী।

উপরোক্ত দুই শ্রেণী আবার তাদের সাম্প্রদায়িক চিন্তা ব্যবহার করেছিল নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন করার জন্য। এই সংরক্ষণ ও পরিবর্ধনের পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রেণীস্বার্থ কোন ক্ষেত্রে পর্যবসিত, কোন ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছে সম্প্রদায়গত স্বার্থে। এই বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্যে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছি মীর মশাররফ হোসেনের দু'টি গ্রন্থ। এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই চলে এসেছে সম্প্রদায়গত প্রশ্ন। কেন পূর্ববঙ্গে সব সময় প্রাধান্য পেল সম্প্রদায়, কেন বিকশিত হল না ধর্মনিরপেক্ষতা—এ সব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম—'সামাজিক আন্দোলন ঃ প্রতিক্রিয়া।' বাংলাদেশের পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা

প্রায় করেন নি বললেই চলে। যে দু'একজন করেছেন তাঁরাও গুরুত্ব আরোপ করেছেন কলকাতা কেন্দ্রিক প্রতিক্রিয়ার উপর। তাই বলা যেতে পারে, এই প্রথমবারের মত পূর্ববঙ্গের কয়েকটি সামাজিক আন্দোলনের ওপর বর্তমান গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। আন্দোলনগুলি হল—১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ, ব্রাহ্ম আন্দোলন সহবাস সম্মতি আন্দোলন এবং বঙ্গ ভঙ্গ।

এ অধ্যায়ের শুরুতে সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে এবং সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, যে চারটি আন্দোলন আলোচিত হয়েছে, ব্যাপকতর অর্থে সেগুলি সামাজিক আন্দোলনেরই অন্তর্গত। ১৮৫৭ এবং বঙ্গ ভঙ্গের ভিত্তি অবশ্য শুধু সমাজ বা সমাজ সংস্কারই নয় এর সংগে জড়িত ছিল আর্থ-সামাজিক প্রশ্নও। আর ব্রাহ্ম ও সহবাস সম্মতি আন্দোলনে আমরা দেখতে পাবো, উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের উঠতি মধ্য শ্রেণীর ভাবনার জগত, চিন্তার বৈপরীত্য, বিকার এবং তার পরিণতির চিত্র। আর আলোচ্য আন্দোলনগুলি থেকে একটি কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা'হল এগুলি সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানতঃ শহরের একটি শ্রেণীর মধ্যেই যার সংগে সাধারণ মানুষ অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না বা তাদের তা স্পর্শ করেনি। এর একটি কারণ, এ সব আন্দোলনের সংগে কৃষকদের মুক্তির কোন প্রশ্ন জড়িত ছিল না। তা'ছাড়া মধ্য-শ্রেণী যারা সমাজে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং কৃষকদের জগৎ—দু'টিই চলেছে সমান্তরাল ভাবে, মিলিত হয়নি কখনও।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কৃষক আন্দোলনগুলিতো সামাজিক আন্দোলনের অন্তর্গত। সুতরাং আলোচনায় সেগুলি অর্ন্তভুক্ত করা হল না কেন?

আমার আলোচ্য সময়ে আলোচনা করার মত দু'টি কৃষক আন্দোলন হয়েছিল, নীলবিদ্রোহ এবং পাবনার কৃষক বিদ্রোহ। গবেষকরা (যেমন ব্লেয়ার ক্লিংগ, কল্যাণ কুমার সেনগুপ্ত) ইতিমধ্যে এ দু'টি বিদ্রোহের ওপর পুংখানুপুংখভাবে আলোচনা করেছেন। সেজন্যে, আমি গুরুত্ব দিয়েছি সে সব আন্দোলনের ওপর যেগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে কম বা একেবারে হয়নি।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম—'জনমত—সংবাদপত্র ও সভাসমিতির

উদ্ভব ও বিকাশ।' উনিশ শতকের বাংলায় সংবাদপত্র ও সভাসমিতির গুরুত্ব এখন আর কেউ অস্বীকার করেন না। সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টিতে এ দু'টি অনেক সহায়তা করেছিল। বিশেষ করে মধ্যশ্রেণীর মন মানসিকতা, ব্যক্তির সম্প্রদায়গত ও শ্রেণীগত অবস্থানের মধ্যে বৈপরীত্য বুঝতেও সভাসমিতির বিশেষ করে সংবাদপত্র আমাদের সাহায্য করবে।

এতোদিন গবেষকদের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল, উনিশ-শতকে পূর্ববঙ্গে কয়েকটির বেশী সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়নি এবং সভাসমিতির সংখ্যাও ছিল কম। এর কারণ তথ্যের অভাব। সাময়িকপত্র সম্পর্কে তথ্য না পাওয়ার কারণ ঐসব সংবাদ-সাময়িকপত্রের দুষ্প্রাপ্যতা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ববঙ্গ থেকে উনিশ শতকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলো বিলুপ্ত। কিন্তু বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে ১৮৫৭-১৯০৫ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত মোট ২৩২টি সংবাদ-সাময়িকপত্রের পরিচয় উদ্ধার করা হয়েছে। জানা গেছে ৩৮৭টি সভাসমিতির নাম। সুতরাং বলা যেতে পারে এ দু'টি বিষয়ে এখানেই প্রথম বিস্তৃতভাবে আলোচনার চেষ্টা করা হলো।

এ অধ্যায়ের আলোচনায় কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ, এবং মধ্যশ্রেণী সংলগ্ন সাম্প্রদায়িকতার বিকাশের সঙ্গে সংবাদপত্রের উদ্ভব ও বিকাশের প্রশ্নটিও জড়িত। এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, ১৮৭০-৯০ হচ্ছে পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণীর জাগরণের কাল। এবং এ জাগরণ শুধু ঢাকাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল না, ঢাকার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। শুধু তাই নয়, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এতে অংশগ্রহণ করেছিল। তবে সংবাদ-সাময়িকপত্র এবং সভাসমিতির উদ্যোগী তথা বুদ্ধিজীবীরা ঔপনিবেশিক কাঠামোয় কি আচরণ করেছিলেন, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এ দু'টি ক্ষেত্রে তাদের কর্মকান্ডে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন, পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী হচ্ছে মুসলমান কিন্তু এখানে কি মুসলমানদের কথা তেমনভাবে আলোচিত হয়েছে?

আগেই উল্লেখ করেছি, সম্প্রদায়গত ভাবে নয়, সামগ্রিকভাবে এখানে সমাজকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে, সমাজের প্রাথমিক উপাদান

হিসেবে বিচার করেছি জনসাধারণকে, তারপর এসেছে ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়। তবে এটা ঠিক, পূর্ববঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রদায়ের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। তাই, যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সেখানে সম্প্রদায়ের প্রশ্ন আলোচনা করেছি। কিন্তু সম্প্রদায়কে বিচার করেছি সমাজগঠনের মধ্যেকার শ্রেণী বিন্যাসের পরিসরে।

৬. ব্যবহৃত আকর

সামাজিক ইতিহাসের নির্দিষ্ট কোন উপাদান নেই। সরকারী নথিপত্র, জীবনচরিত, রাজস্ব বিবরণ সবই সামাজিক ইতিহাসের আকর। তবে বাংলাদেশে, পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন সরকারী নথিপত্রের ওপর। বর্তমান গ্রন্থে সরকারী নথিপত্র ব্যবহার প্রসঙ্গে ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থার চরিত্র বিশ্লেষণ করেছি। সেই সঙ্গে গুরুত্ব আরোপ করেছি সমসাময়িক কালে প্রকাশিত বইপত্র ও সাময়িকপত্রের ওপর। অনালোচিত তথ্যই ব্যবহারের চেষ্টা করেছি বেশী। সংবাদ-সাময়িকপত্র ব্যবহার করেছি মধ্যশ্রেণীর মানস বোঝার জন্যে। এ ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গ থেকে উনিশ শতকে প্রকাশিত 'ঢাকা নিউজ', 'ঢাকা প্রকাশ', 'বেঙ্গল টাইমস' এবং 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কারণ এখানেই বোধহয় প্রথম এগুলি বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হল।

তথ্য নির্দেশ

১. Jean Hecht, 'Social History', David L, Sills (ed.), *International Encyclopaedia of Social Science* (এর পর উল্লিখিত হবে IESS নামে), Vol, V and VI, New York, 1972, p. 455.
২. E.J. Hobsbawm, 'From Social History to the History of Society',. F. Gilbert and S.R. Grambard (eds) *Historical Studies Today*, New York, 1972, p. 2.
৩. ঐ
৪. Peter Laslett, 'History and Social Sciences', *IESS*, Vol. V and VI, p. 434.
৫. বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত ও সংকলিত), সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চারখণ্ড। প্রতিটি খণ্ডই প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা থেকে। খণ্ডগুলি প্রকাশের সময়কাল, যথাক্রমে, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৬।

৬. যেমন তাঁর "বাংলার নবজাগৃতি" (কলকাতা, ১৯৭৯) গ্রন্থে, 'বাংলার নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস' নামক প্রবন্ধে একই সঙ্গে তিনি ব্যবহার করেছেন, সরোকিন, ফন মার্টিন, কার্ল মার্ক্স, কার্ল ম্যানহেইম এবং মরিস ডবের বক্তব্য।
৭. Abdul Karim, *Social History of the Muslims in Bengal (down to A. D. 1538)*, Dacca, 1959.
৮. Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Karachi, Vol. 1, 1963 ; Vol. II, 1967.
৯. ঐ, ভূমিকা।
১০. এ পরিপ্রেক্ষিতে সুশোভন সরকার লিখেছেন, 'এই স্বাভাবিক শক্তিগুলি অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও সমাজ জীবনে প্রচুর পরিবর্তন ও রূপান্তর লক্ষ্য করা মোটেই বিচিত্র নয়। আসলে মানুষের ইতিহাস গড়ে ওঠে নানা সংঘাত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে'। সুশোভন সরকার, 'অতীত ও বর্তমান,' "সমাজ ও ইতিহাস" কলকাতা, ১৩৬৪ (বাংলাসন) পৃ ১৭৪-১৭৫।
১১. Azizur Rahman Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856)*, Dacca, 1961.
১২. আনিসুজ্জামান, "মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য", ঢাকা, ১৯৬৪।
১৩. A.F. Salahuddin Ahmed, *Social Ideas and Social Change (1818-1835)*. Leiden, 1965.
১৪. Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal*, Dacca, 1974.
১৫. বাঙালীর আকার মাঝারি, তবে ঝোঁক খাটোর দিকে, চুল কালো, চোখের মনি হালকা থেকে ঘন বাদামী, গায়ের রংও ঐ রকম, মুখ সাধারণতঃ লম্বাটে, নাক মাঝারি। বা অন্যভাবে বলা যেতে পারে, আদি-অস্ট্রেলীয় বা কোলিডদের দীর্ঘ মুণ্ড, প্রশস্ত নাক; মিশর এশীয় বা মেলানিডদের দীর্ঘ ও মাঝারি নাক এবং দীর্ঘ মুণ্ড ও অ্যালপাইন বা পূর্ব ব্রাকিডদের উন্নত নাক ও গোল মুণ্ডর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে বাংলার জনসমষ্টি। রক্তে মিশ্রণ ঘটেছে নিগ্রোবটু, মোঙ্গলীয় এবং আদি নর্ডিক বা খাঁটি ইণ্ডিডের। এই 'বিচিত্র সঙ্করজন' নিয়েই 'বাঙলার ও বাঙালীর ইতিহাসের সূত্রপাত।' নীহার রঞ্জন রায়, "বাঙালীর ইতিহাস" (আদি পর্ব) কলকাতা, ১৯৮০, পৃ ৩৭, ৪৯।
১৬. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৮০৬।
১৭. ঐ, পৃ ৮৩৭।
১৮. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, Amalendu Guha, *The Indian National Question : A Conceptual Frame* (Occassional Paper No. 45 of the Centre for Studies in Social Sciences), Calcutta, April 1982, p. 2.

১৯. ঐ।

২০. ঐ, পৃ ৭।

২১. ঐ, পৃ ৮।

২২. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ ১৪০।

২৩. ঐ, পৃ ১৬৩।

২৪. গোপাল হালদার, (সম্পাদিত), "সোনার বাংলা", প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ ৪।

২৫. Nafis Ahmed, *An Economic Geography of East Pakistan*, London, 1968, p. 6.

২৬. Hiteshranjan Sanyal 'Temple-building in Bengal from the Fifteenth to the Nineteenth Century', Barun De (ed), *Perspectives in Social Sciences I*, Calcutta, 1977, p. 128.

২৭. বর্তমান বাংলাদেশের আয়তন ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইল এবং নদী ও শাখা-প্রশাখা সমূহের সংখ্যা ২৩০। *Statistical Pocket Book of Bangladesh 1978* (Bangladesh Bureau of Statistics), Dacca, 1977, pp. 8-9.

প্রথম অধ্যায়

পূর্ববঙ্গ ঃ চিহ্নিতকরণ

আমার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু পূর্ববঙ্গ। কিন্তু আলোচনাকালে পূর্ববঙ্গকে আবহমান ঐতিহ্য থেকে একেবারে আলাদা করে বিচার করা যাবে না, সমীচীনও হবে না। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছিলেন, একটি বিশেষ প্রাকৃতিক সীমার আবেষ্টনীর মধ্যেই জাতি ও ভাষার বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। এবং "এই জন ও ভাষার একত্ব-বৈশিষ্ট্য লইয়াই বর্তমান বাংলাদেশ এবং সেই দেশ চতুর্দিকে বিশিষ্ট ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা বেষ্টিত। বর্তমান রাষ্ট্রসীমা এই প্রাকৃতিক ইঙ্গিত অনুসরণ করে নাই সত্য, কিন্তু ঐতিহাসিককে সেই ইঙ্গিতই মানিয়া চলিতে হয়, তাহাই ইতিহাসের নির্দেশ।"[১] কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা এও লক্ষ্য করি, ভাষা ও জাতি হিসেবে একটি ভৌগোলিক এককের মধ্যে একাত্মতা গড়ে উঠলেও অনেক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক এবং লোকজ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা পূর্ববঙ্গ (বা বর্তমান বাংলাদেশ) এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। নিসর্গত দিক থেকেও উভয় বঙ্গের পার্থক্য স্পষ্ট, কারণ, পূর্ববঙ্গ নদীমাতৃক অঞ্চল।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমানে দু'ভাবে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। একদিকে, আবহমান বাংলা-সৃষ্ট ঐতিহ্য এবং ঐ ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরা হয়েছে পূর্বঙ্গের নিসর্গগত এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে, ইতিহাসের বিশেষ পরিসরে (১৮৫৭-১৯০৫) বিশ্লেষণ করা হয়েছে, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য।

পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীর মানসিকতা তৈরী হয়েছে ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রকৃতির প্রভাবের ফলে। পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের কথা মনে হলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে নদী, নৌকা, সবুজ গাছ-গাছালি,

আর দিগন্ত-বিস্তৃত সমভূমি। এই নিসর্গ বা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য কি ভাবে প্রভাবিত করেছে বাঙালী মন ও জীবনকে নীচের অনুচ্ছেদগুলিতে আমি তাই আলোচনা করবো।

নদী

নদী বাঙালীর প্রাণ, সে সবসময় থাকতে চেয়েছে নদীর কাছে, ভালবেসে নদীর নাম দিয়েছে মধুমতী, ইছামতী, দুধকুমার বা কর্ণফুলি।[২] 'দেহে যেমন শিরা ও ধমনী, এ দেশে তেমনি নদনদী।'[৩]

বিজ্ঞানীদের মতে, নদীর ব প্রদেশের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে উত্থান-পতন।[৪] এবং 'নদ-নদীর গতি হ্রাস, বৃদ্ধি বা পরিবর্তন এবং ব প্রদেশের উত্থান-পতনের সঙ্গে বাঙালীর বাণিজ্য, রাষ্ট্র ও কৃষ্টির বিশেষ সম্পর্ক।'[৫]

তাই বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশের নদী এ অঞ্চলকে এবং এর মানুষকে গড়েছে ভেঙেছে। তলিয়ে গেছে নদীর জলে অনেক লোকালয়, কীর্তি। এ কারণেই বোধহয় বাংলার মানুষ নদীর আরেক নাম দিয়েছে কীর্তিনাশা। নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) নদীর ভাঙাগড়া দেখে একবার অবাক হয়ে লিখেছিলেন, 'যেখানে সরোবর দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখন সমভূমি, যেখানে গ্রাম দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখন নদী-গর্ভস্থ অমল ধবল সৈকত ভূমি।'[৬]

বাংলাদেশের নদীপ্রবাহ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। আমাজান প্রবাহের পরই, মোট প্রবাহের পরিমাণের দিক থেকে পদ্মা-মেঘনার স্থান। এ ছাড়া বাংলাদেশে মাকড়শার জালের মত নদীনালা খালের দৈর্ঘ্য হবে কমপক্ষে পনের হাজার মাইল।[৭] এর মাঝে আছে খরস্রোতা পার্বত্য নদী, শান্ত ক্ষীণকায়া উপনদী বা শাখানদী বা পদ্মা মেঘনার মত উত্তাল নদী।

বাংলাদেশের নদী সংস্থানকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

১. গঙ্গা বা পদ্মা এবং এর বদ্বীপ

২. মেঘনা এবং সুরমা প্রবাহ

৩. ব্রহ্মপুত্রের শাখা প্রশাখা

৪. উত্তরবঙ্গের নদীসমূহ

৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সংশ্লিষ্ট সমতলভূমির নদী।[৮]

প্রতিটি নদী পূর্ব বা দক্ষিণ প্রবাহিনী। আর যে সময়টিতে নৌকা

সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় সে সময় বায়ু প্রবাহিত হয় পূর্ব এবং দক্ষিণে। সুতরাং বিনা আয়াসে বা পাল তুলে নৌকা চলতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি-প্রদত্ত এ সুবিধা না থাকলে বর্ষায় দুকূল ছাপানো যমুনা বা মেঘনায় নৌকো বাওয়াই মুশকিল হয়ে উঠতো, বন্ধ হয়ে যেত নৌপথের সব ব্যবসা-বাণিজ্য।[৯]

প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার অভাবে বাংলার বিভিন্ন প্রদেশের বা অঞ্চলের সীমারেখা নির্ণয় করতো এই নদী। সুতরাং নদীর প্রবাহ বদলে গেলে সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করতো। এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে—হিউয়েন সাং (৬৩০-৪৩ খৃঃ) যখন বাংলায় এসেছিলেন তখন করতোয়া ছিল এক বিশাল নদী যা পুন্ড্রবর্ধনকে (উত্তরবঙ্গ) আলাদা করে রেখেছিল কামরূপ (আসাম) থেকে। পরবর্তীকালে এ প্রবাহ মরে গিয়েছিল এবং যমুনা হয়ে উঠেছিল উত্তরবঙ্গ ও আসামের সীমানা।[১০]

পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে নদী। নদী জল-নিঃসারক, জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক, মৎস্যের আধার। নদী আবার শস্তা ও সহজ জলপথ। এ প্রসঙ্গে রেনেলের (১৭৮১) উক্তি স্মতর্ব্য—বাংলার নদনদী কমপক্ষে তিরিশ হাজার মাঝির অন্ন যোগাচ্ছিল।[১১]

বাংলাদেশের নদীগুলির প্রধান কাজ ভূমি নির্মাণ করা। কখনও কখনও কয়েকটি নদী একত্রিত হয়ে এ কাজ শুরু করে। বহতা নদীর পলি সম্পূর্ণ করে ভূমির পরিবর্তন। তারপর একজায়গার কাজ শেষ হলে হয়ত দেখা যায় নদী মজে যাচ্ছে। তখন অন্যদিকে ঠিক একই ভাবে কাজ শুরু হয়। নদী যে দিকে বয়ে যায় তার দুকূলে লোকে বসতি স্হাপন করে। নদী মরে গেলে খাত থেকে যায়, বসতিও হয়ত থাকে, নয়ত নতুন প্রবাহের পাশে আবার স্হাপিত হয় বসতি।[১২]

কিন্তু বাংলার সব নদনদীই পরিবর্তনশীল। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ১৭৬৫ থেকে ১৭৭৩ সাল পর্যন্ত রেনেল উত্তর এবং উত্তর-পূর্ববঙ্গের নদীগুলি জরীপ করে এক মানচিত্র প্রণয়ন করেছিলেন। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর পর বুকানন হ্যামিলটন (১৮০৯) সে একই পথ পরিভ্রমণ করতে গিয়ে দেখেছিলেন, পুরনো প্রবাহ খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর।[১৩]

নদীর প্রবাহ বা খাত পরিবর্তন জনজীবনের ওপরও প্রভাব বিস্তার

করে। খাত পরিবর্তনের অর্থ বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের রূপান্তর শ্রীহীন অঞ্চলে। প্রাচীনকাল থেকেই এ রকমটি হয়ে আসছে। একসময়, গঙ্গা যখন মেদেনীপুর অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হত তখন তাম্রলিপ্ত বা তমলুক হয়ে উঠেছিল পূর্বভারতের প্রধান বন্দর, সমৃদ্ধিশালী এক অঞ্চল। সপ্তগ্রামও ছিল মধ্যযুগের একটি নামী বন্দর। কিন্তু নদী মজে যেতে থাকলে সপ্তগ্রামও পরিণত হয়েছিল শ্রীহীন অঞ্চলে। সতের শতকে রূপনারায়ণ পড়েছিল নির্জীব হয়ে কিন্তু অন্যদিকে জেগে উঠেছিল গড়াই, জলাঙ্গী আর মাথাভাঙ্গা। আঠারো শতকে প্রবল হয়ে উঠেছিল তিস্তা, যমুনা এবং কীর্তিনাশা। 'আজ ছ'শো বছর ধরে গংগা নদী চলছে পূর্ব দিকে বয়ে—পুরনো বন্দর, শহর আর গ্রাম হয়েছে প্রাণহীন, এসেছে ধ্বংস আর পরিবর্তন।'[১৪]

নদী মরে গেলে তার তীরবর্তী অঞ্চলের অবস্থা কি হয় সে সম্পর্কে আরো দু'একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। আমার আলোচ্য সময়ে, ভৈরব, কপোতাক্ষ ও যমুনার খাত মজে যেতে থাকলে যশোহর-খুলনা অঞ্চল, বিশেষ করে যশোহরের ক্ষয় শুরু হয়েছিল। ১৮৮১ সালে যশোহর জেলার (মাগুড়া ও নড়াইল বাদে) লোক সংখ্যা ছিল ১২৯৭৯০০ জন। ১৮৯১ সালে তা'হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ১২৩৭০০৯ জনে। হ্রাসের হার ছিল -৬.১।[১৫] যশোহরের বিভিন্ন মহকুমা থেকে লোক হ্রাস পেলেও, দেখা গেছে ঐ একই সময় লোক বৃদ্ধি পাচ্ছিল নড়াইল ও মাগুরায়। কারণ, নড়াইলের পাশে তখন চিত্রা নদী বহতা। এ দু'টি অঞ্চলে, ১৮৮১ সালে লোকসংখ্যা ছিল ৩০১,৫১২ জন। ১৮৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩২০,৯২২ জনে। বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৮ ভাগ।[১৬] অন্যদিকে ঝিনাইদহ মহকুমায় লোক সংখ্য হ্রাস পেয়েছিল বেশী। ১৮৯১ সালে এ মহকুমার লোকসংখ্যা ছিল ৩১১,৯৭৩ জন। হ্রাসের হার ছিল -৪.৫ ভাগ।[১৭] এর কারণ ঐ অঞ্চলের প্রায় সব নদীই গিয়েছিল শুকিয়ে। মৃত নদীগুলি ছিল আবার ম্যালেরিয়ার জন্মস্থল। ফলে ম্যালেরিয়াও ঐ অঞ্চলে জনসংখ্যা হ্রাসে সহায়তা করেছিল।

শুধু প্রকৃতিগত কারণেই নয়, অনেক সময় বাঁধ দেয়ার ফলে বা অন্য কোন কারণে নদীর প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হলে নদীর খাত শুকিয়ে যায়। শস্য শ্যামলা স্হান হয়ে ওঠে রুক্ষ। যেমন, বাগেরহাটের কাছে খাল কাটার ফলে ভৈরব নদী গিয়েছিল ভস্মাট হয়ে।[১৮] এ

ছাড়া আমার আলোচ্য সময়ে, পূর্ববঙ্গে যখন রেলওয়ের বিস্তার হচ্ছিল, তখন রেল লাইন বসাবার জন্যে বাঁধ দিতে হয়েছিল অনেক জায়গায়, ফলে তা বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল অনেক নদীর প্রবাহে। পশ্চিম এবং দক্ষিণের নদীগুলির অহরহ পরিবর্তন এবং মৃতাবস্থার ফলে ঐ সব অঞ্চলে হ্রাস পেয়েছিল কৃষি উৎপাদন ও জনসংখ্যা এবং হানি ঘটেছিল জনস্বাস্থ্যের। নদীর ব্যবহারের সঙ্গে কৃষককে খাপ খাইয়ে নিতে হয় ফসল পরিবর্তন করে। যেমন, এসব অঞ্চলে আমন ধান উৎপাদনে নদীর পরিবর্তন বিষম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।[১৯]

নদী যেমন পলিমাটি দিয়ে জমি উর্বর করে তেমনি নদীর খাত মরে গেলে, সেই খাতে পানি জমে হয় বিল। নদীর মাঝে আবার অনেক সময় পলি ভরাট হয়ে সৃষ্টি করে চর বা দিয়াড়ার। সুতরাং নদীর সঙ্গে খালবিল চরের কথা প্রাসঙ্গিক, যার সংখ্যা পূর্ববঙ্গে নেহাৎ কম নয়।

সতীশচন্দ্র (১৯১৪) নদী আর বিলের প্রভেদ ও জনজীবনে এর প্রভাবের কথা বর্ণনা করেছেন সুন্দরভাবে। বিলের ভিতরে এবং খানিকটা বাইরে বর্ষার পর বেশ পানি জমে থাকে, সে জন্যে সেখানে ভালো আমন হয়। বর্ষাকালে পানি পেলে হয় আউস এবং কার্তিক অগ্রাহায়ণে কলাই, সরিষা প্রভৃতি। ক্ষেতের পাশে কৃষকের বাড়ী, কাছে বিল, তাতে প্রচুর মাছ।[২০]

নদীর যখন কূল ভাঙ্গে তখন বিনষ্ট হয় কৃষিক্ষেত্র, লোকজনকে ত্যাগ করতে হয় অনেক দিনের গড়ে-তোলা বসতি। নদীর ভাঙ্গন থেকে উদ্ভব ঘটে চরের, আর চর মানে নতুন জমি, নতুন বসতি। নদীর ভাংগন, এবং আবার নতুন আশ্রয়ের খোঁজে পুরানো আশ্রয় ত্যাগ, পূর্ববঙ্গের মানুষের কাছে কোন বিস্ময় নয়।[২১]

বাংলাদেশের সজীব নদী অঞ্চলে এই চর বা দিয়াড়া এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নদীতে চরের বিলুপ্তি কৃষিযোগ্য জমি হ্রাস করে আবার অন্যদিকে নতুন চরের উৎপত্তি সৃষ্টি করে নতুন বসতি, কৃষি এবং বাড়তি জনসংখ্যার আবাস ও মামলা মোকদ্দমার।[২২]

জমিই বাঙালীর জীবিকার প্রধান নির্ভর এবং তা' সীমিত। তাই চর মানেই নতুন জমি। ফলে প্রাচীনকাল থেকেই চর নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদের শেষ নেই। বাংলাদেশে প্রবাদই আছে, 'জোর যার চর তার'।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের পূর্ব পর্যন্ত দেখা গেছে, নতুন চরের মালিক হচ্ছে সবসময়ই জমিদার এবং জোতদাররা। অর্থাৎ শক্তিমানরা। এখনও তার তেমন হেরফের হয় নি। এবং এখনও বাংলাদেশে চর দখলের আগে কৃষকরা পরিবার পরিজন থেকে বিদায় নিয়ে যায়। কিন্তু যারা চরের জন্যে প্রাণ দেয় চর তাদের ভোগে আসে না বললেই চলে। সে জমি চলে যায় ধনী কৃষক বা জোতদারের দখলে।[২৩]

চরে যারা বাস করে তাদের চরিত্র সমতলভূমির লোক থেকে একটু আলাদা। কারণ চর অহরহ ভাঙ্গে গড়ে। তাই চরের লোকদের জীবন অস্থির। প্রকৃতির বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম এদের করে তোলে সাহসী এবং সংগ্রামী। এইভাবে অনবরত লড়াই করতে হয় বলে এরা হয়ে ওঠে, 'সরল, উদার, সংঘবদ্ধ ও বহির্মুখী।'[২৪] অন্যদিকে সমতলভূমির মানুষ চরবাসীর তুলনায় খানিকটা নমিত এবং ততোটা বহির্মুখী নয়।

সেজন্য, বাঙালীর প্রধান সমস্যা 'জলের সঙ্গে স্থলের বিপ্লব।' বাংলাদেশের সমৃদ্ধি নির্ভরশীল নদীর সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের ওপর; তবে নদীর চরিত্র বাঙালীকে করেছে উদার, বিবাগী তেমনি করেছে সংগ্রামী।[২৫]

পার্বত্য অঞ্চল ও সমতলভূমি

প্রকৃতি ও নিসর্গের দিক থেকে পূর্ববঙ্গকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে (১) উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের পর্বতমালা এবং (২) বিস্তৃত পলিমাটির সমতলভূমি।

১. উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের পর্বতমালা

পূর্বে সিলেট ঘিরে বা আরো নির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে উত্তর এবং উত্তর-পূর্বে আছে ছোট পাহাড় বা টিলা। উচ্চতায় এগুলি সাধারণতঃ একশো থেকে দুশো ফুট। টিলা আছে কিছু সুরমা এবং কুশিয়ারার মাঝে, গোপালগঞ্জ ও মধুগঞ্জের কাছে। কুশিয়ারার দক্ষিণে আছে দু'টি পাহাড়ের সারি যেগুলি সমুদ্র থেকে খুব বেশী হলে আটশো ফুট উঁচু। এগুলি হল, পূর্ব থেকে পশ্চিমেঃ পাথারিয়া, লাংলা, রাজ-কান্দি, কালিমারা, সাতগাও এবং রঘুনন্দন।[২৬]

নদী ও প্রশস্ত সমতলভূমির একঘেঁয়েমিতে বৈচিত্র্য এনেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম। এখানে সবচেয়ে উঁচু পাহাড় কিওক্রি ডাংয়ের উচ্চতা ৪০৩৪ ফুট। এ দিকে আছে দশটি পর্বতমালা—বাসিতাং,

মারাঙ্গা, কায়ামারাং, বিলাইছড়ি, ভাঙ্গামুরা, বাটি মইন, বরকল, সিতা-পাহাড় এবং ফটিকছড়ি। এগুলি অধিকাংশই ঘন জঙ্গলে আবৃত, মাঝে মাঝে আছে ছোট ঝর্ণা বা ছরা। চট্টগ্রামের উপকূল ঘিরে আছে সীতাকুণ্ড ও চন্দ্রনাথ পাহাড়।[২৭]

পার্বত্য চট্টগ্রাম বা সিলেটের একাংশে বাস করেন বিভিন্ন উপজাতি। সিলেটের প্রধান উপজাতি হল—খাসিয়া, মিথেরি, পাথর এবং ত্রিপুরা।[২৮] পার্বত্য চট্টগ্রামে আছেন মগ, চাকমা, ত্যাংচাঙ্গা, ত্রিপুরা শক, মুরং, গারো, থিয়াং, বনযোগী, পাংখো, এবং খাসি। এ ছাড়া ময়মনসিংহ ও দিনাজপুর অঞ্চলে আছেন গারো এবং সাঁওতাল।[২৯]

পাহাড়ের জগৎ আলাদা। প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা যেমন তাদের বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে তেমনি নদীমাতৃক সমভূমি থেকেও তারা হয়ে পড়েছেন খানিকটা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তাই বলে যে পাহাড়ের অধিবাসীরা একেবারে স্বতন্ত্র জীবন যাপন করেন তা'নয়। সমতলভূমির অধিবাসীদের মতই তারা গ্রামের বাসিন্দা। এদের অনেকে গ্রহণ করেছেন বৌদ্ধ, খৃষ্টান ধর্ম। যেমন, ময়মনসিংহের গারোদের সঙ্গে বাঙালী সংস্কৃতির পরিচয় অনেক দিনের।[৩০] পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমারা বাংলায় আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলায় কথা বলেন। বর্তমানে সমতলভূমির সঙ্গে উপজাতিরা আরো বেশী পরিচিত হচ্ছেন।

তবে সমতলভূমিকে ভয়ের চোখে দেখেন পার্বত্য অধিবাসীরা; কারণ সমতলভূমি দ্বারা তারা শোষিত হয়েছেন। ব্রিটিশ শাসনের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রথমে একটি প্রশাসনিক এলাকা হিসেবে ধরা হয়েছিল। তারপর থেকে হয় সমতলবাসীরা নয় পাহাড়িয়ারা পরস্পরের বিরুদ্ধে কখনও না কখনও অভিযান চালিয়েছে, এবং একসময় সমতলের সঙ্গে এদের সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে শুধু খাজনা প্রদানের।

ব্রদেল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমুদ্র-তটবর্তী সভ্যতার সঙ্গে পার্বত্যবাসীদের সম্পর্কহীনতার কথা বলেছেন। পার্বত্যবাসীরা সবসময় নিজেদের স্বায়ত্বশাসিত দেখেছেন।[৩১] পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল এবং ব্রিটিশ সরকার কোন সময় তাদের ওপর খুব বেশী প্রশাসন চাপিয়ে দিতে চায়নি। বলা

যেতে পারে, পূর্ববঙ্গে বসবাসরত উপজাতিরা সমতলভূমিকে প্রভাবিত করতে পারেনি কিন্তু কোন না কোন ভাবে সমতলভূমি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন—এ-কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

২. সমতলভূমি

পূর্ববঙ্গের বদ্বীপ সমভূমিকে তিনটি প্রধানভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

ক. পশ্চিম বদ্বীপ সমভূমি (কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের উত্তরাংশ ও খুলনার উত্তরাংশ),

খ. পূর্ব বদ্বীপ সমভূমি (মধ্য ও দক্ষিণ ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জ),

গ. বদ্বীপে মোহনা বা সুন্দরবন এবং দক্ষিণ পশ্চিম বরিশাল।

নফিস আহমদ (১৯৫৮) লিখেছেন, যদি ফরিদপুর শহরের উত্তর থেকে সাতক্ষীরার দক্ষিণ পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর একটি কাল্পনিক রেখা টানা যায় তা'হলে এই রেখার উত্তর এবং পশ্চিমে হবে মৃত ও মৃতপ্রায় নদীর এলাকা। কিন্তু পূর্বে আছে সজীব নদী দ্বারা গড়ে ওঠা অঞ্চল।[৩২]

পদ্মা, যমুনা এবং মেঘনার পাশে সমতলভূমি হল ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, কুমিল্লা এবং সিলেটের কিছু অংশ। আর উত্তরে পুরনো পাললিক এলাকায় পড়ে দিনাজপুরের কিছু অংশ, রংপুর, বগুড়ার কিছু অংশ এবং রাজশাহী।[৩৩]

বাংলাদেশের এই একঘেঁয়ে দিগন্ত-বিস্তৃত সমতলভূমিতে খানিকটা বৈচিত্র এনেছে তিনটি সুস্পষ্ট পুরনো এলাকা। এগুলি হল—মধুপুর, বরেন্দ্র এবং লালমাই।

মধুপুরের আয়তন প্রায় ষোল হাজার বর্গ মাইল। এ এলাকার বিস্তৃতি ময়মনসিংহ জেলার কেন্দ্র থেকে ঢাকার উত্তরাংশ পর্যন্ত এবং এ অঞ্চলের মাটি রক্তিম। ময়মনসিংহের উত্তরাংশ, জয়দেবপুর, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর জুড়ে আছে দীর্ঘ গজারির জঙ্গল আর এর ধার ঘেঁষে আছে যমুনা, পুরনো ব্রহ্মপুত্র এবং ধলেশ্বরী।[৩৪]

বরেন্দ্রর আয়তন প্রায় ৩,৬০০ বর্গ মাইল। এই একই পরিমাণ জায়গা এখন অন্তর্গত পশ্চিম বঙ্গের। বরেন্দ্রর অন্তর্গত হল রংপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ দিনাজপুর, বগুড়ার উত্তর-পশ্চিমাংশ এবং রাজশাহীর দক্ষিণ পশ্চিমাংশ। মাটি এখানকার হলদে থেকে লাল। এর

মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু জলাজংলা আর বিশাল বৃক্ষ।[৩৫]

কুমিল্লার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের অল্প কিছু জায়গা লালমাই'র অন্তর্গত। লালমাই পাহাড় নামে এ এলাকা পরিচিত ; যদিও elevation কোথাও ২০ থেকে ৪০ ফুটের উঁচু নয়।[৩৬] মাটি এখানকার রক্তিম।

মানুষ সবসময় সমতল ভূমি জয় করতে চেয়েছে, কারণ সমতলভূমির জয় মানুষের আজীবনের স্বপ্ন।[৩৭] কিন্তু বিনা আয়াসেই কি তা সম্ভব? বোধ হয় নয়। আমি এখানে আগে আলোচনা করবো উনিশ শতকের গোড়া থেকে বাংলাদেশের সমতলভূমির রূপ কি ছিল, এ ভূমি জয় করতে সাধারণ মানুষকে কি কি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং আমাদের আলোচ্য সময়ে এ পরিপ্রেক্ষিতে ধারাটি কি রূপ ছিল?

১৮০০ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জেলা জজদের কাছে লিখিত আকারে কিছু প্রশ্ন পাঠিয়েছিল দেশের হালচাল জানার জন্য। ঢাকা বিভাগের জজ এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন, দশ বছর আগে (অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে) যা ছিল তা থেকে এখন তাঁর এলাকার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। আগে লম্বা লম্বা ঘাস, আগাছা আর জঙ্গলে ভরে ছিল সম্পূর্ণ এলাকা যেখানে অহরহ ঘুরে বেড়াত হিংস্র জন্তু জানোয়ার। এখন সে এলাকা পরিষ্কার করা হচ্ছে এবং গড়ে উঠছে বিভিন্ন সব গ্রাম।[৩৮] ১৮৬৯ সালে সংবাদপত্রের এক সংবাদে জানা যায়, "ফরিদপুর নগর পুনরায় জঙ্গলাকীর্ণ হইতেছে......।"[৩৯] আরেকটি সংবাদে জানা যায়, উত্তরাঞ্চলে অনেক বসতি স্থাপন করতে চাচ্ছিলেন, "...কিন্তু তৎপ্রদেশে অরণ্যই কেবল এই কার্য্যের বৃহদন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। যদি গবর্ণমেন্ট মনোযোগী হইয়া রংপুর ও দিনাজপুরের অরণ্য পরিষ্কার করাইতেন..."[৪০] তা'হলে সেই অঞ্চল বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠতো।

এ ছাড়া ছিল বন্যজন্তুর উপদ্রব। ১৮০০ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জেলা জজ, সরকারের এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন, ঢাকা জেলার কৃষকরা সবসময় বাঁশের লাঠি ঘরে মজুদ রাখে এবং ক্ষেতে কাজ করার সময় সেই লাঠি কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যায় বন্যজন্তুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যে। বিশেষ করে

বন্য বরাহের উৎপাতে তারা সবসময় শংকিত থাকতেন।[৪১]

প্রায় পুরো পূর্ববঙ্গে উনিশ শতকে বন্যবরাহ এবং বাঘের আধিক্য ছিল বেশী। বন্যবরাহ শিকার ছিল ইংরেজ সিভিলিয়ানদের জন্যে অবকাশ কাটানোর প্রধান মাধ্যম। ১৮৫০ এর দিকেও হাতিয়া, দাউদকান্দি, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, পাবনা, দিনাজপুর, রংপুর ও রাজশাহীতে বন্য বরাহের সংখ্যা ছিল প্রচুর। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরে এবং রংপুরে পাওয়া যেত গণ্ডার। বন্য মহিষের দেখা পাওয়া যেত বাখরগঞ্জে।[৪২] আর ছিল বাঘ। ১৮৬০ এর চট্টগ্রাম সম্পর্কে ইংরেজ সিভিলিয়ান ক্লে লিখেছিলেন, দিনে দুপুরে সেখানে বাঘের গর্জন শোনা যেত।[৪৩] সিমসন (১৮৪৭) লিখেছিলেন, ব্রহ্মপুত্রের চরে একদিনে তিনি পাচটি বাঘ শিকার করেছিলেন।[৪৪] ১৮৬০এর দিকেও পাবনায় বাঘের উৎপাতে লোকজন শংকিত থাকতো। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য জানিয়েছেন, ঐ সময় 'রাত্রিতে আঙ্গিনায় বাঘ আসিত।'[৪৫] ১৮৭০ এর এক সংবাদে জানা যায়, মানিকগঞ্জে 'ব্যাঘ্রের অতিশয় প্রাদুর্ভাব' হয়েছিল, 'এমনকি সন্ধ্যার পরই ঘরের বাহির হওয়া দুষ্কর কিঞ্চিৎ অধিক রাত্রি হইলেই ব্যাঘ্র গর্জনে গ্রাম কাঁপিতে থাকে'।[৪৬]

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা গ্রামের আশেপাশে কিছু ক্ষেতখামার ছাড়া সমতলভূমির প্রায় অধিকাংশ ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। ১৮৫০এর দিকেও চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা যাওয়ার রাস্তা ছিল জঙ্গলে ঢাকা।[৪৭]

সে জন্যে উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের চিত্র হল—খালবিল নদীনালা অধ্যুষিত প্রায় জঙ্গলাকীর্ণ এক এলাকা যেখানে সিভিলিয়ানরা তাদের পোস্টিংকে মনে করতেন শাস্তি হিসাবে।[৪৮] একদিকে, সাধারণ মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে এই জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা পরিষ্কার করে আবাদ করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে, ঔপনিবেশিক শাসকরাও উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন তাদের। কারণ পতিত জমি আবাদ মানেই রাজস্ব বৃদ্ধি।

কিন্তু বিনা আয়াসে বাংলাদেশের মানুষ এই সমতলভূমি জয় করতে পারেনি, অহরহ তাকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল প্রচুর প্রতিবন্ধকতার। বন্যজন্তুর আক্রমণ ইত্যাদি ছাড়াও তাকে যে দু'টি বিশেষ সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছিল তা হল বন্যা এবং মহামারী।

বন্যা

বাংলাদেশের জনজীবনে বন্যা নতুন কোন ঘটনা নয়। প্রতি বছর বাংলাদেশে কোন না কোন অংশের মানুষকে বন্যার সঙ্গে লড়াই করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্যা হয়ে ওঠে সম্পদহানি ও প্রাণ নাশের কারণ। তবে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি না পেলে তা তেমন বিপদের কারণ হয়ে ওঠে না।

১৮৮১ সালে রাজশাহীর লোকসংখ্যা ছিল ১৩৩১১৭৪ জন। ১৮৯১ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৩১৩৩৩৬ জনে।[৪৯] হ্রাসের হার ছিল ১.২ ভাগ। এর কারণ হিসেবে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রাইস জানিয়েছিলেন, গঙ্গার বন্যার ফলে প্রচুর বালি জমা হয়েছিল, ফলে কমে গিয়েছিল জমির উর্বরা শক্তি এবং লোকে বদল করছিল বসতি।[৫০]

প্রাকৃতিক দুর্যোগ কি তাণ্ডবের সৃষ্টি করতো তার দু'একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ১৮২২ সালে বাখরগঞ্জে এক ঝড় ও বন্যায় মোট মানুষ ও গবাদি পশুর প্রাণহানি হয়েছিল যথাক্রমে ৩৯৯৬০ ও ৯৮,৮৩০টি। সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১৩২,৬৬৯ পাউণ্ড। এ ছাড়া ঐ জেলায় ১৮২৫, ১৮৩২, ১৮৫৫, ১৮৬৭, ১৮৬৯ ও ১৮৭০ সালে বন্যায় প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল।[৫১] ১৮৯৭ সালে ঝড় ও বন্যায় চট্টগ্রামে মারা গিয়েছিলেন একহাজার জন। ১৮৬৯ সালের এক ঝড়ে সাগরদ্বীপ থেকে শুরু করে পাবনা পর্যন্ত দারুন ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। ঐ ঝড়ে কপোতাক্ষ তীরে ও সুন্দরবনে পানির উচ্চতা দাঁড়িয়েছিল নয় থেকে বারো ফুট। এর ফলে যমুনা নদী, কালীগঞ্জের দক্ষিণে গিয়েছিল একেবারে মরে। ১৮৭৬ সালে এক সামুদ্রিক প্লাবনে সন্দ্বীপ, হাতিয়া, বাখরগঞ্জের সমূহ ক্ষতি হয়েছিল এবং বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালীতে ঐ সময় মৃত্যুবরণ করেছিলেন প্রায় দু'লক্ষ লোক।[৫২]

মহামারী

এরপর ছিল মহামারী, বিশেষ করে কলেরা এবং ম্যালেরিয়া। এ দু'টি রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়ার কারণ ছিল পূর্ববঙ্গের শহর ও গ্রামের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং অপরিকল্পিত ভাবে নদ-নদীতে দেয়া বাঁধ। কলেরা এবং ম্যালেরিয়ার আক্রমনে মাঝে মাঝে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। ঘুষঘুষে জ্বর, পেটের অসুখ ছিল জীবনযাত্রার অঙ্গ।

উনিশ শতকে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন জেলা গেজেটিয়ার, আত্মজীবনী (যেমন দীনেশচন্দ্র সেনের) এবং বাংলা উপন্যাসে (বিশ শতকে লেখা উপন্যাস যেমন, বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' বা 'ইছামতী'তে) এর অনেক বিবরণ পাওয়া যাবে।

বন্যা বা নদীর গতি সামাল দেয়ার জন্য বাঁধ দেয়া নতুন কিছু নয়। বৃটিশ শাসনের পূর্বে রাজশাহী, কুষ্টিয়া এবং যশোর জেলায় আঞ্চলিক সুবিধার জন্যে বাঁধ দেয়া হয়েছিল। ১৮১৯এর পূর্বে ঐ এলাকায় গঙ্গার বাঁ তীর এবং রাজশাহীর বড়াল নদীর দু'তীরে ১৬৬ মাইল বাঁধ দেয়া হয়েছিল।[৫৩]

বাঁধ ছিল তিন রকমের—(ক) জমিদারী বা সংরক্ষণকারী বাঁধ, (খ) রেলওয়ে বাঁধ, (গ) এবং রাস্তা নির্মাণের জন্যে বাঁধ। এগুলির মধ্যে শেষোক্ত দু'টিই ছিল বেশী ক্ষতিকারক।[৫৪] উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে রাস্তা ও রেলওয়ে লাইন তৈরীর জন্যে অনেক জায়গায় বাঁধ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সব বাঁধ সুপরিকল্পিত না হওয়ায় পূর্ববঙ্গের (বিশেষ করে ১৮৬৫ থেকে) উপকার থেকে ক্ষতি হয়েছে বেশী। বেন্টলি ১৯২৫এ বিষয়ে দেয়া তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন, রেলওয়ের জন্যে নির্মিত বাঁধগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই সৃষ্টি করেছিল প্রতিবন্ধকতার, নদীকে করে তুলেছিল মৃতপ্রায়, দেখা দিয়েছিল জলবদ্ধতা, পরিণামে সৃষ্টি হয়েছিল ম্যালেরিয়ার যা আবার সাহায্য করেছিল লোকহানি ও আবাদ হ্রাসে।[৫৫] দু'একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ১৮৩৬ সালে মুহম্মদপুরে যে ভয়াবহ মহামারী দেখা দিয়েছিল তার কারণ ছিল ফরিদপুরের মধ্যে দিয়ে যশোর পর্যন্ত উচুঁ রাস্তা নির্মাণ। এ কথা জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের কমিশনার ১৮৭৪ সালে।[৫৬] ১৮৮৪ সালের স্যানিটারী রিপোর্টেও উল্লেখ করা হয়েছে, ঢাকা ময়মনসিংহে রেল লাইন নির্মাণের সময় ম্যালেরিয়া মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল।[৫৭]

বাঁধ ছাড়া মহামারীর আরকটি প্রধান কারণ ছিল জঙ্গল, বদ্ধ জলাভূমি এবং পয়ঃপ্রণালীর অভাব। ১৮৬৮ সালে ঢাকা জেলার সিভিল সার্জন তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন, জেলার প্রতিটি অঞ্চলে পয়ঃপ্রণালীর অবস্থা লজ্জাজনক। পুরনো গ্রাম বা নতুন চরে স্থাপিত নতুন গ্রাম—সব অঞ্চলের পয়ঃপ্রণালীর অবস্থা ছিল একই রকম—বসন্ত, ম্যালেরিয়া ও কলেরার জন্মস্থল। গ্রামের চারপাশের জঙ্গল, বদ্ধ

জলাশয়, সবকিছু ছড়াতে শুরু করে ম্যালেরিয়া, গ্রামকে গ্রাম যায় উজাড় হয়ে, বেঁচে থাকতো যারা, তারা আবার নতুন বসতির খোঁজে ত্যাগ করতো পুরনো বসতি।[৫৮] ঐ আমলের সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে প্রচুর বর্ণনা পাওয়া যায়। 'পল্লীগ্রামের জঙ্গল' শিরোনামে ১৮৬৯ সালে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' লিখেছিল, "এক একখান পল্লীগ্রাম এরূপ ভয়ানক জঙ্গলে আবৃত হইয়া রহিয়াছে যে, সেই সকল গ্রাম হইতে চন্দ্র সূর্যের মুখাবলোকন করা দুঃসাধ্য। তথায় প্রবেশ করিতে বায়ুও সচরাচর সরল পথ প্রাপ্ত হয় না। এই সকল পল্লী গ্রামবাসীদিগের মধ্যেই প্রতিবৎসর অনেক লোক নানা প্রকার উৎকট ব্যধিগ্রস্ত ও গতায়ু হয়। অনুসন্ধান করিলে বঙ্গ দেশের সকল জেলা হইতেই উক্তাবস্থাপন্ন শত শত পল্লীগ্রাম বাহির হইতে পারে।..."[৫৯] ১৮৭০ সালে বরিশালের সিভিল সার্জন লিখেছিলেন, ঐ জেলায় পয়ঃপ্রণালীর কোন বন্দোবস্ত ছিল না, ফলে ঐ অঞ্চলে ম্যালেরিয়া ও কলেরার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ জন্যে তিনি বসতিপূর্ণ এলাকার চারপাশের জঙ্গল পরিস্কার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৬০] 'সোমপ্রকাশ' কুমিল্লার পয়ঃ-প্রণালী সম্পর্কে লিখেছিল (১৮৬৭), "...এখানে মিউনিসিপালিটির হুকুমে পয়ঃনালার ধারের পায়খানা উঠাইয়া গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে কূপ কাটিয়া পায়খানা করিতে হইয়াছে। কুমিল্লায় ন্যূনকল্পেও ৩/৪ সহস্র পায়খানা হয়। এই পায়খানার দোষেই মশার বৃদ্ধি এবং দুর্গন্ধে নানা প্রকার পীড়ার আধিক্য হইতেছে।"[৬১] রংপুরের প্রতিবেশ ছিল ম্যালেরিয়ার অনুকূলে এবং এর কারণ ছিল অসংখ্য বদ্ধজলাশয়, জঙ্গল ইত্যাদি।[৬২]

রংপুর একসময় ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হওয়া সত্বেও ১৮৮১ এবং ১৮৯৮ সালের আদমশুমারীতে দেখা গিয়েছিল জেলার লোকসংখ্যা কমছে। হ্রাসের হার ছিল কুড়ি বছরে প্রায় চার ভাগ।[৬৩] ১৮৭২ সাল ও ১৮৮১ সালের মধ্যে তারতম্যের হার ছিল—৭.০ ; ১৮৮১ থেকে ১৮৯১ সালের মধ্যে—২.৯ (১৮৯১ সালে রংপুরের লোকসংখ্যা ছিল ৬৪৬,৩৮৮)।[৬৪] অস্বাস্হ্যকর আবহাওয়া, জ্বর ও কলেরা ছিল এর কারণ। রংপুরের জ্বর সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রতিবছর প্রায় নিয়মিতই খবর বের হত। যেমন ১৮৬৩ সালে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছিল (রংপুরে), 'প্রতি গৃহেই প্রায় তৃতীয়াংশের একাংশ লোক পীড়িত। জঙ্গল ও দূষিত বায়ুই এই

রোগের কারণ।'[৬৫] ১৮৭৪ সালে রংপুরের সিভিল সার্জন জানিয়েছিলেন, শতকরা আশীভাগ লোক রক্তশূন্যতা এবং জ্বরে ভুগছে। ১৮৮৫-৮৯ সালে জ্বরে রংপুরের প্রতিহাজারে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ২৪'৫২ ভাগ।[৬৬]

দিনাজপুরের অবস্থাও ছিল একই রকম। ১৮৮৫-৮৯ এবং ১৮৯০ সালে যথাক্রমে জ্বর জালায় মৃত্যুর হার ছিল যথাক্রমে ২৫.০৫ এবং ২৫.১০ ভাগ। দিনাজপুর থানায় ১৮৮৩ এবং ১৮৮৪ সালে এ কারণে মৃত্যুর হার ছিল ৭১.৯৪ এবং ৯৩.৫২ ভাগ।[৬৭]

১৮৮৩-৮৪ সালে পুরো বাংলা প্রদেশে জ্বরে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশী ছিল রাজশাহীতে। ১৮৮৪ সালে পাবনায় জ্বরে মৃত্যু ঘটেছিল ৩৬,০১৪ জনের।[৬৮] যশোহরে শুধু কোটচাঁদপুর থানায় ১৮৮১ সালে প্রতি মাইলে জ্বরে মৃত্যুর হার ছিল ২৮.২১।[৬৯] ঝিনাইদহতে শতকরা ৩১ ভাগ। খুলনায় ১৮৯০ সালে জ্বরে প্রতি হাজারে মৃত্যুর হার ছিল ২৪.৪০। চট্টগ্রামে ১৯০৪ সালে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৪১.৪১১ জন।[৭০] এর মধ্যে জ্বরের কারণে মৃত্যু হয়েছিল ৩৬,০৯১ জনের।[৭১]

উনিশ শতকের শেষার্ধে বা আমার আলোচ্য সময়ে জ্বর জ্বালা ছিল পূর্ববঙ্গবাসীদের জীবন যাপনের অঙ্গ। ঐ সময়ের সংবাদপত্রগুলি পাঠ করলে এ সম্পর্কে জানা যায় বিশদভাবে, চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এর বিভীষিকা। বাংলা ভাষায় প্রথম আত্মজীবনীকার হিসেবে খ্যাত ফরিদপুরের রাসসুন্দরী তাঁর আত্মজীবনীর শেষে 'জ্বর' সম্পর্কে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন (খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই)। সেই কবিতার প্রথম কয়েকটি লাইন ছিল এরকম—

> 'হায় হায় হ'চ্ছে এই রামদিয়াতে জ্বরের মালখানা।
> সন ১২৮০ সালে কাত্তিক মাসে যায় জানা।
> জ্বরের এম্নি যে রীতি, যার বাড়ীর যেটি,
> ক্রমে ক্রমে শয্যাগত হ্চ্ছে সকলটি ঃ
> আবার ভিন্ন দেশের লোক আইলে অগ্নি পড়ে বিছানা।'[৭২]

আর ছিল কলেরা। প্রতি বছর অন্তত একবার কলেরা পূর্ববঙ্গে আতংক সৃষ্টি করতো। গ্রাম, শহর—সব অঞ্চলের মানুষই ছিলেন এর শিকার। তবে ১৮১৭ সালের আগে এর প্রকোপ তেমন ভয়াবহ ছিল না। কলেরার এই ভয়াবহ প্রকোপ প্রথম পরিলক্ষিত হয়েছিল যশোরে ২০ আগষ্ট ১৮১৭ সালে। ২০ থেকে ২২ আগষ্টের মধ্যে এর প্রকোপে শহর

প্রায় জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। এরপর ১৮৪২ থেকে ১৮৪৯ (১৮৪৪ বাদে), ১৮৫৩, ১৮৫৫, ১৮৫৮, ১৮৬৪, ১৮৬৭ এবং ১৮৬৯ সালে যশোরে কলেরা মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল।[৭৩] ঢাকায় প্রতি-বছর দু'বার—ফাল্গুন চৈত্রে, ব্রহ্মপুত্রে স্নানের পর এবং বর্ষাকালে কলেরা দেখা দিত। তখন মনে হত ঢাকা যেন জনশূন্য হয়ে যাবে।[৭৪] পথে পথে তখন কেবল 'হরিবোল', 'কান্নার রোল' অনাথ ছেলেমেয়েদের চিৎকার, দোকানপাট বন্ধ।'[৭৫] শহরের অবস্থাপন্ন বাসিন্দারা তখন মেঘনা থেকে খাবার পানি আনতেন।[৭৬] ময়মনসিংহে প্রায় প্রতিবছর চৈত্র ও কার্ত্তিক মাসে শহর জনশূণ্য হয়ে যেত।[৭৭] জ্যাক (১৯১৬) লিখেছেন, ১৮৮১ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত, ফরিদপুর জেলার অন্যান্য অংশ থেকে উত্তরাংশে লোক বৃদ্ধির হার ছিল অত্যন্ত কম। উত্তরাংশে ৯১৪ বর্গমাইলে, প্রতিহাজারে ১৮৮১ সালে বৃদ্ধির হার ছিল ৬২০ ও ১৯১১ সালে ৬৪২ জন। বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা সাতভাগ। অন্যদিকে দক্ষিণপূর্ব ও দক্ষিণপশ্চিমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৫০ ও ৪০ ভাগ। এর কারণ, উত্তরাংশে নদীগুলি শুকিয়ে যাচ্ছিল। প্রতিবেশ হয়ে পড়েছিল অস্বাস্হ্যকর। ফলে বৃদ্ধি পেয়েছিল কলেরা ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। এ কারণে, বালিয়াকান্দি, ভূষণা, ফরিদপুর ও গোয়ালন্দের আশেপাশের অঞ্চল হয়ে পড়েছিল জঙ্গলাকীর্ণ।[৭৮] রংপুরে ১৮৬৬ থেকে ১৮৭৬ পর্যন্ত কলেরার প্রকোপ এতো বেড়ে গিয়েছিল যে, প্রতিটি পুলিশ স্টেশন ও চৌকিতে বিতরণের জন্যে রাখা হত কলেরা পিল।[৭৯] ১৮৭০ সালে গ্লেজিয়ার ঐ অঞ্চলে এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখিয়েছিলেন, সেখানে মোট মৃত্যুর ৪৬.৬% কারণ জ্বর (ম্যালেরিয়া সহ) ও ২০.৫% এর কারণ কলেরা। ১৮৭১ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত রংপুর এলাকায় লোকের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছিল; তারও কারণ ছিল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, কলেরা এবং জ্বর।[৮০] ১৮৯৭ সালে চট্টগ্রামের কুতুবদিয়া দ্বীপে মৃত্যু হয়েছিল ১৩০০ জনের যা ছিল ঐ দ্বীপের লোকসংখ্যার শতকরা এগারো ভাগ।[৮১] ১৮৯৭-৯৮ সালের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলায় একই কারণে মৃত্যু হয়েছিল ২১০০ জনের।[৮২]

সমতলভূমি জয় ঃ একটি উদাহরণ

সুতরাং, আমার আলোচ্য সময়ে দেখি, বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা

সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ জঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদ করেছিল। সমতলভূমি জয় বা জমি পুণরুদ্ধারের প্রচেষ্টা গ্রহণে, পালিতের মতে (১৯৮২), সরকার, জমিদার ও 'মণ্ডল বা প্রামাণিক'রাই (যাদের তিনি উল্লেখ করেছেন 'পায়োনিয়ার-ফার্মার্স' বলে) ছিলেন উদ্যোগী। তাঁর মতে, মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে নিম্নবঙ্গের অধিকাংশই ছিল পতিত জমি। মুর্শিদকুলী খাঁ ও বাংলার নবাবরা জমি পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। রাজস্ব বৃদ্ধির আশায়, জমিদারদের সনদ দেয়া হয়েছিল এ শর্তে যে তারা পতিত জমি আবাদ করবেন। জমিদার আবার কৃষকদের সঙ্গে করেছিলেন একই রকম চুক্তি।[৮৩]

মুর্শিদকুলী খাঁর সময় বাংলা বিভক্ত ছিল ১০০,০০০ গ্রাম এবং ১৬৬০ টি পরগণায়। রাজশাহী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহের জমিদারী মুর্শিদকুলী খাঁর আমলেই সৃষ্টি। এ সব সনদ দেয়া হয়েছিল নাম মাত্র খাজনা বা বিনা খাজনায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও একই নীতি গ্রহণ করেছিল।[৮৪]

মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে রাজশাহী জমিদারী ১২৯০৯ বর্গমাইলের বিশাল জমিদারীতে পরিণত হয়েছিল। চট্টগ্রামের ভূকৈলাসের জমিদারীর অধিকাংশ সৃষ্টি হয়েছিল পতিত জমি উদ্ধারের মাধ্যমে। মুক্তগাছার জমিদারী পত্তন করেছিলে শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী (১৭১৯)। এ জন্যে তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাঁচশো লোক নিয়ে এসেছিলেন।[৮৫]

জমি উদ্ধারের জন্যে জমিদারদের প্রয়োজন ছিল কৃষকদের। তাঁরা কৃষকদের জমি উদ্ধারের বিনিময়ে দিয়েছিলেন নানান সুযোগ সুবিধা। এ ভাবে 'মণ্ডল' বা প্রামাণিকরা' হয়ে উঠেছিল ক্ষমতাবান। এরাই জমি উদ্ধারের জন্যে আমদানী করতেন শ্রমিকদের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে।[৮৬] এ পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গের একটি অঞ্চলকে নিয়ে উদাহরণ স্বরূপ আলোচনা করতে পারি। আলোচ্য অঞ্চলটি হল চট্টগ্রাম। এখানে উল্লেখ্য যে, সরকার বা জমিদার বা 'প্রামাণিক' প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করলেও সমতল ভূমি জয়ের কাজটি করেছিলেন আমদানীকৃত মজুর এবং সাধারণ কৃষকরা। কারণ তাঁদের ছাড়া, জমি উদ্ধারের প্রচেষ্টা শুধু 'প্রচেষ্টার' মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো।

১৭৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সিল চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশের বিপুল পরিমাণ পতিত জমি উদ্ধারের

প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল। কাউন্সিল ঘোষণা করেছিল, যারা এ জমি উদ্ধার করবে, পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্যে তাদের খাজনা মকুব করা হবে। কাউন্সিল আশা করেছিল, পাঁচ বছর পর নতুন আবাদকৃত জমি থেকে ভালো খাজনা পাওয়া যাবে। কাউন্সিলের আশা ব্যর্থ হয়নি। ১৮৮৮-৯৮ সালের একটি জরীপে জানা যায়, ১৭৬৪ সালে উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ ছিল ৬.৯ বর্গমাইল আর ১৮৮৮-৯৮ সালে সে পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১২৬৯ বর্গমাইলে। ১৭৬৪ সালে চাষের অধীনে (ঘর বাড়ীসহ) জমির পরিমাণ ছিল ৪৮৮ বর্গমাইল। ১৮৮৮-৯৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৮৩৯ বর্গমাইলে। ১৭৬৪ এবং ১৮৩৭ সালে করা দুটি জরীপের মধ্যবর্তী সময়ে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ৪৭ ভাগ। খাজনা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৬১ ভাগ। অর্থাৎ একশো ত্রিশ বছরের মধ্যে চট্টগ্রামে উদ্ধার করা হয়েছিল বিপুল পরিমাণ পতিত জমি।[৮৭]

ডব্লিউ. এন. লিস লিখেছেন, ১৭৯৩ সালে বাংলায় আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ৩০,০০০,০০০ একর। ১৮৫৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৭০,০০০,০০০ একরে।[৮৮]

পূর্ববঙ্গেই জমি উদ্ধারের ঝোঁকটা ছিল বেশী। খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি, পাটের বাজারের বিকাশ প্রভৃতি ছিল এর কারণ।[৮৯] নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে পাবনা জেলার একাংশ বসতিহীন জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল। তখন জেলার লোকদের মধ্যে আগ্রহ দেখা গিয়েছিল চলনবিল ও আশেপাশের জলাভূমি জঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদ করার।[৯০] ১৮৮১ সালের আদমশুমারীতে ঢাকা বিভাগ সম্পর্কে লেখা হয়েছিল, দশবছর আগে যে সব অঞ্চল ভরা ছিল জলাজঙ্গলে এখন তা আনা হয়েছে চাষের অধীনে।[৯১] রাজশাহীর রেশম শিল্পের ক্ষয় ঘটলে জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চল থেকে কৃষকরা দলে দলে চলে গিয়েছিল চলনবিল এলাকায় এবং সেখানে জলাজঙ্গল পরিষ্কার করে শুরু করেছিলেন চাষবাস। বরেন্দ্রে প্রচুর জমি উদ্ধার করা হয়েছিল এবং তা করেছিলেন পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের মজুররা।[৯২] সামগ্রিকভাবে, ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে পূর্ববঙ্গের প্রচুর পতিত জমি উদ্ধার করে চাষের অধীনে আনা হয়েছিল।[৯৩]

কৃষিযোগ্য জমি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গে জনসংখ্যাও বৃদ্ধি

পেয়েছিল ; কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক। ১৮৮১ থেকে ১৮৯১ পর্যন্ত দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা জেলায় লোকবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২.৭, ১১.২ এবং ৩.৯ ভাগ। খুলনা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামে বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল, ৮'৪, ১৩'২, ২৩'০ এবং ১৩'৮ ভাগ।[৯৪] ১৮৭২ সালে দিনাজপুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ০'৯ ভাগ। ১৯০১ সালে সে পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ৭'৭ ভাগে।[৯৫] ১৮৭২ থেকে ১৯০১ এর মধ্যে নওগাঁ মহকুমায় গাঁজা চাষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৫৯'৩ ভাগ।[৯৬]

সুতরাং মানুষ পিছিয়ে থাকেনি। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সে সমতলভূমির উদ্ধার করেছিল। এবং আমার আলোচ্য সময়টি ছিল জলাজঙ্গল থেকে পূর্ববঙ্গকে উদ্ধার করে আবাদযোগ্য অঞ্চলে পরিণত করার সময়। এ প্রসঙ্গে ফ্লাণ্ডার্স সম্পর্কে মিশেল যা বলেছিলেন পূর্ববঙ্গের বেলায় ও তা উল্লেখ করা যেতে পারে—"It has been created, so to speak, in defiance of nature ; it is a product of human labour" (উদ্ধৃতঃ রাধাকমল মুখার্জী, দি চেঞ্জিং ফেস অব বেঙ্গল, পৃঃ ১৪০)।

শহর ও গ্রাম

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, ভারতীয় শহরে উৎপত্তির মূলে ছিল চারটি কারণ—প্রশাসনিক, সামরিক, বাণিজ্যিক এবং ধর্মীয়।[৯৭] পূর্ববঙ্গের শহরগুলি গড়ে উঠেছিল প্রধানত ব্যবসা ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে।[৯৮] তবে অধিকাংশ ছোট বড় শহরগুলিই ছিল ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং সে কেন্দ্রের পরিবর্তন হলে শহরগুলি দ্রুত শহরের মর্যাদা হারাতো।

পূর্ববঙ্গের শহরগুলিকে উনিশ শতকে সাধারণতঃ মফস্বল শহর হিসেবেই আখ্যা দেয়া হত। মফস্বল শব্দটি আপেক্ষিক, যার মানে সদর বা 'হেডকোয়ার্টার' এর তুলনায় অধস্তন।[৯৯] এ পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার তুলনায় কলকাতা সদর এবং কলকাতার তুলনায় ঢাকা মফস্বল। পূর্ববঙ্গে, বলতে গেলে ঢাকাই ছিল একমাত্র সদর, বাকীগুলি সব মফস্বল শহর। উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের মফস্বল শহরগুলির এক ধরনের চিত্র আমরা পাই ইংরেজ সিভিলিয়ানদের রোজনামচা বা বাংলা আত্ম-

জীবনীতে। ইংরেজ সিভিলিয়ান ক্লে (১৮৯৬) পূর্ববঙ্গের কয়েকটি মফস্বল শহরের বর্ণনা দিয়েছেন এ ভাবে—কুমিল্লা ঃ গোমতীর দক্ষিণে সুন্দর ছোট শহর। গাছে ঢাকা রাস্তার দু'পাশে নেটিভ বাজার, এর পিছে সার্কিট হাউস, কাচারী আর ইউরোপীয়দের বাসভবন। খানিক দূরে বিরাট ঝিল যেখানে পাওয়া যায় প্রচুর পাখী।[১০০] ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঃ অফিস আদালতের সঙ্গেই ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ অফিসার আর মুনসেফের বাড়ী –সবগুলিই খড়ে ছাওয়া। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কুমিল্লার মতই— গ্রাম আর ধানক্ষেত, নেই শুধু কোন টিলা।[১০১]

মাদারীপুর সম্পর্কে নবীনচন্দ্রসেন (১৩৬৬) লিখেছিলেন, মাদারীপুর পুরনো মহকুমা কিন্তু অবস্থা শোচনীয়। নদীর তীরে ধরে সেখানে একটি পাকা রাস্তা আছে বটে কিন্তু 'তাহাতেও বাহির হইয়া দুই পা বেড়াইবার জো নাই। চারিদিক হইতে দুর্গন্ধ আসিয়া নাসিকা পূর্ণ করিয়া তোলে। ঐ পাকা রাস্তার একপাশে কুমার নদ, অন্য পার্শ্বে উকিল মোক্তার প্রভৃতির বাসা শ্রেণী। প্রত্যেক বাসার পার্শ্বে একটি গর্ত, তাহাতে পচা জল। তাহার এক পার্শ্বে পায়খানা এবং তাহাতে এক শতাব্দীর সঞ্চিত মলরাশি।'[১০২]

এগুলি না হয় মফস্বল শহরের কথা। কিন্তু পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর ঢাকারই বা অবস্থা ছিল কি রকম ?

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে (১৮১৫), নদীর তীর বরাবর ঢাকা শহরের দৈর্ঘ্য ছিল দু'মাইল। কিন্তু শহরের পরিকল্পনা ছিল খুবই খারাপ। পুরো শহরটা ছিল ইট, খড় এবং মাটির ঘর ও গলির মিশ্রণ।[১০৩]

কলকাতার লর্ড বিশপ রেজিনাল্ড হেবার ঢাকায় এসেছিলেন ১৮২৪ সালে। তিনি লিখেছিলেন, পুরনো ঢাকা কলকাতার চিৎপুরের মত বাজে কিন্তু আশেপাশে ছিল কিছু ধ্বংসাবশেষ। অধিকাংশ বাড়ীই ছিল এখনকার জীর্ণ। এক কথায়, ঢাকা প্রাচীন গৌরবের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এর রাজস্ব যা ছিল তার থেকে হ্রাস পেয়েছিল ষাট ভাগ, আর চমৎকার সব অট্টালিকা, এর প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট জাহাঙ্গীরের দুর্গ, মসজিদ, প্রাচীন রাজপ্রাসাদসমূহ, চীন, ফরাসী এবং পর্তুগীজদের ফ্যাক্টরী ও গীর্জা ধ্বংসপ্রাপ্ত, জঙ্গলে গিয়েছিল ঢেকে।[১০৪]

এতো গেল না হয় উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কথা। কিন্তু আমার আলোচ্য সময়ই বা পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর ঢাকার অবস্থা ছিল কি রকম ?

উনিশ শতকের মধ্যভাগেও ঢাকা শহরের আশেপাশে নিঃশঙ্কচিত্তে বাঘ ঘুরে বেড়াতো। '' এই মাত্র দুঃখের বিষয় যে উগ্রমূর্ত্তি ব্যাঘ্র সকল আহারার্থে ব্যগ্র হইয়া নগর প্রান্তে বন মধ্যে সর্বদায় ইতস্তত ভ্রমন করিতেছে নগরীয় উত্তর এবং পূর্ব পার্শ্বস্থ প্রজাগন তৎশঙ্কায় সদা শঙ্কিত থাকে গত মাস দ্বয়ে বিংশতাধিক ব্যঘ্র নগরীর (সংখ্যাটি হয়ত অতিরঞ্জিত) সাহেব লোক দ্বারা হত হইয়াছে, তত্রাচ তচ্চতুসম্পদের নূন্যতা দৃষ্ট হয় না।''[১০৫]

১৮৬৯ সালে ঢাকার সহকারী সিভিল সার্জন কাটক্লিফ এক রিপোর্টে লিখেছিলেন যে, ঢাকা শহরে ময়লা নিস্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই এবং যুগযুগ ধরে এই মলমূত্র আবর্জনা সঞ্চিত হচ্ছিল শহরের লোকদের শহরের বাড়ীর আঙ্গিনায়, রাস্তায়। শহরের কুয়োর পানি দূষিত, শহর বিভক্ত অসংখ্য সংকীর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন গলি দ্বারা এবং সেখানেও উপচে পড়ছিল ময়লা। এ ছাড়া দূর্গন্ধময় ড্রেন আর জঙ্গলতো ছিলই। এক কথায় বলা যেতে পারে, শহরের অধিবাসীরা যে জমিতে বাস করতেন তা ছিল নোংরা এবং স্যাঁতস্যাতে। যে বাতাস তারা গ্রহণ করতেন অহরহ তা ছিল দূষিত এবং যে পানি পান করতেন তাও ছিল বিষের মত।[১০৬] ঢাকা শহরে পৌরসভা স্থাপিত হয়েছিল ১৮৬৪ সালে, কলের পানি চালু হয়েছিল সত্তর দশকে। ঐ সময় শহরের প্রধান রাস্তা ছিল চারটি। বিদ্যুৎ এসেছিল শহরে ১৯০১ সালে। অথচ এর প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বিদ্যুৎ চালু হয়েছিল কলকাতায়। পূর্বঙ্গের প্রধান শহরেরই হাল ছিল যখন এরকম তখন মফস্বল শহর গুলির কথা সহজেই অনুমেয়।

পূর্ববঙ্গের মোট জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র এক অংশ বাস করতেন শহরে। এবং সে হার যে কত নগন্য ছিল তা বোঝা যায় ১৮৭২ সালের আদমশুমারীর তথ্যতে—

১৮৭২ সনের আদমশুমারীর তথ্য অনুযায়ী পূর্ববঙ্গে কয়েকটি বড় শহর—[১০৭]

জনসংখ্যা	শহরের নাম
পঞ্চাশ হাজারের ওপর	ঢাকা
বিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে	চট্টগ্রাম, রামপুর-বোয়ালিয়া

পনের হাজার থেকে বিশ হাজারের মধ্যে	সিলেট, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নওয়াবগঞ্জ
দশহাজার থেকে পনের হাজারের মধ্যে	দিনাজপুর, রংপুর, কুমিল্লা, মানিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, জামালপুর কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

অনেক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সরকার অর্থনৈতিক বা অন্যান্য কারণেও ইচ্ছাকৃতভাবে, প্রায় জোর করে শহরের সীমা বিস্তৃত করতেন। যেমন, থাকবস্ত জরীপে ১৮৫৯ সালের বরিশাল শহরের পরিধি দেখানো হয়েছিল তিন বর্গমাইল।[১০৮] ১৮৬৯ সালে, বরিশাল পৌরসভা স্থাপিত হলে, শহরের পরিধি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল আরো তিন বর্গমাইল যাতে করে পৌরকরের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়।[১০৯] সরকারী নথিপত্রে স্বীকার করা হয়েছিল যে, পৌরসভা শহরগুলি ছিল আসলে অর্ধেক গ্রাম, অর্ধেক শহর।[১১০]

শহরে সমাজ ছিল মিশ্রচরিত্রের যেখানে অধিকাংশ লোক ছিলেন বহিরাগত, যারা ব্যবসায়িক বা সরকারী কাজে জমায়েত হতেন সেখানে।[১১১] অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাকুরীজীবীরা গ্রাম থেকে পরিবার আনতেন না শহরে।[১১২] গ্রামের সঙ্গে এইসব শহরবাসীর সম্পর্ক ছিল দৃঢ়। তাদের প্রায় অধিকাংশই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল ছিলেন গ্রামের জমির ওপর এবং ছুটিছাটা পেলেই তারা গ্রামের বাড়ীতে চলে যেতেন।

পুরো উনিশ শতকে, শহরবাসীর হার খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি। ১৮৯১ এর আদমশুমারী অনুযায়ী, পূর্ববঙ্গে মোট জনসংখ্যার ৩.৯% মাত্র বাস করতেন শহরে। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে শহরবাসীর হার ছিল ১১.৪%।[১১৩] এতে আরেকটি জিনিষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা'হল, পূর্ববঙ্গের তুলনায়, পশ্চিমবঙ্গে নগরায়ণ হয়েছিল দ্রুত কারণ শিল্প স্থাপিত হয়েছিল সেখানে বেশী। এক কথায় বলা যেতে পারে, উনিশশতকের পূর্ববঙ্গের শহরগুলি ছিল গ্রামের সমুদ্রে দ্বীপের মত। আর শহরের স্বল্প জনসংখ্যা আবার প্রমাণ করে নফিস আহমদের ভাষায়, জনজীবনে গ্রামীণ ধান্য সংস্কৃতির (Rural Paddy Culture) প্রভাব,

কৃষির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা, যাতায়ত মাধ্যমের সীমাবদ্ধতা এবং আধুনিক শিল্পের স্বল্প বিকাশ।[১১৪]

কিন্তু গ্রামের সংজ্ঞা কি? পূর্ববঙ্গের গ্রামের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। ঔপনিবেশিক সরকার গ্রামের সংজ্ঞা নির্ণয় করেছিল এভাবে—গ্রাম হল তার আশেপাশের টোলা, পাড়া বা মহল্লা নিয়ে গঠিত কিন্তু এর কোনটিই কেন্দ্রীয় গ্রাম থেকে দূরে নয় এবং যার নির্দিষ্ট নাম আছে যাতে তাকে আলাদাভাবে চেনা যায়।[১১৫] এখানে লক্ষণীয় যে, ঔপনিবেশিক সরকার গ্রামের সংজ্ঞা সম্পর্কে নিশ্চিত নয়, এর প্রমাণ বিভিন্ন রকমের জরীপ বা রিপোর্ট, যেখানে গ্রামের সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল 'মৌজা' বা 'রেভেনিউ' বা অন্যকোন নামে।

বর্তমানে গ্রাম নিয়ে যারা গবেষণা করছেন তাঁদের অনেকেও (যেমন স্বপন আদনান প্রমুখ, ১৯৭৫) এ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তাদের মতে, সামাজিক স্বীকৃতিই (Social acceptance) গ্রামের সীমানা বা সংজ্ঞা নির্ধারণ করে এবং যার ভিত্তি ভূগোল ও সমাজ (Geo-Social)।[১১৬]

এ পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম সম্পর্কে রংপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থমাস সিসন ১৮১৪ সালে যে মন্তব্য করেছিলেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি রংপুরের গ্রামাঞ্চলের কথা উল্লেখ করেছিলেন এভাবে—সাধারণ সংজ্ঞায় গ্রাম বলতে যা বোঝায় তা এখানে নেই। এমন কোন পার্থক্য সূচক চিহ্ন নেই যার সাহায্যে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। পুরো অঞ্চলটি হল দিগন্ত বিস্তৃত সমতলভূমি, যার মাঝে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু কুঁড়ে ঘর দাঁড়িয়ে আছে।[১১৭]

আমরা ধরে নিতে পারি, পূর্ববঙ্গের গ্রাম কয়েকটি বাড়ীর সমাহারও হতে পারে বা গঠিত হতে পারে কয়েকটি পাড়া নিয়ে কিন্তু গ্রামের সীমানা কখনও নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। একটি গ্রামের সীমানা অন্য আরেকটি গ্রামের মধ্যে প্রায় ক্ষেত্রেই প্রবিষ্ট।

আবহমান কাল থেকে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল এবং সাগর পারের দেশ থেকে, ইংরেজ, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, আরব, আর্মেনীয় প্রভৃতি বিদেশীরা এসেছিল বাংলাদেশে। বসতি স্থাপন করেছিল গ্রামে গঞ্জে। কিন্তু বাঙালীরা তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কারণ জনসংখ্যা তখনও, এমনকি আমার আলোচ্য সময়েও কোন সমস্যার সৃষ্টি করেনি।

কিন্তু তাই বলে অবস্থানরত বিদেশীদের সঙ্গে বাঙালীর বিশেষ কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। এ ছিল এক ধরনের সহ অবস্থান মাত্র। বিদেশীদের সঙ্গে বা জমিদারের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে সে গ্রাম ছেড়ে চলে এসে অন্য গ্রামে বসতি স্থাপন করেছে। চেয়েছে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে। কিন্তু সে রুখে দাঁড়ায় মাত্র একটি কারণে, যখন তার নিজ জমির ওপর কেউ হস্তক্ষেপ করে। কারণ, তার জীবিকার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে জমি।

সরকারী প্রশাসন গ্রামীন সমাজের ওপর তেমন নিয়ন্ত্রণ কখনও স্থাপন করতে পারেনি। গ্রামীণ সমাজ আত্মমগ্ন ভাবে নিজ পথেই চলেছে। এক ধরনের প্রশাসনের ভিত্তিতে চলেছে এ সমাজ। ঔপনিবেশিক প্রশাসন সে সমাজকে চূর্ণ করতে চায়নি তেমনভাবে বা পারেনি।

পূর্ববঙ্গের গ্রামে সোজাসাপটা বসতির ধারা কখনও গড়ে ওঠেনি। এর কারণ নদীর অনবরত ভাঙ্গন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জমিদার জোতদারের অত্যাচার। ফলে কোন একটি নির্দিষ্ট গ্রামে, কোন একটি নির্দিষ্ট পরিবার বংশানুক্রমে ঘর বেধে থাকেনি। সে অনবরত বসতি বদলেছে। কোন গ্রামে, একাদিক্রমে তিনচার পুরুষ ধরে কেউ একই বসত বাড়ীতে বাস করেছে এমন দৃষ্টান্ত খুব কম। পূর্ববঙ্গের গ্রামবাসীরা তেমনভাবে শেকড় গেড়ে বসেনি কোথাও।[১১৮]

গ্রামের মানুষের জগত সীমাবদ্ধ নিজ গ্রামেই। সেখানে বা গ্রামীণ সমাজে বহিরাগতের কোন স্থান ছিল না।[১১৯] গ্রামের প্রায় প্রতিটি লোক বিভিন্ন মেল বন্ধনে আবদ্ধ। গ্রামের বাইরের জগৎ তার কাছে বিদেশ। সে যখন বলে, 'আমি দেশে যাচ্ছি', তার মানে সে নিজ গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। এর প্রভাব দেখি আমরা এ অঞ্চলের পুঁথি সাহিত্যে যেখানে ফ্যান্টাসী, স্বপ্নের এক অদ্ভুত জগৎ তৈরী করা হয়েছে এবং যা এখনও অক্ষুন্ন। এবং এ ধরণের একেকটি আজন্মমগ্ন গ্রামে বাস করতেন পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জনসাধারণ।

শহুরে শিক্ষিতের সঙ্গে গ্রামের লোকদের মানসিকতার সূক্ষ্ম তফাৎ থাকতে পারে, গ্রামের লোকেরা আবার চরের লোকদের অপছন্দ করতে পারে, পার্বত্যবাসীরা ভয় পেতে পারে সমতল ভূমিকে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে, পূর্ববঙ্গবাসীদের জীবনচর্যায়, যাতায়াত মাধ্যম, স্থাপত্য, খাদ্য, লোক শিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে মিল আছে কিছু যা একই সঙ্গে তাদের

সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রদান করেছে, তার দেশকে চিহ্নিত করেছে আলাদা ভাবে। নীচে আমি এখন তাই দেখবার চেষ্টা করবো।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের জনজীবন, অর্থনীতি প্রায় সবকিছুকে প্রভাবিত করেছিল যাতায়াত ব্যবস্থা। আধুনিক যুগে বা এখন আমরা যাতায়াত মাধ্যম বা ব্যবস্থা বলতে যা বুঝি তার কোন বালাই ছিল না উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গে।

প্রথমেই দেখা যাক, এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যোগাযোগের অবস্থা ছিল কেমন ?—'নদী থেকে গ্রাম পর্যন্ত কোন বাঁধা সড়ক নেই, কেবল মাঠ। দুই জমির মধ্যে যে আঁকাবাঁকা আল থাকে, তার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এই পথে গরুর গাড়ী যেতে পারতো না। বর্ষাকালে সমস্ত অঞ্চলটাই জলে ডুবে যেত। জলের মধ্যে কেবল মাঝে মাঝে কয়েকটি বাড়ী মাথা তুলে থাকত।' ফরিদপুরের নিজ গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার এভাবে। শুধু তাই নয়, তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, ছেলেবেলায় তিনি গরুর গাড়ী দেখেন নি।[১২০]

শহরগুলির কথা ধরা যাক এবার। ১৮১০ সালে যশোর শহরে ছিল মাত্র দু'টি গরুর গাড়ী।[১২১] ১৮৪০ সাল পর্যন্ত ঢাকা জেলার গ্রামাঞ্চলের লোকজন চাকাঅলা গাড়ী দেখেনি।[১২২] উনিশশতকের সত্তরের দশকেও ঢাকায় বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হত হাতী।[১২৩] ষাটের দশকে ঢাকা শহরে চালু করা হয়েছিল ঘোড়ার গাড়ী। ঐ একই সময়ে সিলেট শহরে ছিল মাত্র দু'খানা ঘোড়ার গাড়ী।[১২৪]

রাস্তাঘাট যেগুলি ছিল সেগুলি না থাকারই মত। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সম্পূর্ণ যশোরে ছিল মাত্র বিশ মাইল রাস্তা।[১২৫] পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর ঢাকায় ১৮৬৯ সালে ঝামা বিছানো প্রধান রাস্তা ছিল চারটি এবং তার সম্মিলিত দৈর্ঘ্য ছিল কয়েক মাইল।[১২৬] ১৮৯২ সালে সরকারী উপাত্ত অনুযায়ী, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগে পাকা (মেটালড) রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিল, যথাক্রমে, ১৯, ১৭০ ও ২৪০ বা মোট ৩৮৫ মাইল। এবং কাঁচা ('আনমেটালড'), রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে, ১৩১১, ৮৮৭ এবং ৪৬৪৩ মাইল বা মোট

৬৮৪১ মাইল।[১২৭] এককথায় বলা যেতে পারে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এ অঞ্চলে রেলওয়ে ছিল না, রাস্তাঘাটের দৈর্ঘ্য ছিল খুবই সামান্য, যানবাহনের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব ও বিচ্ছিন্নতার কারণে প্রতিটি অঞ্চল ছিল একেকটি নির্জন নিঃসঙ্গ দ্বীপের মত--স্থবির, আত্মমগ্ন।

পূর্ববঙ্গের বিচ্ছিন্ন এই অঞ্চলগুলির যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল জলপথ। আমার আলোচ্য সময়েতো বটেই, এখনও জলপথই ব্যবসা-বাণিজ্য যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। প্রাচীন আমলেও জলপথ ব্যবহৃত হয়েছিল সর্ববিধ কাজের জন্যে। মুসলমান আমলেও জলপথ ব্যবহৃত হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছু রাস্তাঘাট তৈরীর দিকেও মনোযোগ দেয়া হয়েছিল। ঐ সব রাস্তা উনিশ শতক আসতে না আসতেই গিয়েছিল নষ্ট হয়ে। ঔপনিবেশিক সরকার স্বার্থগত কারণেই মনযোগ দিয়েছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের দিকে। উনিশ শতকের শেষের দিকে রেলপথ বা ষ্টিমার সার্ভিস গড়ে উঠেছিল প্রধানত কলকাতা বা ঔপনিবেশিক সরকারের স্বার্থ মেটাতে কারণ পূর্ববঙ্গ তখন পরিণত হয়েছিল কাঁচামালের আড়ত হিসেবে। তবে রেলওয়ে বা ষ্টিমার সার্ভিসই ছিল পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের প্রথম প্রচেষ্টা।[১২৮]

পূর্ববঙ্গের জলপথের প্রধান বাহন হল নৌকা, বৈচিত্র্যপূর্ণ সব নৌকা দেখা যায় পূর্ববঙ্গে যা আবার একই সঙ্গে বহন করছে অষ্ট্রিক স্মৃতি। নদী পারাপারের জন্যে এ অঞ্চলে ব্যবহৃত হত গামলাও।[১২৯] একেবারে গরীবগুর্বোরা ব্যবহার করতেন কলার ভেলা, ছোটখাট খালে ব্যবহৃত হয় ডোঙ্গা। বড় নদীতে ডিঙ্গী। তারও আবার রকমফের আছে, যেমন, ঘেষো ডিঙ্গী, জেলে ডিঙ্গী ইত্যাদী। দ্রুত পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয় ছিপ যার মাল্লা সাধারণতঃ ছ'জন। বজরা আবার একটু জাঁকালো যা বরিশালে পরিচিত কোষ আর ঢাকায় পিনিস হিসেবে।[১৩০] খুলনা, ফরিদপুরে ব্যবহৃত হয় কোর্পাই।[১৩১]

নৌকার গলুই সাধারণতঃ নির্ণয় করে আঞ্চলিক পার্থক্য, যেমন, সিলেটের নৌকার গলুই প্রায় ক্ষেত্রেই হয় দীর্ঘ, সরু, প্রায় উল্লম্ব। ফেরী পারাপারের জন্যে ব্যবহৃত এই অঞ্চলের অনেক নৌকার গলুই আবার কোদালের মত চ্যাপ্টা। খুলনার অনেক নৌকার গলুইয়ে দেখা যাবে চমৎকার কাঠ খোদাই।[১৩২]

অঞ্চলভেদে নৌকার আকৃতিতে হয়ত খানিকটা পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু মূল কাঠামো বা গড়ন এদের এক এবং তা আবার প্রমান করে এদের উৎসে কোন পার্থক্য নেই।[১৩৩] যশোর বা দিনাজপুরের মৃত নদী বা উত্তাল মেঘনার মিল একটিই—এবং তা'হল, পালতোলা নৌকা যা পূর্ববঙ্গবাসীর জীবনধারণ, যাতায়াত, বাণিজ্যের প্রধান মাধ্যম।

ঘরবাড়ী

উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গে সাধারণ মানুষের বাড়ীঘরের কোন বৈচিত্র্য ছিল না। তবে এক ধরনের স্থাপত্যিক ঐক্য ছিল। এ শতকের বাড়ীঘরের প্রধান বৈশিষ্ট্য পাকাবাড়ীর অভাব। গ্রাম দূরে থাকুক, শহরের অধিকাংশ বাড়ীও ছিল সাধারণ বাঁশ, খড়, ছন, ইত্যাদির তৈরী। উনিশ শতকের প্রায় শেষের দিকেও দেখা যায়, যশোরে কোন পাকা বাড়ী নেই, এমনকি ঢাকার মত শহরেরও অধিকাংশ বাড়ী ছিল খড়ের।[১৩৪]

বাংলাদেশের জলবায়ুই সাধারণ মানুষের বাড়ীঘর এবং তার স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেছে। পূর্ববঙ্গের স্থাপত্যকে দু'ভাবে ভাগ করা যেতে পারে, লোকায়ত এবং ধর্মীয়। লোকায়ত স্থাপত্যের অন্তর্গত সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গ্রামের মানুষের ঘরবাড়ী এবং ধর্মীয় স্থাপত্যের অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনের উপাসনাগার, যেমন মন্দির, মসজিদ। তবে দু'ধরনের স্থাপত্যেরই বৈশিষ্ট্য এদের ঘরোয়া ভাব। বিশেষ করে গ্রামে তৈরী মন্দির মসজিদের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। যেন সব কিছুই নির্মিত হয়েছে গ্রামের পরিবেশ মেনে, কোন কিছুই নয় বিরাট বা জাকাঁলো।

পূর্ববঙ্গের জলবায়ু গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। যদিও এ দেশের ঋতু ছ'টি—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত, শরৎ, হেমন্ত—তবুও লক্ষণীয় যে বছরের প্রায় আটমাসই গরম থাকে। আদ্রর্তার পরিমাণও এ অঞ্চলে খুব বেশী এবং গ্রীষ্ম ও বিশেষ করে বর্ষায় বৃষ্টিপাত হয় প্রচণ্ড। জলবায়ুর কারণেই বাংলাদেশে জাকাঁলো বা বৃহৎ কিছু নির্মিত হয় নি (দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে) বা সম্ভব ছিল না। কারণ এ ধরনের জলবায়ু প্রতিরোধক উপাদানের অভাব।

সাধারণ বা গ্রামের মানুষের বাড়ী তৈরীর উপাদান খুবই সামান্য—খড়, বাঁশ, বেত, ছন বা কাঠ—হাতের কাছেই যা পাওয়া যায়।

এইসব কুটির বা ঘরবাড়ীর প্রধান বৈশিষ্ট্য--এগুলি দো-চালা (কোন কোন ক্ষেত্রে চৌ-চালা)। এই দো-চালা ফর্ম গ্রামীণ নিসর্গের সঙ্গে মিলে মিশে আছে। 'ঘরের চালা গ্রামীণ মানুষের বাস্তবিক জীবন যাপনেরই প্রতিভূ। কাজ চতুর্দিকে, কাজ সর্বত্র এবং চাপ শরীরে, আবার অধিকাংশ কাজ বসে করতে হয়। আর বসার কাজ মেয়েরাই বেশী করে, সে জন্য কি মেয়েরা কুঁজো হয়ে যায়?'[১৩৫]

গ্রামের ঘরবাড়ীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য জানালার অভাব। প্রচণ্ড বর্ষা থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই বোধহয় উদ্ভাবিত হয়েছে এ ব্যবস্থা। তবে যেহেতু, ঘরের দেয়াল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তৈরী বাঁশের বেড়া দিয়ে সে জন্যে বায়ু চলাচল বা জানালার অভাব মিটে যায়। আর খড়ের চাল ঢালু হওয়াতে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে যায় নীচে। বাড়ীঘর তৈরীর এই রীতি বা বৈশিষ্ট্য স্থাপত্যে 'বাঙ্গলা ঘর' নামে পরিচিত এবং এর প্রভাব দেখা যায় সুদূর দিল্লীর দুর্গেও। পূর্ববঙ্গের এই নিজস্ব রীতি সম্পর্কে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। যদিও নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি একটু বড়, কিন্তু তবুও এর উল্লেখ করছি এ কারণে যে, এর ফলে আমাদের কাছে এই বিশেষ স্থাপত্য রীতি এবং লোকশিল্প সম্পর্কে ধারণা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তিনি লিখেছেন--'যখন গ্রামে যাই, দো-চালা দেখি তখন বুঝি এই ফর্ম সর্বত্র ছড়ানো, প্রতিবেশেরই উদ্ভাবন। দো-চালা একটু টানলে কোশা নৌকা হয়ে যায় কিংবা ঘাসী নৌকা, দো চালার সঙ্গে মিল আছে ছৈয়ের ; দো-চালার ফর্ম, নৌকার ফর্ম, ছৈয়ের ফর্মের সঙ্গে মিল আছে লজ্জাবতী বধূর বসে থাকার, কর্মব্যস্ত বধূ কন্যা মাতার বসে কাজ করার, এ ভাবে একই ফর্ম বিভিন্ন অবয়ব পায়, একই ফর্মে প্রবিষ্ট হয় ঘরের চালা নৌকার ছৈ, একই ফর্ম আকার দেয় ফর্মের, শ্রমের। এই শ্রম দৈহিক, যন্ত্রণা মথিত, শরীরের কোন অংশের পার পাবার যো নেই, সে জন্য দো-চালা, নৌকা, ছৈয়ের ফর্মে শিথিলতার কোন অবকাশ নেই। ফর্ম স্পষ্ট, ঋজু, টানা টানা, যেন কারিগরের আনুগত্য প্রবল ও সোচ্চার তার ঘরনীর কাছে, গৃহের কাছে, নৌকার কাছে। শিথিল হলে ফর্ম নষ্ট হবে, তেমনি নষ্ট হবে ঘর, নৌকা, তার সারাজীবন।'[১৩৬]

স্থাপত্য

যে বিশেষ স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করেছি তা আবার ছাপ ফেলেছে এ অঞ্চলের স্থাপত্যে বিশেষ করে মন্দির এবং মসজিদ নির্মাণে। যদিও জলবায়ুর কারণে পুরনো নিদর্শনসমূহ অধিকাংশই লুপ্ত তথাপি যে সব নিদর্শন এখনও অক্ষত তাতে ফুটে উঠেছে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এখানে উল্লেখ্য যে, মুসলমানরা এ দেশে পদার্পণ করে স্হাপত্যের কারিগরি ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন এনেছিলেন। প্রাক-মুসলিম যুগে গাঁথুনির প্রধান উপাদান ছিল কাদা। মুসলমানরা এর পরিবর্তে ব্যবহার করেছিলেন চুনসুরকি এবং ভিতরে যাতে পানি ঢুকতে না পারে সে জন্যে চুনের পলেস্তরা। হয়ত এই কারিগরি উন্নতির জন্যে এখনও সে যুগের কিছু নিদর্শন টিকে আছে।

পাল বা সেন আমলের মন্দিরের যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে, সেগুলির স্হাপত্যিক চরিত্র দু'রকম— সর্বতোভদ্র এবং নগরশিখর। প্রথমোক্তটির প্রচলন ছিল পূর্ববঙ্গে, দ্বিতীয়টির রাঢ় বা দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে।[১৩৭]

পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে (১৪৮০) বাংলায় মন্দির নির্মাণের এক পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছিল। ফলে স্হাপত্য ও পোড়ামাটির অলংকরণের ক্ষেত্রে এসেছিল পরিবর্তন এবং এ নতুন বৈশিষ্ট্য টিকে ছিল ইংরেজ আমলেও। পরিবর্তনোত্তর বৈশিষ্ট্যগুলির প্রধান হল, 'প্রাণ-প্রাচুর্য' ও 'গার্হস্থ্য রূপ'। তা ছাড়া এ স্হাপত্য লোকশিল্পের নিকটবর্তী হওয়ায়, পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ ঐতিহ্যের সঙ্গে ছিল তা যুক্ত। এবং পাল সেন আমলের অভিজাত রীতি থেকে এটাই ছিল পার্থক্য।[১৩৮]

পূর্ববঙ্গের মন্দিরগুলিকে সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে—চালা, রত্ন এবং শিখর। মন্দির নির্মাণের পুনর্জাগরনের সময় প্রথম দু'টির আবির্ভাব। শেষোক্তটির ধাঁচ ছিল পুরনো এবং তা ঐতিহ্য হিসেবেই গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এগুলির মধ্যে 'চালা' বা 'বাংলা' রীতিই জনপ্রিয় হয়েছিল বেশী। রত্ন মন্দিরগুলিতেও ব্যবহৃত হয়েছিল চালার নক্সার মূল উপাদানগুলি।[১৩৯] আর পূর্ববঙ্গের মন্দিরের এটাই হচ্ছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এর কারণ বাংলা রীতিতে এখানে যে মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল সে রীতি এসেছে সাধারণ মানুষের ঘরের নকশা থেকে। তা'ছাড়া, 'বাঁশ ও চাঁচ বা দর্মার কাজ দিয়ে গৃহ নির্মাণ রীতি যা ইট ও পাথরের মন্দিরগাত্রেও নক্সা হিসেবে অনুকৃত হয়েছে, পূর্ব

বাঙ্গলারই বৈশিষ্ট্য। পশ্চিম বাঙ্গলার মাটির মসৃন দেয়াল দিয়ে গৃহ নির্মাণ করা হয় সে জন্যে এ রীতি এখানে বিরল।'[১৪০] শুধু তাই নয়, এ রীতি শুধু মন্দির নির্মাণই সীমাবদ্ধ থাকেনি, দিনাজপুর, রাজশাহী বা অন্যান্য জেলার পীরের দরগায়ও ব্যবহৃত হয়েছিল এই নক্সা।[১৪১]

পূর্ববঙ্গের মসজিদ জাঁকালো নয়। বাঁশ বা পোড়া ইট, যে ধরনের উপাদান দিয়েই নির্মিত হয়েছিল মসজিদ—তা ছিল অনাড়ম্বর। আমার আলোচ্য সময়েতো বটেই, এর পূর্বেও জলাজঙ্গল পরিষ্কার করে নির্মিত হয়েছিল মসজিদ। তাই গ্রীষ্মাঞ্চলের বন্য নিসর্গই হয়েছে মসজিদ অলংকরণের বিষয়বস্তু। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জ্যামিতিক নকশা। গ্রামের ঘরবাড়ী থেকে এসেছে ছাদের ফর্ম যেন তারা গ্রামের নিসর্গেরই অন্তর্গত।[১৪২] পূর্ববঙ্গের মসজিদ সাদামাটা, আটোসাটো। বৃষ্টির কারণে, সাধারণতঃ মসজিদের সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গন থাকে না। তবে থাকে একটুকরো ঘাসের প্রাঙ্গন এবং পাশে ছোট একটি পুকুর ওজু করার জন্যে। জলবায়ুই নির্ধারণ করেছে মসজিদের চারিত্র।[১৪৩] এক কথায়, পূর্ববঙ্গের মসজিদ অত্যন্ত ঘরোয়া। গ্রামে কোন বাড়ীতে অতিথি এলে অনেক সময় তাঁকে থাকতে দেয়া হয় মসজিদে। যেন তা ঘরেরই বিস্তৃতি যা আর কোন অঞ্চলের উপাসনাগারের ক্ষেত্রে হয়ত প্রযোজ্য নয়।

তুর্কী-আফগানরা এ দেশে আসার পর চালু করেছিল খিলান, গম্বুজ এবং মিনার। কিন্তু ইটের তৈরী মসজিদ নির্মাণে তাদের নির্ভর করতে হয়েছিল দেশীয় কারিগরদের ওপর। ফলে, 'মুসলিম স্হপতিদের আঙ্গিকে হিন্দু বৌদ্ধ জ্যামিতির স্বপ্ন মদির হয়ে উঠেছে, ফল হয়েছে অনন্য, একেবারে দেশজ, অথচ মহান, গম্ভীর, বিষন্ন রোমান্টিক।'[১৪৪]

তুর্কী আফগানরা খিলান, গম্বুজ বা মিনার চালু করা সত্বেও, বাঙ্গালী স্হপতিরা এর সঙ্গে যোগ করেছিলেন চালাঘরের রীতি বা চালা ঘরের ছাদ এবং এখানকার ইসলামিক স্হাপত্যের একটি প্রধান চরিত্র হচ্ছে বাঁকানো কার্নিশ যার আদিরূপ হচ্ছে বাঁশ বা কাঠের তৈরী বাড়ী।[১৪৫]

পূর্ববঙ্গের মন্দির বা মসজিদ খুব কম ক্ষেত্রেই আকাশছোঁয়া বা জাঁকালো; বিশেষ করে গ্রামের তৈরী মসজিদগুলি। এখানকার জল-

বায়ু হয়ত এর প্রধান কারণ। কিন্তু আরেকটি কারণ এখানে উল্লেখ্য। তা'হল এখানকার কৃষিজীবী সাধারণ মানুষের পৃথিবী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল না তেমন, সমৃদ্ধও ছিল না তারা। শাসনের কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থান এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা লোককে করে তুলেছিল নিসঙ্গ যা অভিঘাত হেনেছে তার কল্পনায়। মুসলমান বা ইংরেজ আমলে এখানকার তৈরী মসজিদসমূহে ইসলামের গতিময়তা বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের কোন ছাপ নেই যা আছে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে নির্মিত মসজিদে। বা উপরোক্ত কারণেই হয়ত পূর্ববঙ্গের স্থপতিরা সাহসী বা কল্পনাপ্রবণ হতে পারেন নি।[১৪৬]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্থাপত্যের ক্ষেত্রে অনেক অঞ্চলেই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়েছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গ ছাড়া আর কোথাও সর্ব-সাধারণের ব্যবহৃত সাদামাটা কুঁড়েঘরের কাঠামো স্থাপত্য রীতিকে প্রভাবিত করতে পারেনি।[১৪৭]

খাদ্য ও পোষাক

দূরপ্রাচ্য ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অধিবাসীদের সংগে বাঙ্গালীদের প্রধান খাদ্যের অমিল নেই। সমুদ্রশায়ী সমতলভূমির লোকেরা ভাতভূক। পূর্ববঙ্গের জলবায়ু ধান উৎপাদনে বিশেষ সহায়ক তাই ভাতই বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। ভেতো বাঙ্গালী কথাটার উদ্ভব বোধহয় সেখান থেকেই। যে সব দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান, ধরে নিতে হবে তা আদি-অস্ট্রেলীয় অস্ট্রিক ভাষাভাষি জনগোষ্ঠীর 'সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান'।[১৪৮] এবং এই ভাত ধনী গরীব সবারই প্রধান খাদ্য। আবার ধানকে ভালোবেসে বাঙ্গালী নদীর মতই এর বিভিন্ন নাম দিয়েছেন—রূপশালী, কাটারীভোগ, বালাম ইত্যাদি।

কথায় বলে, মাছে ভাতে বাঙ্গালী। অর্থাৎ ভাতের পর মাছই তার প্রধান খাদ্য এবং এর একটি কারণ, নদীনালা খালবিলে মাছের সহজলভ্যতা। তা ছাড়া, এটিও অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর সভ্যতার দান। এই মাছ ধরার কৌশল বা হাতিয়ারের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের সঙ্গে বাঙ্গালীদের তেমন কোন পার্থক্য নেই।[১৪৯]

বাঙ্গালীদের পোষাক সাধারণ। উনিশ শতকের প্রায় শেষার্ধ পর্যন্ত

সবাই ধুতি বা কাছা দিয়েই কাপড় পড়তেন। মেয়েরা পড়তেন একপেচে শাড়ী। ফরায়ীরাই প্রথম পূর্ববাংলায় সাদা লুঙ্গি বা তহ্বন্দের প্রচলন করেছিলেন। রঙ্গীন লুঙ্গির আমদানী হয়েছিল বার্মা থেকে।[১৫০] প্রথম দিকে মুসলমানরাই লুঙ্গি পরা শুরু করেছিলেন কিন্তু অন্তিমে তা হিন্দু-মুসলমান, এক-কথায় পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালীদের সর্বজনীন পোষাকে পরিণত হয়।

ভাষা

ভাষা কাজ করে দু'ভাবে—সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক একক হিসেবে। পূর্বও পশ্চিম বঙ্গের ভাষা একটিই—বাংলাভাষা। এই ভাষা সাংস্কৃতিক একক হিসেবে কাজ করেছে উভয় বঙ্গেই, কিন্তু রাজনৈতিক একক হিসেবে কাজ করেছে পূর্ববঙ্গেই। নীচের আলোচনায় আমি তাই দেখাবার চেষ্টা করবো।

ভাষার প্রকাশ বিবিধ ঃ সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, মতাদর্শগত। পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে, যখন থেকে পূর্ববাংলা ঐতিহাসিক পর্যায়ে রাজনৈতিক একটি একক হিসেবে উদ্ভব লাভ করেছে তখন থেকেই ভাষার মধ্যে দিয়ে, ভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার নির্দিষ্ট প্রকাশ হয়েছে সংস্কৃতিতে, সমাজে, মতাদর্শে। পূর্ববাংলার বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে, জনগোষ্ঠীর মৌখিক ব্যবহারে, জীবন ধারণে, মতাদর্শে, প্রবাদে, ছড়ায় এই নির্দিষ্টতা সোচ্চার হয়েছে পশ্চিম বঙ্গ থেকে। এই নির্দিষ্টতার অন্যতম উপাদান ভাষার রাজনৈতিক একক হিসেবে ব্যবহার।

প্রাচীনকাল থেকেই অভিজাত এবং শাসকরা এ অঞ্চলে নিজেদের ভাষা চালু করেছিলেন। এভাবে সাধারণ মানুষের ভাষা থেকে শাসক শ্রেণীর ভাষা আলাদা হয়ে গিয়েছিল যেমন, সংস্কৃত, ফরাসী, ইংরেজী এবং কিছুদিন আগে উর্দু (১৯৪৭-৭১)। সাধারণ মানুষ, শাসক শ্রেণীর ভাষার বিপরীতে, নিজেদের ভাষার মাধ্যমে সমাজের ঐক্য তৈরী করেছেন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে মুগ্ধ হয়েছেন, অর্থনৈতিক একক হিসাবে কাজ করেছেন (শাসিত জনগোষ্ঠী কিংবা শ্রেণী হিসাবে) এবং ভাষাকে কেন্দ্র করে মতাদর্শ সৃষ্টি করেছেন। এসব বিভিন্ন উপাদান আবার শক্তি যুগিয়েছে এই অঞ্চলের রাজনীতিতে, সে জন্যে

ভাষা রাজনৈতিক একক হিসাবে কাজ করেছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন[১৫১] ও মতাদর্শ তৈরীর পটভূমি হিসাবে। জাতীয়তাবাদী প্রেমের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে জনগোষ্ঠীর মৌখিক রীতি, পুঁথি পাঠ, পুঁথি পাঠের সমাজ বিন্যাস, নিম্নবর্ণের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, মধ্যশ্রেণীর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রয়াস সবকিছুই শাসকশ্রেণীর ভাষার বিপরীতে প্রতিবাদ, বিদ্রোহের বিভিন্ন রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। এই সমস্যার বিভিন্ন স্তর আমি বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করবো।

গ্রীয়ারসন (১৯২৭) বাংলা ভাষাকে দু'টি প্রধান শাখা পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত করেছেন। পূর্বাঞ্চলীয় ভাষার কেন্দ্র হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন ঢাকা জেলাকে। তাঁর মতে, এ অঞ্চলের ভাষার বৈশিষ্ট্য প্রথমে নজরে পড়ে খুলনা এবং যশোরে। গাঙ্গেয় বদ্বীপের পূর্বেও তা বিদ্যমান। তারপর তা প্রসারিত হয়েছে উত্তর পূর্বে।[১৫২] মাগধী, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের রূপ চারটি—রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, বাঙ্গালী ও কামরূপী। বাংলাদেশে প্রচলিত বাঙ্গালী ও বরেন্দ্রী। তবে এই চারটির মধ্যে আবার প্রধান হল রাঢ়ী ও বাঙ্গালী, কারণ, ধ্বনিতে, শব্দগঠনে, শব্দভাণ্ডারে এবং বাগরীতিতে এই দুটি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা এবং এখনও তাই আছে। বরেন্দ্রী ওপর প্রভাব বেশী বাঙ্গালীর।[১৫৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অঞ্চলভেদে বাংলায় মৌখিক ভাষার নানারূপ আছে। এবং এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে উপভাষা। উপভাষায় অত্যন্ত স্পষ্ট থাকে আঞ্চলিক জীবনধারা। তবে ভাষার ক্ষেত্রে পরিশীলনের জন্য নষ্ট হয় আঞ্চলিকতা। ভাষা গড়ে ওঠে একটি কৃত্রিম একক হিসেবে যেখানে ক্রমাগত তৈরী হতে থাকে শাসকশ্রেণীর আধিপত্যবাদ। উপভাষায় ঐ আধিপত্যবাদের প্রভাব সামান্য এবং তাই এ ক্ষেত্রে টিকে থাকে আঞ্চলিকতা। পূর্ববঙ্গের উপভাষার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃত রীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল সাধুভাষা। আবার এরই পাশে বর্তমানে গড়ে উঠেছে একটি ভাষা যা কলকাতার 'শিষ্ট জনের মৌখিক ভাষা।'[১৫৪] এর বিপরীতে হচ্ছে পূর্ববঙ্গের মৌখিক ভাষার একক যা পূর্ববঙ্গের সকল সম্প্রদায়ের জীবনচর্যায় ছিল সক্রিয়। বর্তমানেও তা সক্রিয় রাষ্ট্রিক সাহায্যে। এ কারণে দেখি, উনিশ শতকেতো বটেই, এমনকি কিছুদিন আগেও

পূর্ববঙ্গের লোকদের ঠাট্টাচ্ছলে 'বাঙ্গাল' নামে অভিহিত করা হত।[১৫৫] ঐ একই কারণে, এখনও, পূর্ববঙ্গের লোক কলকাতার বাসিন্দা হওয়া সত্বেও উপভাষার ঐ এককের সদস্য হিসেব জীবনযাপন করেন ঘরের মধ্যে বা পূর্ববঙ্গবাসীয়দের মধ্যে, যদিও বাইরের পোষাকী জীবনে তিনি ব্যবহার করেন পরিশীলিত ভাষা। এখনও বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা দিতে হলে ব্যবহার করতে হয় মুখের ভাষা, পোষাকী জীবনের পরিশীলিত ভাষা নয়।

এ প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গে যারা সাহিত্যচর্চা করেছেন তাঁদের দু'এক-জনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে উদাহরণ হিসেবে। পূর্ববঙ্গের মৌখিক ভাষার আদলে তৈরী হয়েছিল বটতলার পুঁথি সাহিত্য যা এখনো গণমানসে আদৃত। উনিশ শতকের শেষ দশকে কলকাতা পুস্তক প্রকাশনার কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও দেখাযায় পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত পুঁথির সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গ থেকে কম নয়।[১৫৬]

উনিশ শতকেও দেখি পূর্ববঙ্গের যেসব সাহিত্যিক সাহিত্যচর্চা করেছেন, তাঁরা পাঠকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করেছিলেন মৌখিক ভাষার একক। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' এবং এর বিপরীতে 'জমিদার দর্পণ' বা 'গাঁজী মিয়ার বোস্তানীর' কথা। বা উল্লেখ্য গোবিন্দ দাস। তাঁর চিঠিপত্র বা প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার ভাষা অপেক্ষাকৃত আনুষ্ঠানিক। কিন্তু তিনি যখন কোন কিছুর প্রতিবাদ জানাতে চেয়ে-ছিলেন বা সরাসরি পৌঁছতে চেয়েছেন পাঠকদের কাছে তখন আবার ব্যবহার করেছিলেন মুখের ভাষা। যেমন—'

'পরদাহীনা মরদা মেয়ে পদ্মা নদীর প্রায়
ঠেরেন দিদি বেড়াল আশে বাবুর বাড়ী যায়।[১৫৭]

বা

'ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ?
আজ যে আমি উপোষ করি, না খেয়ে শুকায়ে মরি ..[১৫৮]

বা

'কল্লি কিরে হতভাগী কেরোসিনে পুড়ে
নারীর মড়ক লাগাইলি বাঙ্গলা মুলুক জুড়ে।

মনে যদি জেদ ছিল তোর কর্ব্বি না তুই বিয়া
কে নিছিল কলতলায়, গলায় গামছা দিয়া...[১৫৯]

উনিশ শতকের কথা না হয় বাদই দিলাম বর্তমানেও দেখা গেছে, বাংলাদেশের আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় জসীমউদ্দিন। কারণ, একটিই। কবিতার ক্ষেত্রে তিনি ব্যবহার করেছিলেন মৌখিক ভাষা।

এ ভাবে আমরা দেখি, উভয়বঙ্গের ভাষা এক হওয়া সত্ত্বেও ভাষা ব্যবহারে দু'অঞ্চলের পার্থক্য বিদ্যমান।

সতের শতকে পূর্ববঙ্গের কবি আবদুল হাকিম লিখেছিলেন—

'যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুগায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ না যায়।' [নূর নামা]

উপরোক্ত পংক্তিগুলিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে মাতৃভাষা প্রীতি এবং যারা মাতৃভাষা অবজ্ঞা করে তাদের প্রতি ব্যঙ্গ, প্রতিবাদ। ভাষা কাজ করে তখন রাজনৈতিক একক হিসেবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ববঙ্গের কথা ধরা যাক। পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর, উর্দুভাষী শাসক শ্রেণী ও তাদের সহযোগীরা বাংলাভাষার ইসলামী করণের ওপর জোর দিয়ে সাংস্কৃতিক আধিপত্য চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের নবীন সাহিত্যিকরা পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন তাঁদের সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে। এই সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে ডঃ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) বলেছিলেন, 'স্বাধীন পূর্ববাংলার স্বাধীন নাগরিকরূপে আজ আমাদের প্রয়োজন হয়েছে সর্বশাখায় সমৃদ্ধ এক সাহিত্য। ...... ঐ সাহিত্য হবে মাতৃভাষা বাংলায়।'[১৬০] ১৯৫১ সালে, তিনিই আবার বলেছিলেন, 'বাংলা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষাকে পূর্ববঙ্গের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদই নয় প্রয়োজনবোধে বিদ্রোহ করতে হবে। কেননা এটা পূর্ব-বঙ্গের মানুষের জন্যে জেনোসাইড বা গণহত্যার সামিল।'[১৬১] ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী যখন ছাত্রদের ওপর গুলি চালিয়েছিল শাসক শ্রেণী তখন তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে বলেছিলেন, 'নিজের মাতৃভাষার জন্যে যদি তোমার প্রাণও যেত আমার কোন দুঃখ থাকতো না।'[১৬২]

এ ভাবে দেখি, ভাষা পূর্ববঙ্গে শুধু আর সাংস্কৃতিক একক হিসাবেই থাকে না, রূপান্তরিত হয় রাজনৈতিক এককেও এবং পূর্ববঙ্গের সাহিত্যে প্রকাশিত এই আশা আকাংখাও কাজ করেছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পিছে।[১৬৩] ভাষা আন্দোলনে সাধারণ মানুষের অবদান তুচ্ছ করার মত নয়।[১৬৪] এবং তাই পরে প্রেরণা যুগিয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ স্থাপনের। ভাষার প্রতি যে কোন আক্রমন পূর্ববঙ্গের জনগণ গ্রহণ করেছেন চ্যালেঞ্জ হিসেবে। তাই সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক—দুই একক বিচার করলেও দেখবো, বাংলাভাষা এ অঞ্চলের জনগণকে বেঁধেছে এক কঠিন বাধনে যা ছিন্ন হবার নয়।

লোকশিল্প

পূর্বঙ্গে লোকায়ত সংস্কৃতির ধারা আজও বহমান এবং এর সঙ্গে রয়েছে সাধারণ মানুষের আত্মিক যোগ। মাটির পুতুল, খেলনা, সরা, শিকা, কাঁথা প্রভৃতি প্রাচীন লোকায়ত শিল্পের ধারার বহমানতাই প্রমান করে। 'লোকশিল্পে বিভিন্ন মাধ্যম অন্যোন্য নির্ভর, পরস্পর প্রবিষ্ট, ঐ সূত্র তৈরী করে উদ্দেশ্যের ঐক্য, শ্রমব্যবস্থা বিন্যাস, তৈরী করে আবার সামাজিক পারস্পর্য, নির্ভরশীলতা। একই ব্যক্তি বিভিন্ন মাধ্যমের শিল্পী ঃ সুতোর পুজোর মৌসুমে গড়ে প্রতিমা, শীত ঋতুতে বানায় পুতুল, নবান্নের পর তৈরী করে ঘরবাড়ি, এ ভাবে তৈরী হয় লোকশিল্পের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পারস্পর্য আর বিচার, জীবন একত্র হয় দৈনন্দিন ব্যবহারের দিক থেকে প্রতিটি দিক, ফলে দেখা দেয় সরাসরি সম্বন্ধ, সর্বাশ্রয়ী ডিজাইন, উৎসারিত হয় শান্তি ও আনন্দ।'[১৬৫] আমি এখানে লোকশিল্প সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা নয়, বরং লোক শিল্পের কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করবো যা একান্তই পূর্ববঙ্গবাসীর বা পূর্বঙ্গের। সেগুলি হল নকসী কাঁথা, শখের হাড়ি, এবং ভাটিয়ালি গান।

নকশীকাঁথা ঃ নকশীকাঁথা পূর্বঙ্গের গ্রামের মেয়েদের শিল্প যা উৎসারিত একেবারে হৃদয়ের গভীর থেকে। নকশীকাথা সবসময় উপহার হিসেবেই দেয়া হয়েছে, বাজারে বিক্রি হয়নি কখনও।[১৬৬] নকশীকাঁথার নির্দিষ্ট কোন মাপ ছিল না, তবে আকারে যেগুলি বড় ছিল সেগুলিকে বলা হত লেপ। তারপর ছিল দোরখা কাঁথা, আঁচল বুননী।

নকশীকাঁথা তৈরীর উপাদান ছিল খুবই সামান্য—পুরনো শাড়ী এবং সেই শাড়ী থেকে তোলা সুতো। সাংসারিক অবসরে, গল্প করতে করতে তৈরী হত একটি কাঁথা। অনেক কাঁথা সম্পূর্ণ করতে দু'তিন পুরুষ লেগে যেত।[১৬৭] দোরখা কাঁথার দু'দিকেই ছিল নকশা আর আঁচলবুননী কাঁথায় ব্যবহৃত হতো শাড়ীর আঁচল। কাঁথায় ব্যবহৃত মটিফগুলি একই, হয়ত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে এসেছে—লতাপাতা, ফুল, পাখী, পশু। এগুলো বোধ হয় এসেছে আবার চারপাশের নিসর্গ থেকে। আর এর সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগ হয়েছে জ্যামিতিক নকশা। নকশার মূল রং কালো, লাল, হলুদ এবং নীল। প্রতীকও ব্যবহৃত হয়েছে কাঁথায় এবং সেই প্রতীকের কেন্দ্রে আছে মানুষ এবং প্রকৃতি।[১৬৮]

শখের হাঁড়িঃ "শখের হাঁড়ি, শব্দটিতে স্পন্দিত প্রেম, সৌজন্য, খুশি, এ যেন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জন্যে নিয়ে চলেছে সুখের সওগাত। প্রেমের সুবাস, সুজনের শান্তি।"[১৬৯] শখের হাঁড়ি এখন প্রায় লুপ্ত কিন্তু এক সময় এর প্রচুর প্রচলন ছিল, বিশেষ করে কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে। নিমন্ত্রণ বা সৌজন্যে রক্ষার্থে অলংকৃত শখের হাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হত মিষ্টান্ন বা পিঠা-পুলি। কুমিল্লার শখের হাঁড়ির সঙ্গে রাজশাহীর শখের হাঁড়ির রং ব্যবহারে তারতম্য থাকতে পারে কিন্তু উভয় অঞ্চলের হাঁড়িতে ব্যবহৃত হয়েছে সেই একই মটিফ, ফুল পাখী, জন্তু জানোয়ার, জ্যামিতিক নকশা—সবকিছুরই উৎস চারপাশের নিসর্গ।

সারিগানঃ পূর্বঙ্গবাসীর সত্ত্বার সঙ্গে জড়িত সারিগান। নৌকোয় বসে বা দাঁড়িয়ে যে গান গাওয়া হয় তাই সারি গান। বর্ষাকালেই এই গান গাওয়া হয় সবচেয়ে বেশী। ভাটি অঞ্চলে এই গানের সুর একটু বিশেষ ভাবে ভেঙ্গে গাওয়া হয় বলে তা পরিচিত আবার ভাটিয়ালী নামে। সময়ে অসময়ে ভেসে আসা এই ভাটিয়ালি সুর যে গ্রামবাংলার মানুষকে আবিষ্ট করে একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। পূর্বঙ্গের একান্ত নিজস্ব সম্পদ এই গান। কারণ নদী যে অঞ্চলে নেই সে অঞ্চলে এই গান হবে কোথা থেকে?

উপরোক্ত আলোচনায় কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাঙ্গালী ও বাংলাভাষা দু'টিই শঙ্কর। কিন্তু এই ভাষার ভিত্তিতেই বাংলাদেশের জনসাধারণকে রাজনীতিগতভাবে আলাদা করে চিহ্নিত করা বা সংজ্ঞা দেয়া যায়। এছাড়া পূর্বঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান, নিসর্গ এবং বিশেষ

করে নদী প্রবাহ উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে একে চিহ্নিত করেছে আলাদাভাবে এবং নদী প্রবাহই নিয়ন্ত্রণ করেছে পূর্ববঙ্গবাসীর জীবন, নির্ধারণ করেছে তার চরিত্র। এ ছাড়া জীবন-চর্যা, শিল্পকলা প্রভৃতি একদিকে যেমন এ অঞ্চলে এক ধরনের ঐক্য সৃষ্টি করেছে তেমনি একে চিহ্নিত করেছে পৃথক সত্তা হিসেবে।

জলবায়ু ও প্রকৃতি পূর্ববঙ্গবাসীকে কিছুটা আয়েসী করে তুললেও নদী ও সমুদ্র তাকে দিয়েছে আত্মরক্ষার সহজ প্রবণতা ও প্রতিরোধ-ক্ষমতা এবং তার মনে সৃষ্টি করেছে এক ধরনের ভাবালুতা।[১৭] কিন্তু উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা এও বলতে পারি যে, পূর্ব-বঙ্গবাসীদের মনে দু'টি পরস্পর বিরোধীসত্ত্বার জন্ম হয়েছিল।

ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক কারণ এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মানসিকতা তৈরী করেছে। নদীর অনবরত ভাঙ্গন, মহামারী, অত্যাচার ইত্যাদির ফলে এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ সবসময় বসতি বদলেছে। এক জায়গায় সে শেকড় গাড়তে পারেনি দৃঢ়ভাবে। সমাজের মেলবন্ধন শক্ত হতে পারেনি, তার দরুণ ব্যক্তিক প্রবণতা শক্তিশালী হয়েছে। ফলে তার চরিত্রে সৃষ্টি হয়েছে নৈরাজ্যের।

আবহমানকাল থেকে বিদেশীরা এখানে এসেছে কিন্তু পূর্ববঙ্গবাসীব জন্যে তা কখনও বড়রকমের সমস্যার সৃষ্টি করেনি। শাসক বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও এক ধরনের সহ অবস্থান ছিল তাদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গবাসীর। কিন্তু যখন কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তখন সরাসরি কোন সংঘাত বা সংঘর্ষের পরিবর্তে সে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে বা বসতি বদলেছে। ফলে সব কিছুকে এড়িয়ে যাওয়ার, কোনকিছুর দায়িত্ব না নেয়ার এক ধরনের মানসিকতা তৈরী হয়েছে তার মনে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, তা'হলে উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে এতো কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল কিভাবে? এটা ঠিক পূর্ববঙ্গের কৃষক বিদ্রোহ করেছিল কিন্তু যতক্ষণ সম্ভব সে সংঘাত এড়িয়ে চলেছে। সে রুখে দাঁড়িয়েছে তখন যখন অত্যাচার একেবারে চরমে উঠেছে বা তার জীবিকার অবলম্বন জমির ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। ঐ একটি কারণে এখনও বাঙ্গালী রুখে দাঁড়ায়। এ ভাবে আমরা দেখি পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীর মধ্যে দু'টি পরস্পর বিরোধী সত্ত্বার জন্ম হয়েছে।

নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছিলেন, উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে

ও বাঙ্গালীর বাস্তব সভ্যতার রূপ গ্রামীণ।[১৭১] কথাটি সর্বাংশে সত্য। আমার আলোচ্য সময়ে দেখি, পূর্ববঙ্গে ছিল তখন জলাজঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদ করার সময়। শহর যেগুলি ছিল সেগুলি ছিল যেন সমৃদ্ধিশালী গ্রামেরই বিস্তৃতি। গ্রামের সংগে 'শহরবাসীর' সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ, দৃঢ়। বিশ দশকের দ্বিতীয়/তৃতীয় দশকেও দেখি, আধুনিক, উপন্যাসের শিক্ষিত নায়ক পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলছে, পৃথিবীর সব মানুষ যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের গ্রামের টোল-পাঠশালায় মান্ধাতা আমলের কেতাব পড়ানো হচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী যখন যন্ত্রশিল্পের যুগ আরম্ভ হয়েছে তখন গ্রামের ক্ষয়িষ্ণু জমিদাররা ভাসান গান বা কথকতা দিয়ে ব্যস্ত। 'নিতান্ত গ্রাম্য মানুষের গ্রাম্য সভ্যতা আমাদের। পূর্ববাঙ্গালায় তাহার উপকরণ দৈন্য ছিল আরও সুস্পষ্ট, প্রায় প্রিমিটিভ'।[১৭২] এর একটি প্রধান কারণ, সম্পূর্ণ কৃষি-ভিত্তিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘসময় ধরে এ অঞ্চলের উৎপাদন পদ্ধতির কোন পরিবর্তন হয়নি।

কেন্দ্র থেকে পূর্ববঙ্গের অবস্থান ছিল সবসময় দূরে। কেন্দ্রে শাসন করেছে বিদেশীরা। ফলে প্রত্যক্ষভাবে গ্রামীণ সমাজের সংগে কোন সম্পর্ক তৈরী হয়নি। পূর্ববঙ্গবাসী তার কৃষি ও গ্রামীণ সভ্যতার মধ্যে আবর্তিত ছিল। এক ধরনের চলনসই প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল মাত্র তাদের ওপরে। সে কারণেই তারা কখনও বেশী প্রশাসনিক বাগাড়ম্বর বা প্রশাসন সহ্য করতে পারেনি। ঔপনিবেশিক কারণে পূর্ববাংলার সমাজ গঠনে শ্রেণী বিন্যাস তৈরী হয়েছিল। কিন্তু সমাজ বন্ধন শিথিল হয় নি। ফলে শ্রেণীবিন্যাসের বিপরীতে সামাজিক মেলবন্ধন লাভ করেছে অতিরিক্ত প্রাধান্য। একজন ব্যক্তি, একই সংগে সমাজ ও শ্রেণীর সংগে যুক্ত কিন্তু যুক্ততার অধিক্য সমাজের দিকেই বেশী। সে জন্যে সমাজের মধ্যে শ্রেণী সম্পর্ক নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে, যখন সেই ব্যক্তিটি বিভিন্ন জাতি, গ্রাম ও সমাজের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তার দরুণ কখনও কখনও শ্রেণীবিরোধ তৈরী হলেও তা সামাজিক মেলবন্ধনে সম্পূর্ণ ভাঙ্গন ধরাতে সক্ষম হয়নি।

পূর্ববঙ্গবাসীর মধ্যে একধরনের সংস্কৃতিক ঐক্য ছিল এবং আছে। কিন্তু এর কারণ, এখানকার কৃষিভিত্তিকতা যেখানে উৎপাদন পদ্ধতি প্রায় নিশ্চল। এই নিশ্চলতার দরুণ সমাজ বিনাসে বহু স্তর সমান্তরাল

ভাবে থেকে গেছে। এ ছাড়া কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থান এবং প্রতিটি অঞ্চলের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা আবার সৃষ্টি করেছে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও সাংস্কৃতিক অসাম্যের। আর নিশ্চল উৎপাদন পদ্ধতি তাকে আরো করে তুলেছে জোরদার, সৃষ্টি করেছে গতিহীনতা ও পুনরাবৃত্তির। আবার 'সমাজ কাঠামোর' অসম ঐক্য সংস্কৃতি প্রসারণের গতি রুদ্ধ করে দিয়েছে, সে জন্যে আঞ্চলিকতা বাংলার গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য হিসেবে থেকে গেছে।'[১৭৩]

'বাঙ্গালী সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি ছিল অষ্ট্রিক দ্রাবিড়-মোঙ্গলীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান তত্ত্ব ও মনন। বাঙ্গালীর মনেও আধ্যাত্ম বুদ্ধি, সংখ্যা, যোগ তন্ত্রের প্রভাব বারবার প্রবল রয়েছে।'[১৭৪] এখনও দেখেছি চট্টগ্রামের বায়েজীদ বোস্তামীর দরগায় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে গাছে সুতো বেঁধে মানত করছে। এখনও বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান পঞ্জিকা, ঝাড়-ফুক ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে। কিন্তু এর প্রধান কারণ সেই উৎপাদন পদ্ধতির নিশ্চলতা। বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন যেমন হয়েছে এখানে তেমনি আবার 'উৎপাদন পদ্ধতির নিশ্চলতার দরুণ ভৌগোলিক ও সামাজিক দূরত্ব বৌদ্ধ হিন্দু মুসলমান মতবাদ প্রয়াস ও দার্শনিক মনোভঙ্গি স্বতন্ত্র করে রেখেছে।'[১৭৫]

ব্রদেল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, যখন চাষের জন্যে জমি উদ্ধার করা হয় তখন একই সঙ্গে তা অর্থনৈতিক ও মানুষী ক্ষমতায় পরিণত হয়। পরিণত হয় একটি শক্তিতে। কিন্তু তাকে বেঁচে থাকতে হয় বহির্বিশ্বের জন্য উৎপাদন করে, নিজের জন্যে নয়। এটি একই সঙ্গে ঐ অঞ্চলের গুরুত্বের এবং এর অধস্তনতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[১৭৬]

আমার আলোচ্য সময়ে দেখি, সম্পূর্ণভাবে কৃষিভিত্তিক পূর্ববঙ্গ পরিণত হয়েছিল কাঁচামালের আড়ত হিসেবে।[১৭৭] জনৈক ইংরেজ কর্মচারী লিখেছেন, ভারতে সম্রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দর প্রদেশ হওয়া সত্ত্বেও ভালো প্রশাসন এর সীমানায় থেমে গেছে। ঐতিহ্যমতই একে উপেক্ষা করা হয়েছে।[১৭৮] প্রশাসনিক দিক থেকে উপেক্ষিত হলেও কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে একে উপেক্ষা করা হয়নি। আমার আলোচ্য সময়ে দেখি, পূর্ববঙ্গ পরিণত হয়েছিল কলকাতা তথা বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের কাঁচামালের আড়ত বা পশ্চাদভূমি হিসেবে।

পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় শাসক শোষক পূর্ববঙ্গকে দেখেছে পশ্চাদভূমি হিসেবে এবং এই অবস্থা চলেছে ১৯৭১ সালে পূর্ববঙ্গ (বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

তথ্য নির্দেশ

১. নীহার রঞ্জন রায়, "বাঙালীর ইতিহাস", (১ম খণ্ড), কলকাতা, ১২৯৬, পৃঃ ৮৫।

২. পূর্ববঙ্গে জন্ম যে সব সাহিত্যিকদের তাঁদের রচনায় সবসময় নদী এসেছে ঘুরে ফিরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মানদীর মাঝি" ছাড়াও নদী কি ভাবে পূর্ববঙ্গবাসীদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে তার একটি চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মন "তিতাস একটি নদীর নাম" উপন্যাসে। বা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় জীবনানন্দ দাশের অজস্র কবিতার কথা, যেমন, 'নদী যেন ছোট মেয়ে / আমার সে ছোট মেয়ে / যতদূরে যাই আমি হামাগুড়ি দিয়ে তুমি পিছে পিছে আসো / তোমার ঢেউয়ের শব্দ শুনি আমি আমারি নিজের শিশু সারাদিন নিজ মনে কথা কয় যেন / কথা কয়—কথা কয়— ক্লান্ত হয় নাকো / এই নদী. . .'। জীবনানন্দ দাশ, "জীবনানন্দ দাসের কাব্যসম্ভার", ঢাকা, ১৯৮১, পৃঃ ১০১।

৩. সতীশচন্দ্র মিত্র, "যশোহর খুলনার ইতিহাস" (১ম খণ্ড), কলকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ১৫।

৪. প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, "বাঙালী", কলকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ৬৭।

৫. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, "বিশাল বাঙলা", কলকাতা, ১৩৫২, পৃঃ ১৯।

৬. নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন', "নবীনচন্দ্র রচনাবলী" (সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত), (২য় খণ্ড), কলকাতা, ১৩৬৬, পৃঃ ১২৩।

৭. Haroun Er Rashid, *Geography of Bangladesh*, Dacca, 1977 p. 5?.

৮. Nafis Ahmed, *An Economic Geography of East Pakistan*, London, 1968, p. 12.

৯. F A Sachse, *Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of Mymensingh*, 1908-19, Calcutta, 1920, p 4.

১০. Amitabha Bhattacharyya, *Historical Geography of Ancient and Mediaeval Bengal*, Calcutta, 1977, p. 8.

১১. নফিস আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

১২. সতীশচন্দ্র মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫-১৭।

১৩. Arthur Coulton Hartley, *Final Report of the Rangpur Survey*

and Settlement Operations, 1931-38, Calcutta, 1940, p. 1-5.

১৪. প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭।

১৫. C.J.O. Donell, *Census of India, 1891, Vol III, The Province of Bengal and their Feudatories*, Calcutta, 1893, p. 47.
এরপর শুধু Census হিসেবে উল্লিখিত হবে। সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন, ১৮৮১ থেকে ১৯১১ এর মধ্যে ঐ জেলায় লোক হ্রাস পেয়েছিল প্রায় ৫৫০০০ জন। প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৪।

১৬. *Census* 1891, p. 46.

১৭. ঐ, পৃঃ ৭৫।

১৮. সতীশচন্দ্র মিত্র, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬।

১৯. নফিস আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬-৩৭। বাংলাদেশের ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর একটি উপন্যাসে মৃত নদী এবং তার তীরবর্তী অঞ্চলের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন এমন ভাবে যা উপন্যাসটিকে করে তুলেছে অনন্য। উপন্যাসের এক জায়গায় মৃত নদীর বর্ণনা দিয়েছেন তিনি এভাবে— "...নদী কি করে কাঁদে? এমন কথা বিশ্বাস্য কি অবিশ্বাস্য তা নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলাই নিছক বোকামীর মত মনে হয়। মানুষের মত যৌবনকাল, তারপর প্রৌঢ় বয়স বার্ধক্য অতিক্রম করে একটি নদী মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে কিন্তু মানুষের মত কাঁদবার ক্ষমতা রাখেনা, ব্যথা, বেদনা, প্রকাশ করতে পারে না, মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হলেও ক্ষীণতম প্রতিবাদ জানাতে পারে না, যে দু'টি তীরের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করছে অবিচ্ছিন্ন একাত্ম ঘনিষ্ঠতায় সে দু'টি তীরের দিকে তাকিয়ে বিদায় কালে অস্ফুট নিঃশ্বাসও ত্যাগ করতে পারে না ঃ নদীর পক্ষে কাঁদা সত্যি সম্ভব নয়। ...(কিন্তু) মরিয়া হয়ে তারা অসম্ভব কথাটিই গ্রহণ করে ঃ নদী কাঁদে, যে কান্না শুনতে পায় তারা সে কান্না মরনোন্মুখ নদীর বেদনার্ত শোকাচ্ছন্ন অন্তর থেকেই জাগে। ......" সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, "কাঁদো নদী কাঁদো", ঢাকা, ১৯৬৮, পৃঃ ১৯৬-৯৭।

২০. সতীশচন্দ্র মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১-৩২।

২১. বাংলাদেশের চরের ওপর বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন, আহমেদ মুসা, ইকবাল হোসেন বাদল, 'চরের জমি জোতদারের দখলে', "বিচিত্রা", ৯ বর্ষ ১৯ সংখ্যা, ১৭.১০.১৯৮০।

২২. নফিস আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫। উদাহরণস্বরূপ তিনি আরো লিখেছেন, যমুনা বা ধলেশ্বরীর তীরবর্তী ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার যে কোন থানা বা মৌজা এক ঋতুতে নদীর ভাঙ্গনের ফলে হয় কমপক্ষে ২০০ থেকে ৩০০ একর জমি হারায় অথবা ঐ পরিমাণ জমি (চর হিসেবে) লাভ করে। রেনেলের সময় যা ছিল চর মাত্র, ১০০ বছর পর তাই হয়ে উঠেছিল বরিশালের এক জনবহুল দ্বীপ—ভোলা। পৃঃ ৩৫।

২৩. ঐ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন মুসা ও বাদলের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ। তাঁরা ঐ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, গত পনের বছরে বাংলাদেশের চরাঞ্চলে সংঘর্ষে মৃত্যুবরণ করেছেন প্রায় পনের হাজার লোক।

২৪. ঐ।

২৫. প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭। রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য—'নদী যেখানে কীর্তিনাশা মানুষ সেখানে নিত্য নূতন কীর্তি অর্জন করে। তাই কোনো কীর্তিনাশা বাংলার নিজস্ব কীর্তিকে নষ্ট করিতে পারে নাই।... বার ভুঁইয়াদেরও স্বাধীনতাপ্রিয়তাকে উদ্দীপিত করিতে পারিয়াছিল একমাত্র পদ্মা ও মেঘনার নির্মম ভাঙ্গাগড়া।' উদ্ধৃত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, ঐ।

২৬. নফিস আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬।

২৭. ঐ,।

২৮. Pierre Bessaignet, 'Tribes of the Northern Border of East Pakistan', Pierre Bessaignet (ed), *Social Research in East Pakistan*, Dacca, 1961, p. 175.

২৯. Lucien Bennet, 'Ethnic Groups of Chittagong Hill', Pierre Bessaignet (ed) *Social Research in East Pakistan*, Dacca, 1961, pp. 137-171.

৩০. ব্যাসাইনের প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ১৮৯।

৩১. Fernand Braudel, *The Mediterranean World in the Age of Philip II* (translated from French by Sian Reynolds), London, 1978, p. 41.

৩২. নফিস আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

৩৩. ঐ, পৃঃ ২০-২৩।

৩৪. নফিস আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।

৩৫. ঐ, পৃঃ ২৫।

৩৬. ঐ

৩৭. ব্রদেল প্রাগুক্ত. পৃঃ ৬৬। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ব্রদেল দেখিয়েছেন, সমতলভূমি মানেই প্রাচুর্য, সম্পদ আর স্বাচ্ছন্দ্য নয়। 'সোনার বাংলা' কিংবদন্তী শুনে আমাদের অনেক সময় সমতলভূমি সম্পর্কে এ ধারণা জন্মাতে পারে। কিন্তু তা যে শুধুই কিংবদন্তী পরবর্তী অধ্যায়ে সে সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করা হবে।

৩৮. *Papers Relating to East India Affairs*, London, 1802, p. 78.

৩৯. "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা", ৭/৭, জুলাই ১৮৬৯।

৪০. ঐ, ৭/১৬, জানুয়ারী, ১৮৭০।

৪১. *Papers Relating to East Indian Affairs*, 1802, পৃঃ ৭৮।

৪২. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন, Frank, B. Simson. *Letters on Sport in Eastern Bengal,* London, 1885. সিমসনের বইটি যদিও প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৫ সালে কিন্তু এর ভিত্তি ছিল ১৮৪৭ সাল থেকে সংরক্ষিত রোজনামচা ও চিঠিপত্র। তাঁর বই থেকে জানা যায়, হিংস্র জন্তু ছাড়াও হরিণ, শৃগাল ও নানারকমের পাখির কমতি ছিল না পূর্ববঙ্গে। একদিন শিকারে গিয়ে তিনি দু'টি হরিণ ও চারটি খরগোশ সহ মোট ১০৬টি বনমোরগ, কবুতর ইত্যাদি শিকার করেছিলেন। চিঠি ঃ ৪৬।

৪৩. C.S. (A.L. Clay), *Leaves from a Diary in Lower Bengal,* London, 1896. পৃঃ ৫৭-৬৪।

৪৪. সিমসন, প্রাগুক্ত, চিঠি ৩৭।

৪৫. সুবালা আচার্য, "ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য", কলকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ৩।

৪৬ "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা", ৭/৭, জানুয়ারী, ১৮৭০।

৪৭. সিমসন, প্রাগুক্ত, চিঠি, পৃঃ ৪৪।

৪৮. Lovat Fraser, *India Under Curzon and After,* London, 1912, pp. 367-68.

৪৯. *Census,* 1891, p. 46.

৫০. ঐ, পৃঃ ৬৪।

৫১. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal,* Vol. V (Reprint), New Delhi, 1973, p. 212.

৫২. সতীশচন্দ্র মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।

৫৩. নাফিস আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।

৫৪. বিস্তৃত বিরণের জন্যে দেখুন, C.A. Bentley, *Malaria and Agriculture in Bengal,* Calcutta, 1925.

৫৫. ঐ, পৃঃ ২৭।

৫৬. ঐ, পৃঃ ৩৫।

৫৭. বেন্টলি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬। ১৮৫৭ সালে ইংল্যাণ্ডে গঠিত হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ে। ১৮৬২ সালে কোম্পানী চালু করেছিল কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রেল লাইন এবং ১৮৭১ সালে তা বিস্তৃত করা হয়েছিল গোয়ালন্দ পর্যন্ত। ১৮৭৪ থেকে ১৮৭৯ সালের মধ্যে সারা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত লাইন বসানো হয়েছিল এবং স্টেশন স্থাপিত হয়েছিল পার্বতীপুর, দিনাজপুর ও কাউনিয়ায়। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রেল লাইন চালু হয়েছিল ১৮৮৫ সালে। বেন্টলির মতে, ১৯২৫ সালে উত্তর বঙ্গে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার ছিল ২৩.৭%. (পৃঃ ৬)।

৫৮. হান্টার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৪।

৫৯. "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা", ৭/১৫, ডিসেম্বর ১৮৬৯।

৬০. হান্টার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৭।

৬১. ''সোমপ্রকাশ'', ৯.৭.১৮৬৭।

৬২. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. VII, London, 1876, p. 345.

৬৩. *Census 1891*, পৃঃ ৫৬।

৬৪. ঐ।

৬৫. ''সোমপ্রকাশ'', ২৮.৯.১৮৬৩।

৬৬. ঐ, পৃঃ ৫৭।

৬৭. ঐ, পৃঃ ৬১-৬৪।

৬৮. ঐ, পৃঃ ৩৬। যশোরের নড়াইল সম্পর্কে ১৮৬৩ সালে ''সোমপ্রকাশ'' লিখেছিল, 'জ্বর রোগ ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে।' ''সোমপ্রকাশ'', ১১.১০.১৮৬৩।

৬৯. *Census 1891*, পৃঃ ৭৬।

৭০. ঐ. পৃঃ ৭৭।

৭১. L.S.S. O' Malley, *Eastern Bengal District Gazetter : Chittagong*, Calcutta, 1908, p. 76.

৭২. শ্রীমতী রাসসুন্দরী, ''আমার জীবন'', কলকাতা, ১৩০৫, পৃঃ ১৩৫। কবিতাটির নাম 'রি এমদিয়ার ১২৮০ সালের জ্বর বর্ণন'। (রাগিনী ধানশী। তাল খেমটা)।

৭৩. J. Westland, *A Report on the District of Jessore : its Antiquities, its History and its Commerce*, Calcutta, 1874, pp. 139-43. ১৮৫২ সালে যশোরের মহামারী সম্পর্কে সংবাদপত্রে একটি খবর—'...গ্রামকে গ্রাম উজার হইয়া যাইতেছে, যে পরিবারে ১০ জন মনুষ্য, সেই পরিবারে ২ জন জীবিত আছে কিনা সন্দেহ। কোন কোন গৃহ এককালীন জনশূন্য হইয়াছে, অনেকে বাসস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে...সকলেই মরিয়া যাইতেছে, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির নিকট এক প্রকার পার আছে, এই যমবৃষ্টি একেবারে সৃষ্টি নাশ করিয়া বসে, ইহার কিছুতেই নিস্তার নাই।' ''সংবাদ প্রভাকর'', ২১.১ ১৮৫২।

৭৪. হেমলতা সরকার, ''স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ববঙ্গে শিক্ষা সমাজ ও ধর্মান্দোলনের আংশিক চিত্র'', কলকাতা, ১৯৫১, পৃঃ ৪৫২।

৭৫ দীনেশচন্দ্র সেন, ''ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য'', কলকাতা, ১৯৬৯, পৃঃ ৭২। ঢাকায় ১৮৮১ সালের কলেরার চিত্র এঁকেছেন দীনেশচন্দ্র সেন এ ভাবে—' ''কলেরা তাতীবাজার হইতে শুরু করিয়া ধীরে ধীরে বাবুর বাজার মুখে রওয়ানা হইল। স্কুলে যাইয়া দেখিতাম ক্রমশঃ ছেলে কমিয়া যাইতেছে, তাহারা ভয়ে ঢাকা ছাড়িয়া যাইতেছে। পথে দোকানপাটে শুষ্ক ভীত নেত্র লোকগুলি দাঁড়াইয়া কেবল ঐ ব্যারামের কথাই বলিতেছে।' পৃঃ ৭০। শহর ছেড়ে লোক পালানো শুরু হলে নৌকো ভাড়া ক্রমে বেড়ে যেত।

যে দূরত্বের ভাড়া ছিল দু'থেকে আড়াই টাকা তা হয়ে যেত ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা। পৃঃ ৭২।

১৮৫০ সালে কুমিল্লায় মহামারী সম্পর্কে একটি সংবাদ—(কলেরার কারণে). '...কেহ দেহ ত্যাগ কেহ গৃহ ত্যাগ করিবাতে প্রায় এ প্রদেশ নিৰ্ম্মনুষ্য হইল, প্রত্যহই ১০/১২ টা মৃত শব দাহনার্থে গোমতীতে নীত হয় ও মুসলমানের সব শব কবরস্থানে নীত ও খনিত হয় ঐ রোগে বহুতর যবনের মৃত্যু ঘটনাতে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জেহেলখানার উত্তরাংশে কবরস্থানে শব পোতনে নিষেধ হইয়াছে।...

প্রিন্সিপাল সদর আমীন ও অন্যান্য প্রধান ২ রাজ কর্মচারীগণ স্বীয় ২ বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্বক অপর ব্যক্তির আবাসে অবস্থিতি করিতেছেন. ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব ইতস্তত স্থান হইতে অনবরত ক্রন্দন ধ্বনিতে এবং চতুর্দিক সমন্বিত হাহাকার স্বরে লোক সকল অস্থির হইতেছে...' ''সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'', ৩.৫.১৮৫০।

৭৬. হেমলতা সরকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫২।

৭৭. শ্রীনাথ চন্দ, ''ব্রাহ্ম সমাজে চল্লিশ বৎসর'', ময়মনসিংহ, ১৯১৩, পৃঃ ১০৬।

৭৮. J.C. Jack, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the Faridpur District 1904 to 1914*, Calcutta, 1916, p. 7.

৭৯. W.W. Hunter, *Statistical Account of Bengal*, Vol. VII, p. 346.

৮০. হার্টলি, প্রাগুক্ত. পৃঃ ৭।

৮১. হান্টার, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৪৯।

৮২. ঐ. পৃঃ ৭৬। উনিশ শতকের মধ্যভাগেও যে এ অঞ্চলে কলেরার প্রকোপ কি ভয়াবহ ছিল তার বিবরণ পাওয়া যাবে সংবাদপত্রের একটি সংবাদে —'. . . গত ফাল্গুন মাসের আরম্ভাবধি উক্ত প্রদেশ ব্যাপিয়া অত্যন্ত মহামারি উপস্থিত হইয়াছে। এই ব্যাপার ওলাউঠা পীড়ামূলক এবং জ্বর বিকার রোগ ও তদ্রূপ প্রবল হইয়া উভয় পীড়াতে উক্ত দেশ একেবারে নিঃশেষ হও নোপক্রম হইয়াছে প্রত্যহ শতাধিক লোক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছে এবং দাহ সমাধি, নিখাত প্রভৃতি প্রথার আর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নির্বাহ না হইয়া প্রায় অধিকাংশ শব প্রত্যহ জলসাৎ হইতেছে বিশেষতঃ ভূরি ২ নির্ব্বান্ধব ও পান্থ শব ডোমদিগের দ্বারা গৃহীত হওত নদীতে নিঃক্ষীপ্ত হওয়াতে তৎসমূহ শড়িত হইয়া উত্তরঙ্গিনীর সলিল এমত দুর্গন্ধ হইয়া উঠিয়াছে যে তৎজীবন পানে নীয়তই নরজীবন নাশের আমূল হইতেছে। বর্তমান মাসের প্রথম সপ্তাহে নগরস্থ শান্তি রক্ষক মহাশয় তত্রস্থ কারারুদ্ধ লোকদিগের অধিক সংখ্যককে বিনা কারণে এবং তদ্দিগের আসেধাবস্থার শেষ না হইতেই মুক্ত করিয়া দিয়াছেন যেহেতুক কারাগার মধ্যে মরকের অধিক্য হওয়াতে

তন্মধ্যে মৃত শবাদির বহির্নির্গত করণের লোকাভাব যথোচিত ক্লেশ হইতেছিল অতএব তদর্থের লাঘবতা জন্য এতাবতা বিবেচনা হইয়াছিল।...."সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়". ৩,৪,১৮৫২।

৮৩. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন, Chittabrata Palit, Origins of Some Bengali Villages C. 1750-1850', *Perspectives on Agrarian Bengal*, Calcutta. 1982.

৮৪. ঐ।

৮৫. ঐ।

৮৬. ঐ।

৮৭. C.G.H. Allen, *Final Report of the Survey and Settlement of the District of Chittagong, 1888 to 1898*, Calcutta, 1900, pp. 54-65.

৮৮. চিত্তব্রত পালিত, উদ্ধৃত হয়েছে পূর্বোক্ত প্রবন্ধে, পৃঃ ৯।

৮৯. Benoy K. Chowdhury, 'Agrarian Economy and Agrarian Relations in Bengal, 1859-1885', N.K. Sinha (ed), *History of Bengal*, Calcutta, 1966, p. 246.

৯০. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. XI, London, 1876, p. 285.

৯১. *Census* 1881, Calcutta, 1883, p. 45.

৯২. বিনয় কে, চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৬।

৯৩. *Census* 1881, p. 45. ১৮৩০ থেকে ১৮৭২ এর মধ্যে বাখরগঞ্জ সুন্দরবন অঞ্চলে ২৭৫,৮০৪ বর্গমাইল বা ১৭৭,১৫২ একর পতিত জমি উদ্ধার করা হয়েছিল। বাকীটুকুও আবাদের অন্তর্গত হয়েছিল ১৮৭২ থেকে ১৯১২ এর মধ্যে। Radhakamal Mukherjee, *The Changing Face of Bengal*, Calcutta, 1938, পৃঃ ১৩৫।

৯৪. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, *Census* 1891, সপ্তম অধ্যায়।

৯৫. F.O. Bell, *Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of Dinajpur 1934-1940*, Calcutta, 1942, p. 7.

৯৬. বিনয় কে চৌধুরী, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ২৪৬। তবে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বা কোন অঞ্চলের সমৃদ্ধি নির্ভর করেছে নদীর ওপর। উদাহরণ স্বরূপ যশোরের কথা উল্লেখ করা যায়। ঐ অঞ্চলের নদীগুলি মৃতপ্রায়। ১৮৮১ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত এ অঞ্চলে লোকসংখ্যা হ্রাসের পরিমাণ ছিল—৪.০%। এবং ১৯০১-১৯১১ সালে—৩ ০%। নাফিস আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৫।
আবার যেসব অঞ্চল নদীর তীরে অবস্থিত, যেমন, কুমিল্লা, বরিশাল বা বগুড়া, সে সব অঞ্চলের লোক ঘনত্ব বেশী। কারণ উচ্চফলনশীল ধান

পাট উৎপাদন, ঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় বন্যা, জল নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা (ফলে রোগের প্রাদুর্ভাব কম) এবং বাণিজ্যের জন্যে সুগম জলপথ। নাফিস আহমদ, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৯৭।

৯৭. মাহবুব আহমেদ, 'নগর ঢাকার বিবরণ', ''বিচিত্রা'', ৩ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ১৮ এপ্রিল, ১৯৭৫।

৯৮. Pradip K. Sinha, 'Rural Towns in Eastern Bengal—A Study in Rural-Urban Reciprocity', Pradip. K. Sinha, *Nineteenth Century Bengal : Aspects of Social History,* Calcutta, 1960, p. 80.

৯৯. M.S. Islam, 'Life in the Mufassal Towns of Nineteenth Century Bengal', Kenneth Ballhatchet and John Harrison (eds). *The City in South Asia : Pre Modern and Modern,* London, 1981, p. 226.

১০০. সি. এস. (রে), প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬৫-৮৬। অথবা দেখুন, Ex-Civilian, *Life in the Mofussil or the Civilian in Lower Bengal,* (লণ্ডন থেকে প্রকাশিত কিন্তু প্রকাশের তারিখ নেই) এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, ময়মনসিংহ সম্পর্কে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১০১. ঐ, পৃঃ ৮৭-৮৮।

১০২. নবীনচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৭।

১০৩. Water Hamilton, *The East Indian Gazetteer,* London, 1815, p 327.

১০৪ Reginald Heber, *Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India . . .,* London, 1827, pp. 140-156.

১০৫. ''সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'', ২১.১২.১৮৫০।

১০৬. From Assistant Surgeon H.C. Cutcliffe, Officiating Civil Surgeon of Dacca to the Chairman of Municipal Commissioner of Dacca, No. 106, dt. Dacca 7.4. 1869. *Proceedings of the Lt. Governor of Bengal, Judicial Department,* September, 1879.

১০৭. *Census 1872,* General Statement VII এর উপাত্তের সাহায্যে। এসব শহরগুলির জনসংখ্যা ছিল নিম্নরূপ : ঢাকা (ঢাকা জেলায়) ৬৯, ২১২, চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম জেলায়) ২০, ৬০৪. রামপুর বোয়ালিয়া (রাজশাহী জেলায়) ২২, ২৯৬, সিলেট (সিলেট জেলায়), ১৯. ৮৪৬, পাবনা (পাবনা জেলায়) ১৫. ৭৩০, সিরাজগঞ্জ (পাবনা জেলায়) ১৮, ৮৭৩, নওয়াবগঞ্জ (তৎকালীন ২৪ পরগনা জেলায়), ১৬. ৫২৫, দিনাজপুর (দিনাজপুর জেলায়) ১৩, ০৪২, রংপুর (রংপুর জেলায়) ১৪, ৮৪৫, মানিকগঞ্জ এবং নারায়ণগঞ্জ

(ঢাকা জেলায়) যথাক্রমে ১১, ৫৪২, ও ১০, ৯১১, কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ জেলায়) যথাক্রমে ১৩, ৬৩৭ এবং ১০, ০৬৮, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (তৎকালীন ত্রিপুরা জেলায়) যথাক্রমে ১২, ৯৪৮ এবং ১২, ৩৬৪।

১০৮. 'Thakbust Survey Field Book for Barisal Town', p. 7, উদ্ধৃত, সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ২২৫।

১০৯. Henry Beveridge, 'The District of Bakerganj'. p. 327, উদ্ধৃত, সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ পৃঃ ২২৫।

১১০. *Bengal Administration Report 1872-73* p. 115.

১১১. বিপিনচন্দ্র পালের গ্রন্থ থেকে, প্রদীপ সিনহার, পূর্বোক্ত গ্রন্থের প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয়েছে, পৃঃ ৬২।

১১২. এ পরিপ্রেক্ষিতে নবীনচন্দ্র সেন লিখেছিলেন, 'তখন পৈত্রিক বাসস্থান ছাড়িয়া, শহরে বাড়ীকরা কি হিন্দু কি মুসলমান ভদ্রলোকের পক্ষে নিন্দনীয় ছিল।' নবীনচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত. পৃঃ ৩৯৭।

১১৩. *Census 1891.*

১১৪. নাফিস আহমেদ, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩১২।

১১৫. *Census 1891*. pp. 2-3.

১১৬. Shapan Adnan etal, 'The Preliminary Findings of a Social and Economic Study of Four Bangladesh Villages', *The Dacca University Studies*, Part A, Vol XXIII, June 1975, p. 113.

১১৭. উদ্ধৃত, চিত্তব্রত পালিত, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ৮।

১১৮. ব্যক্তিগতভাবে, এ বিষয়ে নিজের গ্রামে খোঁজ নিয়েছি আমি। তিনপুরুষ আগে, এ গ্রামে আমাদের পূর্বপুরুষ বসতি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কোন অঞ্চল থেকে কি ভাবে এলেন সে বিষয়ে কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। গত পঞ্চাশ বছরে এ পরিবারের বিভিন্ন শাখা মূল গ্রাম ত্যাগ করে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামে বসতি বেঁধেছে।

১১৯. প্রদীপ, কে, সিনহা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৪।

১২০. রমেশচন্দ্র মজুমদার, "জীবনের স্মৃতিদীপে", কলকাতা ১৯৭৮, পৃঃ ১০। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে কৃষ্ণকুমার মিত্রের কথা। উনিশ শতকের মধ্যভাগের ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চলের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, ঐ সময় ঘোড়ায় যাতায়ত করাটা বেশ প্রচলিত ছিল। এবং গরুর গাড়ী তিনিও তখন দেখেননি। কৃষ্ণকুমার মিত্র, "আত্মচরিত", কলকাতা, ১৩৮১, পৃঃ ৬।

১২১. বেন্টলি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।

১২২. James Taylor, *A Sketch of Topogrophy and Statistics of Dacca*, Calcutta, Dacca, 1840, p. 119, টেইলর উল্লেখ করেছেন,

শহরে ঘোড়া বা গরুটানা গাড়ী ক্কচিৎ কখনো দেখা যেত। পৃঃ ২৭।

১২৩. From Col. B.E. Beacon, Deputy Secretary to the Govt. of India. Military Department, to the Secretary of the Govt. of Bengal, Judicial Dept. No. 13 16, dt. 31.6.1871, *Proceedings of Lt. Governor of Bengal. Judicial Dept*, Feb. 1871.

১২৪. বিপিনচন্দ্র পাল, "সত্তর বছর", কলকাতা, ১৩৬২, পৃঃ ৯০।

১২৫. বেন্টলি, প্রাগুক্ত, ২৭।

১২৬. *Proceedings of the Lt. Governor of Bengal, Judicial Department. May, 1869.*

১২৭. F.H.B. Skrine, *Memorandum on the Material Condition of the Lower Orders in Bengal during the ten years from 1881-82* to *1891-92*, Calcutta, 1892 (বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন)।

১২৮. স্ক্রাইন তাঁর উপরোক্ত রিপোর্ট এ পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করেছিলেন, 'The development of steam navigation in our rivers is one of the most interesting features of the report. It has brought within the influences of civilization huge tracts, which 10 or 15 years back are almost isolated.' ঐ, পৃঃ ৩।

১২৯. Jemes Hornell, *The Boats of the Ganges: Memoirs of the Asiatic Society of Bengal*, Calcutta, 1924, p. 176.

১৩০. ঐ, পৃঃ ১৮৬।

১৩১. ঐ, পৃঃ ১৯০। সরকারী এক রিপোর্টে জানা যায়, ১৮৮৯ সালের দিকে ঢাকা জেলার চাষীদের শতকরা দশভাগের নিজস্ব নৌকো ছিল। এগুলির দাম ছিল দশ থেকে একশো টাকা, *Agricultural Report of the Dacca District* (A.C. Sen), Calcutta, 1889, p. 17.

১৩২. Basil Greenhill, *Boats and Boatmen of Pakistan*, London, 1971, pp. 88-89.

১৩৩. ঐ, পৃঃ ১২২।

১৩৪. "ঢাকা প্রকাশ", ৫,১১,১৮৬৬।

১৩৫. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'দো-চালা', "বাংলাদেশের লোকশিল্প" ঢাকা, ১৯৮২, পৃঃ ৭৮।

১৩৬. ঐ, পৃঃ ৮৪।

১৩৭. Hiteshranjan Sanyal, 'Temple-building in Bengal from the Fifteenth to the Nineteenth Century', Barun De (ed), *Perspectives in Social Sciences I*, Calcutta, 1977, p. 121.

১৩৮. ডেভিট ম্যাকচ্চন, 'পূর্ব পাকিস্তানের মন্দির' (ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ)

"ইতিহাস", ২ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র ১৩৭৫, পৃঃ ২৪০।

১৩৯. Hitesranjan Sanyal, 'Religious Architecture in Bengal', *Marg*, March 1974, p. 41.

১৪০. ডেভিট ম্যাকচ্চন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪২।

১৪১. ঐ, পৃঃ ২৪৪।

১৪২. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'মসজিদ বাংলাদেশে', "বক্তব্য", দ্বিতীয় সংকলন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, পৃঃ ১১৩।

১৪৩. Ahmad Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, Dacca, 1961, p. 22.

১৪৪. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ১১৩।

১৪৫. ঐ, পৃঃ ১১৫-১১৬।

১৪৬. হিতেশরঞ্জন স্যান্নালের মার্গ এ প্রকাশিত প্রবন্ধ, পৃ: ৩৩।

১৪৭. ঐ, পৃঃ ৩১। আমার সঙ্গে আলোচনাকালে হিতেশরঞ্জন স্যান্যাল জানিয়েছেন, তিনি মনে করেন, অষ্টাদশ-উনিশশতকে পতিত জমি উদ্ধারের ক্ষেত্রে মসজিদের ভূমিকা নগণ্য নয়। কারণ অনেক ক্ষেত্রে একটি মসজিদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠ্‌তো বসতি—সব কিছু।

১৪৮. নীহার রঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৭।

১৪৯. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৬৪।

১৫০. আবুল মনসুর আহমদের লেখায়ই প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় যে, ফরাযীরা এখানে সাদা লুঙ্গির প্রচলন করেছিলেন। এ ছাড়া প্রাচীন দু'একজনের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি এবং তাঁরা এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন নি। সুতরাং ধারণা করে নিতে পারি যে, পূর্ববঙ্গে তহবন্দের প্রচলন ফরাযীরাই করেছিলেন। আবুল মনসুর আহমদ, "আত্মকথা", ঢাকা, ১৯৭৮, পৃঃ ২৪-২৭। কৃষ্ণকুমার মিত্রও এ কথা উল্লেখ করেছেন। দেখুন, কৃষ্ণকুমার মিত্র, "আত্মচরিত", পৃঃ ৩৪।

১৫১. পূর্ববঙ্গে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভাষার ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেছেন—Catherine Houghton, 'East Bengal and Political Development in Sociolinguistic Perspective', John R. Mclane (ed), *Bengal in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, Michigan, 1975, pp. 139-140. এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, লিখেছিলেন, 'আধুনিক জগতে জাতি ও সভ্যতা অর্থে মুখ্যত ভাষা।' এবং বাঙ্গালীদের জাতীয়তার সূত্রই হচ্ছে বাংলাভাষা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'বাংলা ভাষার কুলজী' "বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে", কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ১। আরো দেখুন, আহমদ শরীফ, 'বাঙ্গালা ভাষার প্রতি সেকালের লোকের মনোভাব', "ইতিহাস", ১/৩, পৌষ-চৈত্র, ১৩৭৫।

১৫২. G.A. Grierson, *Linguistic Survey of India* (Introductory,

Vol, I, Part. I) Calcutta, 1927. p. 54.

১৫৩. পার্বতীচরণ ভট্টাচর্য, "বাংলাভাষা", কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ৬১-৬২।

১৫৪. ঐ।

১৫৫. উনিশ শতকে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ—উভয় অঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন রচনায় এ সূক্ষ বিরোধ নজরে পড়ে। পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিকে এ বিষয়ে একবার লেখা হয়েছিল—'কলিকাতা অঞ্চলের লোকের মনে বাঙ্গাল বলিয়া এ দেশেরপ্রতি বিজাতীয় ঘৃণার ভাব পোষিত হইয়া আসিতেছে।...উপরিউক্ত বিদ্বেষভাবের এই ফল হইতেছে যে এ দেশীয় কৃতবিদ্য সদ্বিবেচক লোকের মনেও ঐ প্রদেশের লোকেরও তাহাদিগের লিখিত পুস্তকের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার এবং বিদ্বেষের ভাব সঞ্চারিত হইতেছে।' 'পূর্বাঞ্চলীয় ভাষা', "ঢাকা প্রকাশ", ৩০.৯.১৮৬৫। কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর আত্মচরিতে উল্লেখ করেছেন, 'কলিকাতা অঞ্চলের ছাত্রগণ পূর্ববাংলার ছাত্রদিগকে 'বাঙ্গাল'. . .বলিয়া বিদ্রূপ করিত।' কৃষ্ণকুমার মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩।

১৫৬. দেখুন, 'Bengal Library Catalogue' *Appendix to Calcutta Gazettee*, (1895-1900), Calcutta.

১৫৭. হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, "স্বভাব কবি গোবিন্দদাস", রংপুর, ১৩৩০ (বাংলা সন), পৃঃ ১৭১।

১৫৮. ঐ, পৃঃ ১৮৯।

১৫৯. ঐ, পৃঃ ২৯১।

১৬০. আজহারউদ্দীন খান, "মুহম্মদ শহীদুল্লাহ", (সাহিত্য সাধক চরিতমালা) কলকাতা, ১৯৮১, পৃঃ ৪০। এ পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য বিবরণের জন্যে দেখুন, মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত, "ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ",. ঢাকা, ১৩৭১ (বাংলা সন)।

১৬১. উদ্ধৃত, ঐ, পৃঃ ৪২।

১৬২. ঐ।

১৬৩. Abdur Razzak, *Bangladesh : State of the Nation*, Dacca, 1981 p. 3.

১৬৪. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, "পূর্ববাঙ্গালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি", (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), ঢাকা, ১৮৭০ ও ১৯৭৫।

১৬৫. বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, 'লোকচিত্র', "বাংলাদেশের লোকশিল্প", পৃঃ ১-২।

১৬৬. অমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায়, 'নকশীকাঁথা', "বঙ্গলক্ষীর ঝাপি", কলকাতা, ১৩৮৬, পৃঃ ৩৯। পশ্চিমবঙ্গের গুরুসদয় মিউজিয়ামে রক্ষিত নকশী কাঁথার বিরাট সংগ্রহ পরীক্ষা করে তিনি আরো লিখেছেন, 'নকশী কাঁথার রক্ষিত নির্দেশনগুলি থেকে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গের মহিলারাই এ চারু

শিল্পটির প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন।' পৃঃ ৩৩।

১৬৭. ঐ।

১৬৮. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, 'কাঁথা', ''বাংলাদেশের লোকশিল্প'', পৃঃ ১৭-২৪।

১৬৯. বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, 'সখের হাড়ি লক্ষির সরা' 'ঐ', পৃঃ ৬৬।

১৭০. রাধাকমল মুখার্জী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'বাঙ্গালীর এই রক্ত সংমিশ্রণ তাহার প্রধান গৌরব। ইহা হইতেই আসিয়াছে বাঙ্গালীর কোমলতা ও ঔদার্য।...তাহা ছাড়া বাঙ্গালার মাটির, বাঙ্গালার জলের, প্রতিবেশের প্রভাব খুব প্রত্যক্ষ, খুব নিবিড়। ... বাঙ্গালী তাই সবক্ষেত্রে ভাবুক, উদার ও সেরা বিদ্রোহী। তাই আর্য্য সংস্কৃতি ও বেদ বিরোধী বৌদ্ধ ধর্ম্ম বাঙ্গালাতে প্রথম ও প্রধান আশ্রয় পাইয়াছিল।' রাধাকমল মুখার্জী, ''বিশাল বাঙ্গালা'' পৃঃ ৫২-৫৩।

১৭১. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৩-৭৪। এ সম্পর্কে হবিবুল্লাহ খানিকটা আলোকপাত করেছেন। দেখুন, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'বাংলার মুসলমান' ''সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস'' ঢাকা, ১৯৭৪।

১৭২. গোপাল হালদার, ''স্রোতের দীপ'' ঢাকা ১৯৭৬, পৃঃ ৪।

১৭৩. বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, 'পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি' ''স্বদেশ ও সাহিত্য'' ঢাকা ১৯৬৯ পৃঃ ৩।

১৭৪. আহমদ শরীফ, ''বাঙ্গালী ও বাঙলা সাহিত্য'', পৃঃ ১৫।

১৭৫. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫।

১৭৬. ব্রদেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৫।

১৭৭. নাফিস আহমেদ, প্রাগুক্ত, ১১৪।

১৭৮. ফ্রেজার প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৭ ৩৬৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঔপনিবেশিক সমাজ গঠন ও শ্রেণী বিন্যাস

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমি সামগ্রিকভাবে পূর্ববঙ্গের একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এ পূর্ববঙ্গের ভিত্তি ছিল কৃষি, যেখানে শিল্প বিকশিত হওয়ার কোন উপায় ছিল না, যেখানে শহর এবং গ্রামের মধ্যে ছিল না খুব একটা পার্থক্য। ঔপনিবেশিক সরকার এ অঞ্চলকে ব্যবহার করেছিল কাঁচামালের যোগানদার আড়ত হিসেবে। পূর্ববঙ্গ তৎকালীন বাংলার একটি বিরাট অংশ হওয়া সত্ত্বেও কালক্রমে পরিণত হয়েছিল কলকাতার পশ্চাদভূমিতে।

এ পটভূমিকা সামনে রেখে আমি আলোচনা করবো পূর্ববঙ্গের ঔপনিবেশিক সমাজ গঠন ও শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে। এর আগে সমাজ ইতিহাসের লেখকরা এ বিষয়টির ওপর যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তাই এ অধ্যায়ে, এ বিষয় সম্পর্কে আলোচনার যৌক্তিকতা, সমাজ গঠন ও শ্রেণীবিন্যাস এবং বিকাশমান মধ্যশ্রেণী কি ভাবে ঔপনিবেশিক শাসকের সমর্থনে সাধারণ মানুষের ওপর শাসকের আধিকত্য বজায় রাখতে সহায়তা করেছিল সে সম্পর্কেও আলোকপাত করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এও বোঝার চেষ্টা করবো কেন হিন্দু মুসলমান সব সময় ধর্মীয় পার্থক্যের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেছিল—শ্রেণী বা সমাজের ওপর নয়।

১. সামাজিক ইতিহাসের রচনার উৎস

বাংলাদেশের ঐতিহাসিকরা (যেমন, মল্লিক ১৯৬১, আহমদ ১৯৬৫; আহমদ ১৯৭৪, আকন্দ ১৯৮১; এদের কয়েকজনের বই সম্পর্কে পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে) ক্রমেই সামাজিক ইতিহাস রচনার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু

এখনও তাঁরা, সামাজিক ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট, গেজেটিয়ার, সেন্সাস প্রভৃতির ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। এবং প্রধানত এ সব উপাদানের ভিত্তিতেই সামাজিক ইতিহাসের কাঠামো নির্মিত হচ্ছে। কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিতে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। সরকারী নথিপত্রের ওপর বিশেষ নির্ভরশীলতা কি সামাজিক ইতিহাস রচনার সহায়ক? বা সামাজিক ঐতিহাসিকরা যে সব গ্রন্থ রচনা করেছেন তা একটি নির্দিষ্ট সময়ের সমাজকে বুঝতে কতটুকু সাহায্য করে? দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কিভাবে ইতিহাসের রূপ বদলে দেয়? বাংলাদেশের চারজন ঐতিহাসিকের সামাজিক ইতিহাস বিষয়ক চারটি গ্রন্থ ও ইংরেজ সিভিলিয়ানদের রচিত বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট গেজেটিয়ার ইত্যাদির ভিত্তিতে উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

ক. সরকারী নথিপত্র, গেজেটিয়ার, সেন্সাস এবং অন্যান্য প্রকাশনা

উনিশ শতকে ব্রিটিশ সিভিলিয়ানরা উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পুংখানুপুংখ রিপোর্ট প্রেরণ করেছিলেন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে, নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিষয়ে যোগাড় করেছিলেন নানাবিধ তথ্য এবং তার বেশ কিছু প্রকাশিতও হয়েছিল। কিন্তু নির্বিচারে এসব তথ্য উপাত্ত ব্যবহারের আগে সেগুলির সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রয়োজন, নয়ত মূল্যায়নের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে তা আমাদের ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সহায়তা করবে। যেমন, উইলিয়াম হান্টারের (১৮৭১) 'ইণ্ডিয়ান মুসলমানস' এর কথা ধরা যাক। আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই বইটির সিদ্ধান্ত সমূহ নির্বিচারে এতোদিন গ্রহণ করা হয়েছিল। এবং এখনও যে করা হচ্ছে না তা'নয়। হান্টারের একটি তত্ত্ব ছিল এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান জমিদাররা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগেও মুসলমান জমিদারীর সংখ্যা ছিল নগণ্য।[১] অর্থাৎ হান্টার অনেক ক্ষেত্রে সত্য লুকিয়েছিলেন।[২]

ইংরেজ আমলে প্রকাশিত সরকারী নথিপত্র বা ইংরেজ সিভিলিয়ান-

দের রচনা উৎস হিসেবে ব্যবহারের আগে, আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারত তখন শাসিত হত একটি ঔপনিবেশিক সরকার দ্বারা এবং সেই সরকারের আমলারা স্বাভাবিকভাবেই নিজ সরকারের স্বার্থ দেখতেন। ফলে রিপোর্ট, ইতিহাস যাই হোকনা কেন সেগুলি রচনাকালে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীই সামগ্রিকভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রন করতো।

ঔপনিবেশিক সরকারের সিভিলিয়ানদের রচিত বা সম্পাদিত গেজেটিয়ার, সেন্সাস বা অন্যান্য অনেক রচনার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ—ব্রিটিশ শাসনের যৌক্তিকতা প্রমাণ এবং প্রশাসনিক।

বৃটেনের হুইগ ঐতিহাসিকরা মনে করতেন, ইংরেজদের লোভ, শঠতা এবং নির্দোষের রক্তপাতই ছিল ভারতে বৃটিশ শাসনের ভিত্তি। এ সম্পর্কে আরেকটি মত ছিল, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ব্যাপারটা একটা দৈব দুর্ঘটনা মাত্র। কিন্তু সিভিলিয়ান ঐতিহাসিক হান্টার (এনালস অফ রুরাল বেঙ্গল, ১৮৬৮) লায়াল (রাইজ এণ্ড একসপ্যানসন অফ দি বৃটিশ ডোমিনিয়ন ইন ইণ্ডিয়া, ৩ সং, ১৮৯৬) বা ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মিল (হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, ১৮১৭) প্রমুখ এ দু'টি যুক্তিকে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মত হল, ভারতে বৃটিশ শাসন কোন দৈব দুর্ঘটনা নয়। এটি অনেকদিনের কর্মকাণ্ডের পরিণতি এবং তা ইউরোপ বা বৃটেনের অবিভাজ্য অংশ।[৩]

এ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা চাইতেন, ভারত শাসনের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে। তাঁদের মূল বক্তব্য ছিল, প্রাক-ব্রিটিশ শাসন ছিল অরাজকতায় পূর্ণ যাতে ইংরেজরা এনেছিল পরিপূর্ণ শৃংখলা এবং অনাবিল শান্তি। যেমন, হেনরী বেভারেজ (দি ডিষ্ট্রিকট অফ বাকরগঞ্জ: ইটস হিস্ট্রি এণ্ড ষ্টাটিসটিকস, ১৮৭৬), ইংরেজদের মনে করতেন উৎখাতকারীরূপে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও লিখেছিলেন যে, হুসেন শাহ বা আলীবর্দীও একই ভাবে এদেশে এসেছিলেন কিন্তু তার পরিণতি হয়েছিল খারাপ। ইরেজরাও এসেছিল একই ভাবে কিন্তু তার পরিণতি হয়েছে ভালো। কারণ মুসলমান আমলে যেখানে ছিল অরাজকতা ইংরেজরা এনে দিয়েছিল সেখানে শান্তি। মোটকথা, যা হবার হয়ে গেছে কিন্তু তাই বলে অসহায় ভারতবাসীকেতো আর ব্যাঘ্র্য অধ্যুষিত জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া যায় না।[৪]

আঠারো শতকের শেষার্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রশাসনিক

ক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিল। পূর্ববঙ্গের অজানা অচেনা বিভিন্ন অঞ্চলের আকৃতি, প্রকৃতি, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি সবকিছুই কোন না কোন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। সে জন্যে তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার। ১৮০৭ সালে কোম্পানীর ডিরেক্টররা বাংলা সরকারকে জানিয়েছিলেন যে, বাংলার একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক জরীপ অতীব প্রয়োজন এবং সে জন্যে তখুনি যেন কাজ শুরু করা হয়। এ উদ্দেশ্যে বুকানন হ্যামিলটন (১৭৬২-১৮২৯) প্রথম কাজ শুরু করেছিলেন।[৫]

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর সিভিলিয়ানরা ভারতীয় সমাজ কাঠামো সম্পর্কে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানতে আগ্রহী হলেন। আগ্রহের কারণ, কি ভাবে ঔপনিবেশিক সরকারের কাঠামো বদলাচ্ছিল তা লক্ষ্য করা। অনেকক্ষেত্রে তাঁদের এই অভিজ্ঞতা সরকারী নীতি নির্ধারণে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছিল।[৬]

প্রশাসনিক প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে হান্টার লিখেছিলেন, এ দেশের অধিবাসীদের শাসন করতে হলে এদের জানতে হবে। 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার' সংকলনকালে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, এর উদ্দেশ্য ভারতীয় প্রশাসক এবং ইংল্যাণ্ডের নিয়ন্ত্রকদের সহায়তা করা। বেভারিজ তাঁর বাখরগঞ্জের ইতিহাসেও একই কথার প্রতিধ্বনি করেছিলেন।[৭]

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অটুট রাখার জন্যে সিভিলিয়ানরা কি ভাবে ইতিহাস রচনা বা তথ্য ব্যবহার করতেন বা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী কি ভাবে ইতিহাসের রূপ বদলে দিত তার দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

হান্টার যখন সিভিলিয়ান হিসেবে প্রথম বাংলায় এসেছিলেন, তখন 'পল্লী বাংলার ইতিহাস' (১৮৬৮) লিখেছিলেন। গ্রন্হটি লেখার গোড়ার দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল—'যে লক্ষ লক্ষ মূক ভারতবাসী আমাদের জোয়াল বহন করে থাকে, তাদের ইতিহাস ফুটিয়ে তোলা।'[৮] কিন্তু বই রচনার কাজ শেষ হলে, ভূমিকায় তিনি লিখলেন, 'সামগ্রিকভাবে এই ইতিহাসে প্রাচ্যদেশে ইংল্যাণ্ডের মাহাত্ম্যের গোপন কথাই প্রকাশিত হয়েছে।' কারণ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইংরেজ একটি এলাকা শাসন করতে যাচ্ছে এবং তাদের 'সাহসিকতা ও চরিত্রবলের কাছে জনগণ নতি স্বীকার করছে' এবং এ থেকে বোঝা যায়, 'সাময়িক সফলতা

নয় বরং বেসামরিক সাহসিকতা ও দৃঢ়সংকল্পই বাংলাদেশে, বৃটিশ প্রশাসনের স্থায়ী উৎস হিসেবে কাজ করছে।'[৯]

ভারত বিষয়ক নৃতাত্ত্বিক, আরেকজন ইংরেজ সিভিলিয়ান, আলফ্রেড লায়ালের (১৮৩৫) অবদান অনেকেই স্বীকার করেছেন। ভারতীয় সমাজ কাঠামোর ভিত্তি তিনি জানতে চেয়েছিলেন পুংখানুপুংখ ভাবে। এবং তাঁর মতামত সরকারী অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করেছিল। লায়াল সবসময় ভারতীয় সমাজ কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে বর্ণ ও ধর্মকে মাপকাঠি হিসেবে ধরেছিলেন। তাঁর মতে, ভারতীয় সমাজের চাবিকাঠিই হল ধর্ম।[১০] শুধু তাই নয় বৃটিশ শাসনের স্বার্থে এগুলিকে অক্ষুন্ন রাখা উচিত।[১১] এক প্রবন্ধে (১৮৭২) এই তত্ত্ব আরেকটু বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করে লিখেছিলেন, ভারতের চব্বিশ কোটি লোক রক্ত, বর্ণ ও ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত। সুতরাং এই বিভক্তি যা বৃটিশ শাসনের স্তম্ভ তা অটুট রাখাই শ্রেয়।[১২]

তাঁর এবং আরো অনেকের এই তাত্ত্বিক আলোচনার প্রতিফলন দেখি আমরা ভারতের বা বাংলার আদমশুমারী বা সেন্সাসের ক্ষেত্রে। প্রথম থেকেই কর্তৃপক্ষ আদমশুমারী নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। কারণ কর্তৃপক্ষ জনমানসে এ ধারণার সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন যে বর্ণগত ক্রম সামাজিক মর্যাদার চিহ্ন জ্ঞাপক। ঐ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১১ সালের আদমশুমারীর সময় যে পরিমাণ দরখাস্ত পড়েছিল তার ওজনই ছিল দেড়মনের মত।[১৩]

আমাদের আলোচ্য সময়ে পূর্ববঙ্গের শ্রেণীবিন্যাস বা সমাজ গঠনের উপাত্তের জন্যে বৃটিশ সরকারকৃত ১৮৭২ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত করা চারটি আদমশুমারীই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেখানে পেশাগত উপাত্ত যেভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে তা হুবহু অনুসরণ করলে বিপাকে পড়তে হবে, জটিলতা সৃষ্টি হবে বহুতর। প্রতিটি আদমশুমারীতে পেশার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বেশী কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন আদমশুমারীতে পেশা সম্পর্কিত জটিলতা সরল করা যায়নি।

১৮৯১-এর আদমশুমারীতে, বাংলা সরকার মন্তব্য করেছিলেন এ বলে যে, গত দু'টি আদমশুমারীর ফলাফল মোটামুটি এক অর্থাৎ পেশা নিরুপণের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু তাই নয় আদমশুমারীতে এ সম্পর্কে যে বিস্তৃত উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে

তার তেমন মূল্য আছে বলে মনে হয় না। ঐ একই রিপোর্টে ১৮৮১ সালের আদমশুমারী সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল এ বলে যে, হিন্দুদের সম্পর্কে গৃহীত তথ্যাবলী প্রায় ক্ষেত্রেই বিশ্বাসযোগ্য নয় কারণ তাদের বর্ণগত সমস্যা।[১৪]

মহিলাদের পেশা নিয়েও বিপাকে পড়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। যেমন গৃহিনী কি একটি পেশা? বা গ্রামের যে মহিলা শাকসব্জী মাছ বিক্রি করছেন তাঁর পেশা কি হবে মাছ বিক্রেতা না অন্যকিছু? কারণ অন্যদিকে ঐ মহিলা যদি বিবাহিতা হন তাহলে আবার তার স্বামীর ওপর তিনি নির্ভরশীল।

দ্বৈত পেশাও সৃষ্টি করেছিল জটিলতার। যেমন 'বাণিজ্যিক ব্যবসায়ী শ্রেণীতে' নৌকোর মাঝিকে ধরা হয়েছিল। কিন্তু এদের অনেকেরতো কৃষিজমিও ছিল, যেখানে তিনি হয়ত চাষও করতেন। কারণ ঐ সময়, এ ধরণের প্রতিটি পেশার লোকই কোন না কোনভাবে জমির ওপর নির্ভরশীল ছিলেন।[১৫]

১৯০১-এর আদমশুমারীতে সব পেশাকে আটটি প্রধান শ্রেণীতে, সেগুলিকে আবার চব্বিশভাগে, সে চব্বিশভাগকে আবার উনআশীটি উপবিভাগ এবং উনআশীটি উপবিভাগকে পাঁচশোকুড়িটি অনুবিভাগে ভাগ করা হয়েছিল। এখানেও কর্তৃপক্ষ নির্মাতা ও বিক্রেতার মধ্যে পার্থক্যটি স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছিলেন।[১৬] কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—যিনি মাছ বিক্রি করতেন, অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিজেইতো আবার মাছ ধরতেন।

এতোসব জটিলতা সত্ত্বেও আলোচ্য সময়ের প্রতিটি আদমশুমারীতে একই ধারা অনুসরণ করা হয়েছিল। ঔপনিবেশিক সরকার ধর্ম এবং বর্ণের দিক থেকে সমাজকে বিচার করেছিল নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে। নয়ত শ্রেণীগত বিশ্লেষণ ছিল অনেক সহজ ও নিরাপদ।

আমার উপরোক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য এ কথা বলা নয় যে—এ ধরনের কোন উৎসই প্রয়োজনীয় নয়। সামগ্রিকভাবে না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমার বলার উদ্দেশ্য, ঔপনিবেশিক সরকারের নথিপত্র ব্যবহার কালে আমাদের খানিকটা সতর্ক হতে হবে, মনে রাখতে হবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। শুধু তাই নয়, আমি বাংলাদেশের যে সমাজ গঠন নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি সে আলোচনায় এ ধরনের উৎস যথেষ্ট নয় বা ঐভাবে ব্যবহারের বিপদ অনেক।

খ. বাংলাদেশের ঐতিহাসিকদের রচিত সামাজিক ইতিহাস

এ পর্যায়ে আমি বাংলাদেশের চার জন গবেষকের চারটি গ্রন্থ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। লেখক চারজন ও বই চারটি হল—

Azizur Rahman Mallick : *British Policy and the Muslims in Bengal, 1757-1856,* Dacca, 1961.

A. F. Salahuddin Ahmed : *Social Ideas and Social Change in Bengal, 1818-1835,* Leiden 1965 ; 2nd ed. Calcutta, 1976.

আনিসুজ্জামান ঃ মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৪।

Sufia Ahmed : *Muslim Community in Bengal, 1884-1912,* Dacca, 1974.

উপরোক্ত চারজন গবেষকই কমবেশী একই উপাদান ব্যবহার করেছেন। আনিসুজ্জামানের বইটি মূলত সাহিত্য বিষয়ক হওয়ায় তাতে উপাদানের কিছু বৈচিত্র্য আছে বা সাহিত্যি বিষয়ক গ্রন্থই উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বেশী। কিন্তু উল্লিখিত চারটি বইয়েরই সমাজ সম্পর্কিত বক্তব্য মনে হবে অনেকাংশে অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট। কারণ সামগ্রিকভাবে তাঁরা কেউ সমাজকে বিচার করেন নি।

চারজন গবেষকেরই দৃষ্টিভঙ্গী খণ্ডিত—সামগ্রিক নয়। এ কথা তাঁদের বইয়ের শিরোনামই প্রমাণ করবে। সালাহউদ্দিন আহমদ ছাড়া বাকী তিনজন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, বাংলায় বসবাসরত মুসলমানদের কথাই তাঁরা বলেছেন বা বলতে চেয়েছেন। অধ্যাপক আহমদ অবশ্য তেমন কিছু উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তাঁর বইয়ে প্রধানত আলোচিত হয়েছে শুধু বাংলায় বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায়ের কথা। উপরোক্ত গবেষকরা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার মানুষকে বিচার না করে ধর্মীয় পার্থক্য বা সম্প্রদায়ের উপর গুরুত্বআরোপ করেছেন বেশী। তাই তাঁদের ইতিহাস, সমাজে বসবাসরত একটি সম্প্রদায়ের ইতিহাস যা সামাজিক ইতিহাসের একটি অংশমাত্র। বা অন্য কথায়, তাঁদের ইতিহাস খণ্ডিত সমাজের ইতিহাস।

আজিজুর রহমান মল্লিকের গ্রন্থটি দু'টি পর্ব ও দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্বে, মুসলমানদের সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ভারতের পটভূমিকায় দু'টি সংস্কার আন্দোলন—ফরায়েজী ও তারিকায়ে

মুহম্মদীয়া আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে, আলোচনা করা হয়েছে মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে।

মুসলমানদের সামাজিক ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, বহুদিন ধরে অমুসলমানদের সঙ্গে বসবাস এবং ইসলামের বাসভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে মুসলমানরা তাদের মৌল বিশ্বাস থেকে বিচ্যুৎ হয়ে 'ভারতীয়'তে পরিণত হয়েছিল। যেমন, মুসলমানদের মধ্যে উদ্ভব হয়েছিল বর্ণ প্রথার যা আবার আঘাত হেনেছিল ইসলামের মূল ভিত্তিতে। মুসলমানদের অধিকাংশ ছিলেন কৃষক, অভিজাত মুসলমানরা ছিলেন ক্ষমতাচ্যুত, মধ্য শ্রেণীর হয়নি বিকাশ। সবমিলিয়ে ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৬ সাল অব্দি মুসলমান সমাজ ছিল রিক্ত, দুর্বল, অসহায়। পরিস্থিতি ছিল তাদের জন্যে হতাশাব্যঞ্জক।

মুসলমানদের শিক্ষার ওপর মল্লিক বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ তাঁর মতে, শিক্ষা হচ্ছে মাপকাঠি যার সাহায্যে একটি সম্প্রদায়ের উন্নতি—অবনতি বোঝা যায়। বিদেশী শাসনে উন্নতির শিখরে পৌঁছার জন্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করাই ছিল মূল কথা।

মল্লিক যে সব উপাদান বা উৎসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বা ব্যবহার করেছেন তাঁর অধিকাংশই ঔপনিবেশিক সরকারের। ফলে, ঔপনিবেশিক সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী যে তাঁকে প্রভাবান্বিত করেনি, এমন কথা বলা যায় না। তিনি যখন বলেন, মুসলমানদের ধর্ম বিকৃত হয়ে উঠেছিল তখন হয়ত তা' ঠিক। কিন্তু দুটি ধর্মের মূল পার্থক্য সব সময় থেকে যেতে বাধ্য—কারণ মুসলমানেরা এক সৃষ্টিকর্তায় এবং হিন্দুরা বহুতর দেব দেবতায় বিশ্বাসী। আচার অনুষ্ঠানগুলি হয়ত মিলে মিশে গিয়েছিল। অর্থাৎ একই বিষয়টিকে অনেকে আবার সমন্বয় বা লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাব হিসেবেও ধরতে পারেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, বাংলার মুসলমানরা 'ভারতীয়' হয়ে গেল—কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, বাংলার মুসলমানেরা কি ভারতের বাইরের বাসিন্দা ছিল?

ঔপনিবেশিক সরকারের ঐতিহাসিকরা যেমন হান্টার মুসলমানদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার যে কারণ ব্যক্ত করেছিলেন, তাঁর মতামতও অনেকটা তাই। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—একই সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দু রায়তরা কি খুব ধনী ছিল?

ঔপনিবেশিক সরকারের উৎসের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার ফলে ফারায়েজী বা তরিকিয়া মুহম্মদীয়া আন্দোলনগুলি সম্পর্কেও তাঁর মতামত কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, একজায়গায় তিনি বলেছেন, শরিয়তুল্লাহ তেমন কোন বড় ব্যক্তিত্ব নন, যদি হতেন, তা'হলে সমসাময়িক মুসলমান বা ইংরেজদের লেখায় তাঁর উল্লেখ থাকতো (পৃ ঃ৮১)। কিন্তু শরীয়তুল্লাহ যাদের শ্রেণীশত্রু তারা কেন শরীয়তুল্লাহকে 'ব্যক্তিত্ব' হিসেবে উল্লেখ করবে? আন্দোলনগুলি সম্পর্কে উপসংহারে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, রায়তরা ছিল গরীব এবং অশিক্ষিত তাই ধর্মীয় বোধ সেখানে প্রভাব বিস্তার করেছিল। হয়ত এ কথা ঠিক। কিন্তু তিনি যখন বলেন, তাঁদের এ আন্দোলনগুলি ছিল আইন বিরোধী প্রচেষ্টা তখন স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, নির্যাতন নিপীড়ন বা সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত যে সব আন্দোলন হয়েছিল সে সবতো বিদ্যমান আইনের বিরোধী হবেই। কারণ, আইনও, নিপীড়ণ অব্যাহত রাখার মাধ্যম।[১৭]

গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব—যেখানে তিনি মুসলমানদের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা বিস্তৃত, তথ্য সমৃদ্ধ, সুবিন্যস্ত। কিন্তু অধিকাংশ সূত্রের উৎস হচ্ছে ঔপনিবেশিক সরকার, সুতরাং এ বিষয়ে ঔপনিবেশিক সরকারের মতামতই প্রতিফলিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, সম্প্রদায়গত উন্নতির প্রধান মাপকাঠি হিসেবে তিনি ধরেছেন শিক্ষাকে, কিন্তু শিক্ষা একটি বৈশিষ্ট্য হতে পারে মাত্র, মূলকথা হচ্ছে অর্থনীতি।

আজিজুর রহমান মল্লিকের বইয়ের প্রধান গুণ, তথ্য সমাবেশ। প্রচুর পরিমাণ পান্ডুলিপি, দলিল ইত্যাদি ঘেটে, সুশৃংখলভাবে তিনিই খুব সম্ভব প্রথম একটি সম্প্রদায় হিসেবে আঠারো উনিশ শতকের বাংলার মুসলমানদের চিত্র তুলে ধরেছেন।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন হয়েছিল তার কয়েকটি দিক আলোচনা করা হয়েছে সালাহউদ্দিন আহমদের গ্রন্থে। ১৮১৮ থেকে ১৮৩৫ সালের মধ্যে প্রাধান্যবিস্তারকারী আদর্শ, তা গড়ে ওঠার কারণ, এবং সরকারী নীতিতে এর প্রতিক্রিয়া—এক কথায়, যেমন, সংস্কার আন্দোলনসমূহের সূত্রপাত, শিক্ষার বিস্তার এবং সবশেষে ভারত বিভাগ—এসব কিছুর মূল খোঁজার চেষ্টা করেছেন

সালাহউদ্দিন আহমদ এ গ্রন্থে।

বইটি বিভক্ত ছ'টি অধ্যায়ে। প্রথম অধ্যায়ে, তিনি আলোচনা করেছেন, বাঙ্গালী সমাজে পাশ্চাত্যের অভিঘাত নিয়ে। তিনি লিখেছেন, ইংরেজ ও ভারতীয়দের পক্ষে বিপরীত মেরুতে বসবাস করা সম্ভব হয়নি। পারস্পরিক আদান প্রদান দু'পক্ষকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল, ফলে সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ফলাফল হয়েছিল সুদূর প্রসারী। তিনি আরো লিখেছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলায় এনে দিয়েছিল এক ধরনের সামাজিক স্থিতিশীলতা। ইংরেজদের সহযোগী বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা এ সময় প্রসার লাভ করেছিল, আভিজাত্যের মাপকাঠি আর জন্মগত ছিল না, বিত্তও হয়ে উঠেছিল এক প্রধান মাপকাঠি। বাঙ্গালীদের নৈতিক অবস্থা ঐ সময় খুবই খারাপ ছিল। পাশ্চাত্যের অভিঘাত চিড় ধরিয়েছিল ঐতিহ্যবাহী সমাজে। নতুন ভূস্বামী শ্রেণী, নতুন ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রসার এবং নতুন শিক্ষার আন্দোলন---এসব কিছু, নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপরেখা তৈরী করেছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি দেখিয়েছেন, বাঙ্গালী সমাজ আস্তে আস্তে প্রভাবিত হচ্ছিল পাশ্চাত্যের দ্বারা এবং তা বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে সৃষ্টি করেছিল তিন ধরনের প্রতিক্রিয়ার—রক্ষণশীল, যারা বিশ্বাসী ছিলেন স্হিতাবস্হায় এবং এ দলের নেতা ছিলেন রাধাকান্ত দেব, সংস্কারপন্থী বা মধ্যপন্থী যার নেতা ছিলেন রামমোহন এবং চরমপন্থী বা ইয়ং বেঙ্গল। অন্তিমে রক্ষণশীলরাই হয়ে উঠেছিলেন প্রভাবশালী।

বাকী চারটি অধ্যায়ে তিনি ঐ সময়ের ইংরেজী ও দেশীয়ভাষার সাময়িকপত্রের বিকাশ ও প্রভাব এবং সরকারী নীতি নিয়ন্ত্রণে তাদের ভূমিকা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ১৮১৮ সালের পর পত্র-পত্রিকায় ভারতীয় জনগণ বিশেষ করে মধ্যশ্রেণীর মতামত বা চিন্তা প্রতিফলিত হতে থাকে। তবে যেখানে ভারতীয় কর্তৃত্বাধীন ইংরেজী পত্রিকাগুলি ছিল উদারনৈতিক সেক্ষেত্রে দেশীয় ভাষার পত্রিকাগুলি ছিল রক্ষণশীল। এবং এটিই ঐ সময়ের ঝোঁক প্রকাশ করে ও হিন্দু সম্প্রদায়ের ঝোঁক মূলতঃ রক্ষণশীল থেকে যায়।

সালাহউদ্দিন আহমদ উপসংহারে বলতে চেয়েছেন, জনমতে যে ভাবনাচিন্তা প্রতিফলিত হয়েছিল পরবর্তীকালে তাই উপমহাদেশের ইতিহাস রচনায় সহায়তা করেছে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়েই এগুলি

বিকশিত হয়েছিল এবং অর্জন করেছিল অদ্ভুত কিছু বৈশিষ্ট্য। বলতে গেলে, এসব আদর্শ পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে শুধু নয়, পাশ্চাত্যের চিন্তা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধেও এক ধরনের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধের সৃষ্টি করেছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদ, হিন্দু পুনর্জাগরণ এবং ধর্ম নিরপেক্ষ চরমপন্থী—এসব কিছু মিলেই নির্মিত হয়েছিল উপমহাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ছিল যেগুলি ভ্রূনাবস্থায়।

আগেই বলেছি, সালাহউদ্দিন আহমদের সমসাময়িক যাঁরা সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে লিখেছেন, তাঁরা প্রায় সবাই খণ্ডিতভাবে সমাজকে বিচার করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের ইতিহাস হয়ে গেছে সম্প্রদায় বিশেষের ইতিহাস। কিন্তু তাঁর গ্রন্থের শিরোনাম দেখে ধরে নেওয়া যায় সামগ্রিকভাবে তিনি সমাজকে বিচার করতে চেয়েছেন। কিন্তু বইটি পড়লে মনে হয় না, ১৮১৮-৩১ সালের মধ্যে বাংলায় বা কলকতায় মুসলমান বলে কোন সম্প্রদায় ছিল। তিনি যে সমাজের কথা লিখেছেন তা হিন্দু মধ্যশ্রেণীর। বলা যেতে পারে, তাঁর বই, হিন্দু মধ্যশ্রেণীর ভাবনার জগতের ইতিহাস।

তিনি ইংরেজ শাসন, ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক এগুলি উল্লেখ করেছেন কিন্তু কখনও ঔপনিবেশিক শাসন কথাটি উল্লেখ করেননি। তিনি যদি ঔপনিবেশিক শাসনের আলোকে সমাজ বিশ্লেষণ করতেন তা'হলে সমাজ গঠন, কাঠামো, শ্রেণীরূপ ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠতো, সমাজ পরিবর্তনের রূপরেখাটি হত আরো স্পষ্ট। তিনি উল্লেখ করেছেন, ভারতীয় ও ইংরেজ—দু'পক্ষই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কোন শ্রেণীর ভারতীয় বা বাঙ্গালী? কারণ, ইংরেজদের সহযোগী ছিল প্রায় ক্ষেত্রেই উচ্চ বা মধ্যশ্রেণী, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল প্রভু-ভৃত্যের। তিনি লিখেছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রায়তদের স্বার্থের হানি করেছিল বটে কিন্তু তা এক ধরনের সামাজিক স্থিতিশীলতা এনে দিয়েছিল। কিন্তু কি ধরনের স্থিতিশীলতার? তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, 'assured of the benefits of security' (পৃঃ ৭) জমিদাররা ক্রমেই ধনমানে বিকশিত হয়ে উঠলো। পাদটীকায় তিনি উল্লেখ করেছেন, 'security' বলতে তিনি বোঝাচ্ছেন, রায়তদের ওপর জমিদারের সর্বময় ক্ষমতা বা আধিপত্য বিস্তারের অধিকার।

এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তিতুমীর বা ফারায়েজী আন্দোলনকে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বলে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ করেছেন তাঁদের সংগ্রামকে 'plundering raids' হিসেবে। কিন্তু ঘটনা কি এর বিপরীত নয়? (দ্রষ্টব্য: তৃতীয় অধ্যায়)

আনিসুজ্জামান বৃটিশ শাসনের পটভূমিকায় মুসলিম মানস ও সাহিত্যের কথা তুলে ধরেছেন। দু'টি পর্বে তাঁর বই বিভক্ত—দেশকাল ও সাহিত্য। তিনি দেশকালের পটভূমিকায় মধ্যশ্রেণীর চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করেছেন।

তাঁর মতে, ইংরেজশাসনজাত মৌলিক পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—গ্রামীণ সমাজের ভাঙ্গন। অর্থনৈতিক জীবনের মূল চাবিকাঠি, জমি থেকে মুদ্রায় রূপান্তরের ফলে নতুন শ্রেণীবিন্যাসের জন্ম হল এবং ঐ ক্রান্তিকালে মুসলমানরা যে নিজেদের পুনর্গঠিত করতে পারেনি তার কারণ তাদের নগদ অর্থের অভাব। তিনি হান্টারের বিখ্যাত মত—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান জমিদারদের ক্ষতি হয়েছিল এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের অনীহা ছিল—তা খণ্ডন করেছেন। সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, ভাবনার জগতে তা ছায়াপাত করেছিল, 'কতক স্বেচ্ছায়, কতক অনিচ্ছায়, কখনো বা পরিবেশের প্রভাবে।'[১৮] এবং বাঙ্গালী মুসলমান লেখকদের যে অনেক সময় গোঁড়া বা ধর্মান্ধ বলে মনে করা হয় তা'ঠিক নয় কারণ ধীরে ধীরে তারা এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন এবং প্রতিবাদও করেছিলেন। মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারেও তিনি নতুন দু'টি তথ্য উপস্থাপন করেছেন—পাটচাষের ফলে মুসলমানদের স্বচ্ছল অবস্থা ও মুসলমান শিক্ষার্থীদের কলকাতায় খানসামাদের আশ্রয় ও সাহায্য প্রধান।

আনিসুজ্জামান অর্থনীতি পরিবর্তনের কারণ হিসেবে শিল্প ও কৃষির ক্ষয়ের কথা বলেছেন। জানিয়েছেন, মুসলমান রায়তরা ছিলেন গরীব। কিন্তু হিন্দু রায়তরা কি ধনী ছিলেন? শ্রেণী বিন্যাসটিই বা ছিল কেমন? তিনি যে ইংরেজ শোষণ ও সাম্প্রদায়িকতার কথা বলেছেন, তাকি ঔপনিবেশিক শাসন সঞ্জাত? পাটচাষে কি শুধু মুসলমান রায়তরাই লাভবান হয়েছিলেন? প্রশ্ন উঠতে পারে, তিনিতো শুধু মুসলমানদের কথাই বলতে চেয়েছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য, সম্প্রদায়গতভাবে

বিচারের কারণেই এ জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।

সুফিয়া আহমদ তাঁর গ্রন্থে প্রচুর তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু সবকিছুই অগোছালো, তথ্যের ভুলও প্রচুর।[১৯] এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁর বক্তব্যের খেই হারিয়ে গেছে। জমিদার কৃষক সম্পর্কে তাঁর সরল বক্তব্য হল—জমিদার হিন্দু আর প্রজা ছিলেন মুসলমান, তাই সংঘাত ছিল অনিবার্য। জমিদার ছিলেন অনুপস্থিত তাই অত্যাচারটা বেশী করেছেন নায়েব যিনি প্রায় ক্ষেত্রেই ছিলেন হিন্দু। সুফিয়া আহমদ তাঁর ইতিহাস নির্মাণের জন্যে প্রধানত নির্ভর করেছেন সরকারী নথিপত্রের ওপর। (দ্রষ্টব্যঃ সুফিয়া আহমদের গ্রন্থের তথ্যপঞ্জী) তাই ঔপনিবেশিক সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত করেছে তাঁকে।

সুফিয়া আহমদ আলোচনা করেছেন, মুসলমান রায়তদের কথা কিন্তু তাঁর উপাত্তের ভিত্তি সকল সম্প্রদায়। মুসলমান রায়তদের ওপর হিন্দু নায়েবদের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু মুসলমান জমিদারেরও তো হিন্দু নায়েব ছিল এবং যখন সেই নায়েব মুসলমান রায়তদের ওপর অত্যাচার করতেন তখন মুসলমান জমিদার কি নিশ্চুপ থাকতেন? থাকলে, কেন? বা অত্যাচার যদি সাম্প্রদায়িক কারণেই হয়ে থাকে তা'হলে পাবনার (সিরাজগঞ্জ) কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব ঈশানরায় (১৮৭২) দিয়েছিলেন কেন? (এখানে উল্লেখ্য, সিরাজগঞ্জের ঐ সময়ের জমিদার পরিবারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—কলকাতার ঠাকুর পরিবার, সলপের স্যান্যাল পরিবার, পোরজনার ভাদুড়ী পরিবার এবং স্থলের পাকরাশী পরিবার)।[২০] কিন্তু তিনি কিভাবে আবার উল্লেখ করেছেন যে, বঙ্গ ভঙ্গের আগে জমিদার ও রায়তদের সম্পর্ক সাম্প্রদায়িক ছিল না?

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, উপরোক্ত লেখকদের আলোচনা একটি নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট সমাজের অবস্থা তেমন স্পষ্ট করে তুলছে না। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁরা সামাজিক ইতিহাস লিখেছেন কিন্তু কেউ আলোচনা করেননি সমাজ গঠন সম্পর্কে। বা উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের কারণেই যে নতুন শ্রেণী বিন্যাসের সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশের সমাজ নিয়ে আলোচনা করার আগে প্রথমেই সমাজ গঠনের বিষয়টি আমাদের আলোচনা করতে হবে এবং সচেতন হতে হবে, তথ্য ও

উপাত্ত ব্যবহারের আগে তথ্য প্রদানকারী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে।

সমাজ গঠনের মূলকথা হচ্ছে সমাজ কাঠামোর অন্তর্নিহিত পরিবর্তন। সিভিলিয়ান বা বাংলাদেশের ঐতিহাসিকদের কেউই সমাজ গঠনের দিক থেকে সমাজকে দেখার চেষ্টা করেন নি। এ কথা মনে রেখেই আমি আলোচনা করবো।

২. সমাজ গঠন কি?

সমাজ গঠন শব্দটি বর্ণনামূলক, তাত্ত্বিক কোন সংজ্ঞা নয়। সমাজ গঠন বলতে আমরা নির্দিষ্ট একটি সমাজের কথা বুঝি যার অবস্থান কোন রাষ্ট্র বা ভৌগোলিক সীমায় এবং নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পটভূমিতে। 'সমাজ' ও 'সমাজ গঠন' শব্দ দুটি অনেক সময় একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয় কিন্তু শেষোক্ত শব্দটি নির্দিষ্ট এক অর্থ বহন করে যার মধ্যে অন্তর্গত রাজনৈতিক ও আদর্শগত উপাদান। এখানে উল্লেখ্য যে, নির্দিষ্ট একটি সমাজ গঠনের চরিত্র নির্ধারণ করে ঐ সময়ের প্রধান উৎপাদন পদ্ধতি। যেমন মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে সামন্তবাদী সমাজ গঠন বা পেরুর ইনকাদের এশিয়াটিক সমাজ গঠন।[২১]

যে কোন সমাজের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাবো যে, একটি সমাজে, কোন-এক সময়ে, এক ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি প্রধান হয়ে ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও দেখা যায় যে, আরেক ধরনের ব্যবস্থাও ঐ কাঠামোর মধ্যে জন্মলাভ করছে। নতুন ব্যবস্থাটি যখন আরো বিকশিত হয়ে ওঠে তখন তার প্রয়োজনের কারণে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক স্তরে সংঘাত শুরু হয়।

পূর্ববঙ্গে কোম্পানী বা ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাতের পর, এখানে এ ধরনের সংঘাত ও পুঁজিবাদী সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যদিও তা ছিল ভ্রূনাবস্থায়।[২২]

৩. ঔপনিবেশিক কাঠামোয় সমাজ গঠন

বাংলাদেশে বা উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন কি পরিবর্তন এনেছিল তা তখনই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যখন উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র আমরা নির্ধারণ করতে পারবো। আমার আলোচ্য সময়ে পূর্ববঙ্গে কি ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি ছিল তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে

এবং হচ্ছে। কিন্তু সে বিতর্কে যাওয়ার আগে আমাদের নির্ধারণ করতে হবে সামন্তবাদী এবং ধনবাদী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কি ?

ক. ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি

মার্কসের 'ক্যাপিটাল' বিশ্লেষণ করে হামজা আলাভী ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির পাঁচটি মূল বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন—[২৩]

১. স্বাধীন শ্রম যা সামন্তদায় থেকে মুক্ত। মরিস ডবের ভাষায়, একটি ব্যবস্থা যার অধীনে শ্রমশক্তি নিজেই পরিণত হয় পণ্যে এবং অন্যান্য পণ্যের মতই বাজারে বেচাকেনা হয়। স্বাধীন শ্রমকে আরেকভাবে দেখা যেতে পারে, তা হল, যখন উৎপাদক উৎপাদনের উপাদান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

২. উদ্ধৃত্ত আত্মসাৎকরণে অর্থনৈতিক জবরদস্তি—অর্থাৎ মজুর যখন তার উৎপাদনের উপাদানের (যেমন জমি, যন্ত্রপাতি) থেকে উৎখাত হয় তখন তার থাকে শুধুমাত্র শ্রমশক্তি। সে তখন প্রত্যক্ষ উৎপাদক এবং স্বাধীনও বটে। কিন্তু তাঁকে বেঁচে থাকতে হয় তাঁর শ্রমশক্তি বিক্রি করে, নচেৎ বেছে নিতে হয় উপবাসে মৃত্যুর পথ।

৩. ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক (শ্রেণী) ক্ষমতা থেকে রাজনৈতিক (রাষ্ট্র) ক্ষমতার হয় বিচ্ছিন্নকরণ। সৃষ্টি হয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রের এবং প্রচলিত হয় বুর্জোয়া আইন বিশেষ করে ভূমি সম্পর্কে।[২৪] ধনবাদী উৎপাদন পদ্ধতির প্রধান চরিত্র : অবাধ বাণিজ্যের মত বুর্জোয়া আদর্শ।

৪. সাধারণকৃত পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা - যে ক্ষেত্রে উৎপাদন হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে পণ্য উৎপাদন অর্থাৎ কিনা বাজারে বিক্রির মাধ্যমে মূল্যের উসুল এবং যে ক্ষেত্রে শ্রমশক্তি হচ্ছে পণ্য বিশেষ। অর্থাৎ বাজারে জন্যেই প্রাথমিকভাবে পণ্য উৎপাদন করা হয় এবং শ্রমশক্তি যেহেতু একটি দ্রব্য সেহেতু অবাধ বাজারে তার বিনিময় হয়।

৫. মূলধনের বিস্তৃত পুনরুৎপাদন-উদ্ধৃত্ত এক্ষেত্রে প্রধানত ব্যবহৃত হয় পুঁজি সঞ্চয় এবং উৎপাদনের শক্তি নিচয় ও কৃৎকৌশলের অগ্রগতি বিস্তৃতির জন্যে।

খ. সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতি

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য নিরূপণের পর এবার সামন্ত

উৎপাদন পদ্ধতির শর্তাদি নির্ধারণ করবো। এর পাঁচটি শর্ত হচ্ছে—

১. এ পদ্ধতিতে শ্রম অস্বাধীন। জমি ভূস্বামী/প্রভুর। ভূম্যধিকারী ও কৃষকের কার্যাবলীর সমন্বয় ঘটে। প্রত্যক্ষ উৎপাদকই মালিক উৎপাদন উপাদানের যেমন, জমি ইত্যাদির। ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূত্রে কৃষক বাঁধা ভূম্যধিকারীর সঙ্গে।

২. উদ্বৃত্ত আত্মসাৎকরণের জন্যে প্রত্যক্ষ উৎপাদকের ওপর অর্থনীতি অতিরিক্ত জবরদস্তি। কৃষকদের ভূমি রাজস্ব দিতে হয় প্রভুকে বেগার খেটে। কখনও বা পণ্যে, কখনও বা অন্যকোনরূপে—এর বিনিময়ে প্রভুর কাজ থেকে সে অধিকার পায় জমি ব্যবহারের।

৩. উৎপাদন এবং স্থানিক ক্ষমতার কাঠামোতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি সমন্বয়।

৪. গ্রামের স্বনির্ভর অর্থনীতি—এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ উৎপাদকের জন্য পণ্য উৎপাদন গৌণ এবং এই উৎপাদনের শর্ত হচ্ছে, উৎপাদক একটি উদ্বৃত্ত তৈরী করে যা কিনা আত্মসাৎ করবে শোষকশ্রেণী এবং যে উদ্বৃত্তের একটি বড় অংশ পণ্য হিসেবে সার্কুলেশনে প্রবেশ করবে। এবং

৫. সরল পুনরুৎপাদন—এক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত সঞ্চয় করার বদলে প্রধানত ভোগ করছে শোষক শ্রেণী এবং সমাজ কেবলমাত্র বিদ্যমান উৎপাদনমূলক সম্পদ ও কৃৎকৌশলের স্তরে পুনরুৎপাদিত হচ্ছে।

গ. ঔপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতি

প্রাক-ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় (একেবারে আদিম উৎপাদন পদ্ধতি ছাড়া) সমাজ বিভক্ত ছিল দু'টি শ্রেণীতে—উৎপাদক ও অ উৎপাদক। সামন্ত ব্যবস্থায় কৃষক উৎপাদন করতো সামন্ত প্রভুর জন্যে। আর ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষক রূপান্তরিত হয়ে যায় গ্রামীণ এবং শহুরে প্রলেতারিয়েত হিসেবে।

পশ্চিম ইউরোপের সমাজ গঠনে এ রূপান্তরটি হয়েছিল ফলে ঐ সমাজ গঠনে কৃষি বিষয়ক প্রশ্নটির সমাধান সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পশ্চিম ইউরোপে যা সম্ভব, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কি তা সম্ভব? কারণ, প্রান্তিক সমাজ গঠনে ধনতন্ত্র ঠিক ঐ ভাবে কাজ করে না। বর্গাচাষ, এর একটি উদাহরণ।

অধিকাংশ গবেষক, (যেমন ওয়ালেরস্টাইন) এ পর্যায়টিকে সামগ্রিক

এবং ক্রান্তিকালীন লগ্ন বলে মনে করেন—যেখানে কৃষি ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের বিকাশ হচ্ছে। কিন্তু সম্প্রতি মার্কসবাদী আরেকদল গবেষক (যেমন, আলাভী, বানাজী) এ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতে, বর্তমান তৃতীয় বিশ্বের সমাজ গঠনে একটি ঐতিহাসিক কিন্তু নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতি কাজ করেছে যা মার্কসের জীবদ্দশায় অজানা ছিল। এ পদ্ধতির নাম দিয়েছেন তাঁরা—ঔপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতি। ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি যার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি তার অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এর মিল আছে, কিন্তু পার্থক্য আছে দু'টি ক্ষেত্রে এবং এই পার্থক্যই ঔপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। অনেকের মধ্যে হামজা আলাভীও এ দলের একজন প্রধান প্রবক্তা। আলাভী এই উৎপাদন পদ্ধতির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেছেন, এগুলি একই সঙ্গে বিচার করতে হবে, আলাদাভাবে নয়—[২৫]

১. ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির মতই স্বাধীন শ্রম
২. ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির মতই উৎখাত হয়ে যাওয়া উৎপাদকের ওপর অর্থনৈতিক জবরদস্তি
৩. ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির মতই অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তির বিচ্ছিন্নকরণ, কিন্তু
৪. সরল পণ্য উৎপাদন ও বিস্তৃত পুনরুৎপাদনের—এ দু'টি ক্ষেত্রে তা'নির্দিষ্ট ঔপনিবেশিক চরিত্র লাভ করে।

ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে, ঔপনিবেশিক সরকার, ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণে সচেষ্ট থেকে রূপান্তরে সহায়তা করে। যেমন এ জন্যে তারা নতুন আইন-কানুন বিশেষ করে ভূমির ক্ষেত্রে তৈরী করে যার ফলে জমি অবাধ প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে পণ্যে রূপান্তরিত হয়। বুর্জোয়া আইন প্রণয়ন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, অবাধ বাণিজ্য, এসব আদর্শ উৎসাহিত করে তাদের ঔপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতি বিকাশে। এসব দেশে ধনতান্ত্রিক বিকাশ হয় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে—কেন্দ্রীয় সমাজ গঠনে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশে পরিপূরক হিসেবে।

ঔপনিবেশিক উদ্বৃত্ত চালান হয়ে যায় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে বা মেট্রোপলিটনে যেখানে তা পুঁজির পুঞ্জিতকরণে এবং বিনিয়োগে সহায়তা করে। উপনিবেশে কিন্তু সেক্ষেত্র ঐ হারে বিনিয়োগ করা হয় না এবং তা প্রতিফলিত হয় বেতনের নীচু হারে। সে জন্যে কেন্দ্র উপনিবেশে

এমন সব শিল্প গড়ে তোলে যেখানে মজুরের প্রয়োজন বেশী। কিন্তু যেহেতু মজুরী কম সেহেতু মুনাফার পরিমাণও হয় প্রচুর।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র দরিদ্র কৃষকরা কৃষি ছাড়াও জীবিকার জন্যে অতিরিক্ত কাজ খোঁজেন। ধনী কৃষকরা করেন পণ্য উৎপাদন এবং উপনিবেশে তৈরী হয় উদ্বৃত্ত আর ক্ষুদ্র কৃষকরা সেক্ষেত্রে কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে শস্তাশ্রম যোগান দেয়। ঔপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতির এই একটি দিক হচ্ছে সস্তা শ্রম পুণরুৎপাদন যা সামন্ত বা উন্নত ধনতান্ত্রিক নয়। তা ছাড়া কৃষি এবং শিল্পের উদ্বৃত্তের সিংহভাগ আত্মসাৎ করে মেট্রোপলিটান। ফলে ধনতন্ত্রের বিস্তৃত পুনরুৎপাদন বিকৃত কারণ ঐ প্রক্রিয়া উপনিবেশকে নয়, সমৃদ্ধ করে মেট্রোপলিটনকে।[২৬]

৪. পূর্ববঙ্গের সমাজ কাঠামো

বাংলায় বৃটিশরা স্থাপন করেছিল প্রথম উপনিবেশ এবং ঐ শাসনের অভিঘাত ও সে অভিঘাত কি ভাবে সমাজ গঠনে পরিবর্তন এনেছিলো সেটি তখনই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যখন আমরা উৎপাদন পদ্ধতির চরিত্র নির্ধারণ করতে পারবো। উপরে উল্লিখিত তাত্ত্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এখন দেখাবার চেষ্টা করবো পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশে (তথা উপমহাদেশে) প্রাক-ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও ঔপনিবেশিক অভিঘাত এবং এর ফলে কি ভাবে পরিবর্তন হয়েছিল।

প্রাক-বৃটিশ যুগে জমি ছিল দখলী স্বত্ব। এই দখল স্থানীয় ভূস্বামীর হুকুমের উপর ছিল নির্ভরশীল কিন্তু এই দখল বুর্জোয়া আইন উৎসারিত সম্পত্তি ছিল না। জমি পরিণত ছিল না পণ্যে যা কিনা ঔপনিবেশিক স্তরবিভক্ত কাঠামোর মধ্যে ছিল।[২৭]

মুক্ত রায়তদের ওপরে ছিল শক্তিশালী অথচ পরগাছা মধ্যস্বত্বের স্তর বিন্যাস। এভাবে তৈরী হয়েছিল ইউরোপীয় সামন্তবাদের বিপরীত। পিরামিড সদৃশ ব্যবস্থায় ভূস্বামীরা জমির মালিক ছিল না। তাদের জমি থেকে উৎপন্নের ওপর একটা অধিকার ছিল। উদ্বৃত্ত আত্মসাৎকরণের পদ্ধতি দ্ব্যর্থহীনভাবে ছিল জবরদস্তি।[২৮]

ঔপনিবেশিক আমলে জমি পরিণত হয়েছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে ফলে কৃষকের আর সেখানে কোন অধিকার ছিল না। কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) ফলে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র জমি থেকে

শতকরা নব্বই ভাগ রাজস্ব আত্মসাৎ করার সুযোগ পেয়েছিল। জমি পরিণত হয়েছিল পণ্যে আর বুর্জোয়া আইনের অধীনে তা বিনিময়ের সুযোগও ছিল। অত্যাচারিত কৃষকের তখন গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে গিয়েছিল। কারণ যে সব জমি জমিদারের অধীনে ছিল না, সেগুলি ছিল সরাসরি সরকারের অধীনে-খাস জমি। আগে, জমি ছিল প্রচুর, জনসংখ্যাও ছিল তুলনামূলকভাবে কম। তাই জমির চেয়েও মূল্যবান ছিল শ্রমশক্তি সে জন্যে জমিদার কৃষককে ধরে রাখতে চাইতেন জমিতে। কারণ কৃষকের সুযোগ ছিল অন্য জমিতে চলে যাওয়ার। কিন্তু এখন আর তার জমিদারের বা খাস জমিতে প্রবেশাধিকার থাকলো না। সুতরাং তার শ্রমশক্তি স্বাধীন হল বটে কিন্তু তা বিক্রি করেই তাকে জীবনযাপন করতে হয়। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হবে, বিশেষ করে বর্গাচাষের ক্ষেত্রে, যে, জমিদার ও কৃষকের সম্পর্ক বোধহয় একই রকম থেকে গেল। কিন্তু আসলে তা নয়, তার অন্তসার গেল বদলে। এ সম্পর্কের ভিত্তি এখন আর প্রত্যক্ষ জবরদস্তি নয় বরং ধনতান্ত্রিক অর্থ-নীতির আইন কানুন।[২৯]

প্রাক-ধনতান্ত্রিক আমলে কৃষি উৎপাদন, কুটির শিল্প এবং ব্যবসায়ের ওপর জমিদার শ্রেণীর ছিল প্রবল ক্ষমতা। উৎপাদনের সিংহভাগ লাভের জন্যে সাম্রাজ্যের সরকার এবং জমিদারদের সঙ্গে অনবরত সংঘাত সত্বেও অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষেত্রে পরস্পর ছিল পরস্পরের সাথী। রাজনৈতিক ভাবেও জমিদার ও মোঘল সরকারের স্বার্থগত সংঘাত ছিল কিন্তু তা সত্বেও একই সঙ্গে শ্রেণী হিসাবে জমিদাররা ছিলেন প্রশাসনিক স্তম্ভ।[৩০]

কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে জমিদার বা খুদে সামন্ত প্রভুরা বিলুপ্ত হয়েছিল বা অন্য কথায় বলা যেতে পারে, সামন্ত ব্যবস্থায় উৎপাদন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার যে সমন্বয় ঘটেছিল তা' বিচ্ছিন্ন হল। কারণ, তখন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা চিহ্নিত হয়েছিল আলাদাভাবে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যা আরো স্পষ্ট করে তুলেছিল। যেমন, জমিদারদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল বিচার ও পুলিশ সংক্রান্ত ক্ষমতা।

এখানে অবশ্য উল্লেখ্য যে, প্রাক-ধনতন্ত্রী আমলে কিছু স্বাধীন স্বত্বাধিকারী কৃষক ছিলেন। এদের অনেকে আবার উৎপাদনের জন্যে

শ্রমিক নিয়োগ করতেন, মজুরি প্রদান করতেন তাদের এবং আত্মসাৎ করতেন তাদের সম্পূর্ণ উৎপাদন। এ ছাড়াও ছিল ভূমিহীন মজুর, যাদের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। এদেরও কাজে লাগানো হত এবং শুধু বেঁচে থাকার মত তাদের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করা হত। এ ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল বিরাট এক গ্রামীণ আধাপ্রলেতারিয়েত শ্রেণীর। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, মধ্যযুগের বাংলা, সামন্ত উৎপাদন পদ্ধতির অন্তর্গত সত্বেও, সেখানে পুঁজিবাদী কৃষির দিকে ঝোঁক ছিল। যেমন, বস্ত্র শিল্পে, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে প্রধান তাঁতী বাড়তি তাঁত ও তাঁতীর বন্দোবস্ত করতেন।[৩১]

উপরোক্ত আলোচনায় আমি প্রাক-ধনতন্ত্র থেকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরনের প্রথম তিনটি শর্ত নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন শেষোক্ত দু'টি শর্ত কি ভাবে ধনতান্ত্রিক হয়েও বিকৃত হল বা পরিণত হল ঔপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতিতে তা আলোচনা করবো।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে, বাংলার কৃষি অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন হয়েছিল কারণ ঔপনিবেশিক সরকার, সামন্তবাদী ব্যবস্থায় স্থানীয় উৎপাদন ও আত্মসাৎকরণের পদ্ধতিটি দিয়েছিল বদলে। বাংলার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির।

এই একই সময় বাংলায় চালু হয়েছিল রেল, বাষ্পীয় পোত—সবকিছুই ঔপনিবেশিক সরকারের উদ্যোগে। বাংলার কৃষকের উৎপাদিত কাঁচামাল, যেমন, পাট, নীল, প্রভৃতি এ সবের মাধ্যমে চালান যেত ইংল্যাণ্ডে। এর পটভূমিকায় ছিল ভারতের শিল্পের ধংস্ব, কারিগরদের নিঃস্ব এবং ভূমিতে ছন্নছাড়ায় পরিণত হওয়া। কারণ, বৃটেনের শিল্পের বিকাশের পূর্বশর্ত ছিল বাংলা বা ভারতের শিল্প-ধংস্ব করা। এ পরিপ্রেক্ষিতে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলার নগরায়ন ছিল পরজীবী এবং ভূমিরাজস্বের ওপরই ছিল প্রধানত এগুলির ভিত্তি। কোম্পানী সেই রাজস্ব আত্মসাৎ করলে শহরের শিল্প ও সমাজ ধ্বসে পড়েছিল।[৩২] যেমন, পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর ঢাকার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। উনিশ শতকের গোড়ার মধ্যেই এ শহর প্রায় ধংস্ব হয়ে গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক চাহিদার কারণে আবার এই নগরের নগরায়ণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল আমার আলোচ্য সময়ে।

অর্থাৎ এক কথায়, বাংলার স্থানীয় শিল্প ধংস্ব হওয়ার ফলে,

এবং বিকল্প রুজি রোজগারের বন্দোবস্ত না থাকায় সবাই ভীড় জমিয়েছিল জমিতে। বাংলার উৎপাদিত কাঁচামাল বৃটিশ শিল্পের উন্নতি করেছিল। এবং সেই পণ্য আবার বাংলায় রপ্তানী করে বাংলাকে পরিণত করা হয়েছিল বৃটিশ পণ্যের বাজারে। এক কথায়, বাংলার অর্থনীতি ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অধস্তনে পরিণত হয়েছিল। তখন আর উৎপাদন পদ্ধতি সামন্ততান্ত্রিক রইল না, বা পরিণত হল না উন্নত ধনতন্ত্রে, বরং পরিণত হল তা ঔপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতিতে। উপনিবেশে সাধারণ পণ্য উৎপাদনের চরিত্র, সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের চরিত্রের সঙ্গে এক রইল না, এর আভ্যন্তরীণ ভাঙ্গনের কারণে। এ হল বিকৃত (disarticulated) সাধারণ পণ্য উৎপাদন ; ঔপনিবেশিক পদ্ধতির বিকৃত সাধারণ পণ্য উৎপাদন।[৩৩]

পূর্ববর্তী সামন্ত পদ্ধতির মত, ঔপনিবেশিক পদ্ধতি আর সরল পুনরুৎপাদন রইল না বরং পরিণত হল তা বিস্তৃত পুনরুৎপাদনে। কিন্তু যেহেতু বাংলা ছিল উপনিবেশ সে জন্যে তা পরিণত হয়েছিল বিকৃত বিস্তৃত পুনরুৎপাদনে। যার ফল হল, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির আভ্যন্তরীণ ভাঙ্গন এবং ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ। এর অর্থ, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মধ্যে আর বিস্তৃত পুনরুৎপাদন সম্ভব হল না বরং সম্ভব হল তা শুধু সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের মাধ্যমে। এই যে উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করা হয়েছিল তা চলে গিয়েছিল কেন্দ্রের পুঁজি পুঞ্জিতকরণে এবং অন্যদিকে উপনিবেশের অর্থনীতি নিঃস্ব হতে লাগলো। ঔপনিবেশিক পদ্ধতি হচ্ছে একটি বিকৃত বিস্তৃত পুনরুৎপাদন।

আগেই উল্লেখ করেছি, উপনিবেশের অর্থনীতির এই নিঃস্ব অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছিল বাংলার সবক্ষেত্রে বেতনের স্বল্পহারে। কারণ কেন্দ্র এখানে বিনিয়োগ করত কম কিন্তু এমন সব শিল্প এখানে গড়ে তুলেছিল যেখানে মজুরের প্রয়োজন বেশী। এবং যেহেতু বাংলায় দরিদ্র কৃষক ও ভূমিহীনের সংখ্যা ছিল বেশী তাই বাধ্য হয়ে তারা শস্তায় শ্রম বিক্রি করতেন, অন্যদিকে মেট্রোপলিটনের মুনাফা বৃদ্ধি পেত আরো।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দু'টি শ্রেণীর কথা পরিস্কার হয়ে উঠছে। একদিকে, অকৃষিজীবী ভূম্যধিকারী, অন্যদিকে কৃষক, বর্গাচাষী বা ক্ষেতমজুর।

তবে পূর্ববঙ্গে (বা বাংলায়) ভূম্যধিকারীরা আরেকটি পরগাছা

শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিলেন। জমিদারী কেনার পর প্রায় ক্ষেত্রেই জমিদার আরেকজনের মাধ্যমে কৃষকের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতেন। জমির খাজনা ছিল নির্দিষ্ট। সুতরাং সেই ব্যক্তি বা মধ্যস্বত্বভোগী খাজনা আদায় করে দেওয়ার পরও কিছু লাভ থাকতো যার ফলে জমিদার শহরে বসবাস শুরু করলেন। শহরে তার ছেলে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত হতে লাগলো এবং সময়ে নতুন পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হল। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষিত সরকারী কর্মচারী।[৩৪] (দ্রষ্টব্যঃ পরবর্তী অনুচ্ছেদ) অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে ঔপনিবেশিক সরকারের শাসন কাজের জন্যে দরকার ছিল বিরাট সংখ্যক সরকারী কর্মচারীর। নীচু পদমর্যাদার এ চাকুরিগুলিতে ভারতীয়দেরই নেওয়া হয়েছিল। এঁদের বেতন ছিল কম কিন্তু এরা ছিলেন প্রভাবশালী এবং শক্তিশালী। এবং ঐ সমাজে ভূম্যধিকারী বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী থেকে এরাই ছিলেন ক্ষমতাবান। এরা এবং অন্যান্য পেশাজীবীরা পরে স্বায়ত্বশাসন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদির জন্যে সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছিলেন। আর এদের চাকরিদানের নিয়ম ও পদ্ধতি ও তার সঙ্গে তাদের শিক্ষাপ্রণালী ও বিষয়সমূহ 'আগুন্তক' মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ নির্ধারণ করেছিল।[৩৫]

গ্রামের জমিদারী ছেড়ে যিনি শহরে চলে গিয়েছিলেন তিনি পরিণত হয়েছিলেন অনুপস্থিত জমিদারে। মধ্যস্বত্ব ভোগীরাও দখলি স্বত্ব লাভ করেছিলেন যা ছিল বংশানুক্রমিক এবং এ ভাবে তিনি লাভ করেছিলেন জমির leasehold মালিকানা। জমিদার হয়ে পড়েছিলেন এক ধরনের খাজনা আদায়কারী যিনি পূজাপার্বনে গ্রামে এসে খাজনা নিয়ে আবার চলে যেতেন। ফলে দেখা গিয়েছিল তার উদ্বৃত্ত ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। রমেশচন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী একশোবছরে এ হার শতকরা নব্বই ভাগ থেকে আটাশ ভাগে নেমে এসেছিল।[৩৬] এ মধ্যস্বত্বভোগী এখন জমির কার্যত মালিক এবং পরিচিত হতে লাগলেন তিনি ইজারাদার, পত্তনিদার বা জোতদার প্রভৃতি নামে। সুতরাং দেখা গিয়েছিল জমিদার ও কৃষকের মাঝখানে সৃষ্টি হয়েছিল কয়েকটি স্তরের যাঁরা জমির কার্যত (defacto) মালিক এবং যারা ক্ষেতমজুরের নিয়োগকর্তা।

এ ভাবে ঔপনিবেশিক কাঠামোয় মোটাদাগে পাচ্ছি আমরা তিনটি শ্রেণী—জমিদার, পেশাজীবী এবং কৃষক। এবং এরা প্রত্যেকেই ছিলেন

প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জমির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এ সঙ্গে আরেকটি শ্রেণীও বিকশিত হচ্ছিল—ব্যবসায়ী। ধর্মীয় সম্প্রদায় ও শ্রেণীর পরস্পর প্রবিষ্টতা এবং ঐ সম্প্রদায় ও শ্রেণীর পরস্পর বিচ্ছিন্নতার সমস্যা সমাজ গঠনে যে প্রতিক্রিয়া, বৈপরীত্য, বিরোধ ও সংঘাত সৃষ্টি করেছিল তার বিশ্লেষণ আমি করেছি 'ভাবনার জগতে আধিপত্যবাদ' শিরোনামের অনুচ্ছেদে। এখন আমি প্রথমে ঔপনিবেশিক কাঠামোর এই শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করবো।

৫. শ্রেণীবিন্যাস ঃ পূর্ববঙ্গে

ক. জমিদার

বাংলাদেশে জমিদারী বন্দোবস্ত নতুন কিছু ছিল না, তা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদার একই সঙ্গে জমির মালিক ও কর সংগ্রাহকে পরিণত হয়েছিলেন। সরকারের সঙ্গে এখন সম্পর্ক জমিদারের যারা রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে সরকারের প্রাপ্য খাজনা কোষাগারে জমা দেবেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সরকার রাজস্বের হার যতোটা সম্ভব উঁচু করে ধরেছিলেন এবং রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে কোন কৈফিয়তই গ্রাহ্য করা হত না।[৩৭] অন্যদিকে, রায়তদের থেকে জমিদারের নির্দিষ্ট হারে খাজনা আদায়ের শর্ত থাকা সত্ত্বেও, জমিদার প্রায়ই লংঘন করতেন সে শর্ত এবং নিয়মিত আদায় করতেন আবওয়াব যার হার ছিল কয়েকগুণ বেশী।

মুঘল আমলের জমিদারদের সঙ্গে ঔপনিবেশিক আমলের জমিদারদের পার্থক্য অবশ্যই ছিল। নতুন জমিদারদের অধিকাংশই ছিলেন পুরনো জমিদারদের কর্মচারী, যেমন নড়াইলের জমিদার, বা ব্যবসায়ী/মহাজন অথবা কোম্পানীর চাকুরে, যেমন, ঢাকার নবাব বা ভাগ্যকুলের রায় পরিবার।[৩৮]

মার্ক্স এ পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছিলেন, কৃষকদের ওপর শত উৎপীড়ণ চালিয়েও পুরনো জমিদাররা টিকে থাকতে পারেনি, বরং এদের স্থান দখল করেছিলেন ফড়িয়ারা যারা আবার সৃষ্টি করেছিলেন পত্তনী নামে নতুন এক ভূমিস্বত্ব প্রথার।[৩৯]

পত্তনী নামে নতুন এই মধ্যস্বত্ব প্রথা চালু করেছিলেন বর্ধমানের জমিদার তেজচন্দ্র বাহাদুর। সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব দিতে না পারায়

তাঁকে চিরস্থায়ী এই মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি করতে হয়েছিল। এই প্রথায়, জমিদারীর অংশ বিশেষ পত্তনীদার চিরস্থায়ী শর্তে ভোগ করতে পারতেন। জমিদারকে দিতেন তিনি নির্ধারিত রাজস্ব এবং প্রয়োজনে বিক্রি করতে পারতেন তার স্বত্ব তবে জমিদারের রাজস্ব বাকী পড়লে জমিদারের অধিকার ছিল সে স্বত্ব বিক্রি করে দেওয়ার এবং পত্তনি স্বত্ব যতবার হাত বদল হত ততবারই জমিদার একটি ফি পেতেন।[৪০]

কিন্তু এই মধ্যস্বত্ব একটি স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। পত্তনিদার আবার একই শর্তে আরো অধস্তন স্বত্ব সৃষ্টি করতেন এবং এ ভাবে ক্রমেই দেখা গেল কৃষক ও জমিদারের মাঝে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন বাখরগঞ্জের কোন কোন জমিদার ও কৃষকের মাঝে বিশটিরও বেশী স্তরের খোঁজ পাওয়া গেছে।[৪১] অর্থাৎ এক কথায় সরকার যেমন জমিদারদের সঙ্গে নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব লাভের জন্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছিলেন তেমনি জমিদাররাও মধ্যস্বত্বভোগীদের সঙ্গে দ্বিতীয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি করেছিলেন।

পূর্ববঙ্গের বেশ কিছু বড় জমিদারী ছিল যার মালিকরা সরকার কর্তৃক বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন, যেমন, ময়মনসিংহের 'মহারাজ' সূর্যকান্ত, বা ঢাকার 'নবাব' আবদুল গনি। তবে এ অঞ্চলের অধিকাংশ জমিদারী ছিল মাঝারী এবং তালুকদারী এস্টেট।[৪২]

১৮২০ এর মধ্যেই ক্যাম্পবেলের মতে, (১৮৩২) জমিদাররা এক অর্থবান শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলেন এবং ১৮৩০ এর মধ্যে নতুন শ্রেণীর এই জমিদারদের সঙ্গে পুরনো আমলের জমিদারদের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তারা জমিদারীর চিন্তা করতেন রাজস্বের পরিপ্রেক্ষিতে, রায়ত বা জমির পরিপ্রেক্ষিতে নয়।[৪৩]

এক কথায়, জমিদার শোষক হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কোনরকম দায়িত্ব ছাড়া। কর সংগ্রহ এবং জবরদস্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল তার উদ্বৃত্তের। এই উদ্বৃত্ত তিনি শিল্পে লগ্নী করেননি বরং লগ্নী করেছিলেন নতুন জমিদারী বা মধ্যস্বত্ব কেনার দিকে বা মহাজনী ব্যবসায়।[৪৪] ঔপনিবেশিক কাঠামোতে অনেক বাধানিষেধ ছিল শিল্পখাতে পুঁজি বিনিয়োগের। তাছাড়া আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক বাণিজ্য বা শিল্প—কোন ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। শুধু তাই নয় ঐ কাঠামোতে শ্রেণী হিসেবে তার অবস্থান ছিল অধস্তন। সুতরাং

মেট্রোপলিটান পুঁজির সঙ্গে জমিদারের প্রতিযোগীতায় যাওয়া সম্ভব নয়। বরং অনুৎপাদনশীল খাত, যেমন, 'কোম্পানীর কাগজ' বা মহাজনী ব্যবসার দিকেই তাকে ঝুঁকতে হয়েছিল যেখানে ছিল ঝুঁকি কম। সুতরাং এই উদ্বৃত্ত ব্যয়িত হয়েছিল ভোগের দিকে। জমিদাররা পুরো সময়টা নিয়োজিত করেছিলেন বিলাস ব্যসনে।[৪৫]

চরিত্রগত দিক থেকে হিন্দু মুসলমান জমিদারের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। আবদোস সোবহানের (১৮৮৯) মত কট্টর হিন্দু বিদ্বেষী লেখকও মুসলমান জমিদারদের সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছিলেন, এরা কবুতর উড়িয়ে, মোরগবাজি করে, সতরঞ্জ খেলে বা স্রেফ ঘুমিয়ে দিন কাটান। 'মোসলমান কুলে জন্ম গ্রহণ না করিলে, মোসলমান মহিলাগণ এই আবর্জ্জনাগুলিকে প্রসব না করিলে, সমাজের অধোপতনের আশঙ্কা কিছু কম হইত।'[৪৬]

মধ্যস্বত্ব সৃষ্টির ফলে জমিদারদের ব্যক্তিগত সুবিধা হয়েছিল দু'টি। নির্দিষ্ট হারে, নির্দিষ্ট সময়ে তিনি খাজনা পেতেন অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি আয় সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন এবং জমিদারী পরিচালনায় কোন হাঙ্গামা আর তাকে পোহাতে হত না। হাতে তখন তার প্রচুর সময় কারণ উৎপাদনমূলক কোন ভূমিকা তার ছিল না যদিও তিনি যুক্ত ছিলেন জমির সঙ্গে। সময় কাটানোই ছিল তার পক্ষে এক সমস্যা। এ ছাড়া উদ্বৃত্তও তিনি লগ্নী করতে পারছিলেন না। আবার গ্রামের এই সীমিত পরিসরে সম্ভব ছিল না উদ্বৃত্ত খরচ করার। সুতরাং তাকে পা বাড়াতে হয়েছিল শহরের দিকে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে যে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা নয়। তবে সরকারী তথ্য অনুযায়ী উনিশ শতকের দ্বিতীয়দশক থেকে মাত্র এর শুরু। সেই থেকে তাদের নাম হয়ে গেল অনুপস্থিত জমিদার।[৪৭]

নিজ জমিদারীতে জমিদারদের অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে সিরাজুল ইসলাম (১৯৭৯) উল্লেখ করেছেন, যেহেতু জমির বাজার হয়ে উঠেছিল প্রতিযোগিতামূলক সুতরাং জমিদাররা যেখানেই জমিদারী পাওয়া গেল সেখানেই তা কেনা শুরু করেছিলেন এবং এ সব জমিদারীর কোনটার সঙ্গে কোনটার সম্পর্ক ছিল না। তাই জমিদারের প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল একটি কেন্দ্রের।[৪৮] কিন্তু এটিই প্রধান কারণ ছিল বলে

মনে হয় না। কারণ আগেই দেখিয়েছি, যেহেতু জমিদারীতে তার কোন উৎপাদনমূলক ভূমিকা ছিল না এবং প্রজার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তার একতরফা অর্থাৎ শুধু নেওয়ার, সে জন্যে অনুপস্হিত হওয়া ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর ছিল না। আমার আলোচ্য সময়ের একটি হিসাব নিলে দেখা যাবে, পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জমিদারই ছিলেন অনুপস্হিত জমিদার। সরকারী হিসাব অনুযায়ী, বাখরগঞ্জের অধিকাংশ, ফরিদপুরের ৩/৪ ভাগ এবং ময়মনসিংহের এক অষ্টমাংশ থেকে একষষ্টাংশ ছিলেন অনুপস্হিত জমিদার।[৪৯] উদাহরণ হিসেবে পাবনা জেলার জমিদারীর একটি হিসাব নেওয়া যেতে পারে—[৫০], [দেখুন, সারণী ঃ ১, পৃঃ ৯৭]

সুতরাং বলা যেতে পারে, বড়, মাঝারী, ছোট জমিদার বা মধ্যস্বত্ব-ভোগীর মধ্যে জমিদারীর আকৃতি বা অর্থের তারতম্য থাকলেও তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দু'টি। এক, জমির ওপর ছিলেন তারা নির্ভরশীল কিন্তু জমির সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। এবং দুই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন তিনি নিজ জমিদারীতে অনুপস্থিত।

জমিদারের অনুপস্থিতি, জমিদার শোষক হওয়া সত্ত্বেও ক্রমে প্রজার সঙ্গে তার সম্পর্ক বদলে দিয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়ার পর, প্রাথমিক পর্যায়ে জমিদার ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে অত্যাচারী কারণ জমিদার তখনও নিজ জমিদারীতে অবস্থান করছিলেন। সাহিত্যে ঐ সময় জমিদার চিত্রিত হয়েছেন দস্যু হিসেবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত লিখেছিলেন, 'বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গলী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমিদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে।'[৫১] এমনকি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও জমিদার সমর্থক 'ঢাকা প্রকাশ' লিখেছিল, জমিদার 'রাইয়তের রক্ত শোষিয়া লন।'[৫২]

কিন্তু ক্রমে, জমিদার যখন অনুপস্থিত জমিদারে পরিণত হলেন তখন তার হয়ে রায়তদের ওপর প্রত্যক্ষভাবে অত্যাচার ও শোষণ করতেন গোমস্তা বা মধ্যস্বত্বভোগীরা। জমিদার ক্রমেই, বিশেষ করে আমার আলোচ্য সময়ের শেষের দিকে, পরিণত হয়েছিলেন দূরের মানুষে। পূজাপার্বণে, ঈদে ক্বচিৎ কখনো তিনি জমিদারীতে পদার্পণ করতেন। কিছু দানধ্যান বা পিতৃত্বমূলক আচরণ করতেন এবং প্রজারা তার

সারণী ঃ ১

পাবনা জেলার অনুপস্থিত জমিদারদের তালিকা/১৯২৬

নং	জমিদারের নাম	নিবাস	পাবনায় কাচারী
১	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলকাতা	সাহাবাজপুর বাগাবাড়ী জমিরতা, উমরপুর
২	কেশবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	ঢাকা	কৈটোলা, সাহাজাদপুর
৩	ওয়াজিদ আলী খান পন্নী	মৈমনসিংহ	সাহাজাদপুর, সিরাজ-গঞ্জ, আটঘরিয়া
৪	বীরেন্দ্রকুমার রায়	রাজশাহী	চাটমহর
৫	প্রমদানাথ রায় বাহাদুর	ঐ	সিলিমপুর, ভুলবারিয়া, সাঁড়া, করঞ্জা
৬	শরদিন্দুনাথ রায়	ঐ	খিদিরপুর
৭	মনীন্দ্রনাথ নন্দী	কাসিমবাজার	মালিফা
৮	যোগেন্দ্র নাথ রায়	লালগোলা	পাবনাপত্তনী
৯	খাজা হাবিবুল্লাহ	ঢাকা	রায় দৌলতপুর
১০	কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর	যশোহর	গড়গড়ি
১১	প্রমথভূষন দেব রায়	ঐ	কামালপুর
১২	হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	টাঙ্গাইল	সিরাজগঞ্জ, কাজীপুর
১৩	জানকীনাথ রায় চৌধুরী	ঐ	নাটুয়ারপাড়া
১৪	প্রমথনাথ রায় চৌধুরী	ঐ	সিরাজগঞ্জ, মেহরা
১৫	হেরম্বনাথ চৌধুরী	আমবাড়িয়া	সিরাজগঞ্জ
১৬	বিনোদবিহারী চৌধুরী	ধরাইল	শ্রীপুর
১৭	সতীশচন্দ্র চৌধুরী	নাগরপুর	খোকসা বাড়ী

*(এ হিসাব ১৯২৬ সালের। কিন্তু এ থেকে অনুমান করে নিতে পারি আমার আলোচ্য সময়ে অনুপস্থিত জমিদারদের সংখ্যা কেমন ছিল)

উৎস ঃ রাধারমন সাহা ''পাবনা জেলার ইতিহাস'', ৩ খণ্ড, পাবনা, ১৩৩৩।

কাছেই তার নায়েব গোমস্তার অত্যাচার সম্পর্কে বা অন্যান্য আবেদন অভিযোগ জানাতেন। জমিদারের সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক আমূল বদলে গিয়েছিল। তাই আমরা দেখি, উনিশ শতকের শেষের দিকের জমিদার,

প্রমথ চৌধুরী লিখছেন, 'রায়তের কাছে জমিদার দেবতা হতে পারে কিন্তু জোতদার ওরফে উপ-জমিদার যে উপ-দেবতা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই উপদেবতার উপদ্রব থেকে রায়তদের বাঁচাতে হবে।'[৫৩] অর্থাৎ শোষক হলেও উনিশ শতকের শেষার্ধে জমিদার নিজেই নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন আবার প্রজার মুরুব্বী হিসেবে।

জমিদাররা অহরহ একটি শ্রেণী হিসেবে নিজেদের অটুট রাখার চেষ্টা করতেন। নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলেও পরস্পর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে এক ধরনের আঁতাত করতে চাইতেন। রামপুর বোয়ালিয়ার জমিদার তাঁর নাতিকে উপদেশ দেওয়ার ছলে বলেছিলেন, মনে রাখবে তুমি রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, পাবনা, নদীয়া এবং যশোরের প্রভাবশালী ও কুলীন পরিবারগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত।[৫৪]

বাঙ্গালী সামাজিক স্তরের শীর্ষে অবস্থান ছিল জমিদারদের। সে জন্যে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা সভাসমিতিতে তাদের একটি ভূমিকা ছিল। এ ভূমিকা ছিল পদমর্যাদার কারণে। উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত 'জনসাধারণ সভার' প্রতিনিধিরূপে জমিদাররা কংগ্রেস সম্মেলনে দর্শকের ভূমিকায় যোগ দিতেন অথবা মিউনিসিপ্যালিটি বা লোকাল বোর্ডে সদস্য হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন, কোন কোন ক্ষেত্রে নির্বাচিত। নীচের দু'টি সারণী এর উদাহরণ।

সারণী ঃ ২

লোকাল বোর্ডের সদস্য ঃ[৫৫] ১৮৮৬

জেলা	মোট সদস্য	জমিদার সদস্য	অন্যান্য সদস্য
যশোহর	৪০	১৯	২১
খুলনা	২৬	১৪	১২
ঢাকা	৩০	১১	১৯
ফরিদপুর	২২	৭	১৫
বাখরগঞ্জ	২২	১০	১২
ময়মনসিংহ	৮	২	৬
পাবনা	১৫	৮	৭
মোট	১৮৪	৮৬	৯৮

উৎস ঃ *Bengal Administration Report 1877-88.*

সারণী ঃ ৩

কংগ্রেস সম্মেলনে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রেরিত[৫৬]
মুসলমান ডেলিগেটদের সংখ্যা

সন	মোট	জমিদার
১৮৮৬	৯	৭
১৮৮৭	২	১
১৮৮৯	২	২
১৮৯৬	৪	১
১৮৯৯	১	১
১৯০১	১২	৭
মোট	৩০	১৯

উৎস ঃ Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal*

রাজনৈতিকভাবে, জমিদাররা ছিলেন ঔপনিবেশিক সরকারের সমর্থক, কারণ এ শ্রেণী ছিল ঐ কাঠামোরই ফল। সরকারী প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের সমর্থন ছিল অকুণ্ঠ এবং সোচ্চার। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঢাকা বা পাবনার জমিদার ও আরো ছোট খাট অনেক জমিদারের ভূমিকা এর উদাহরণ (পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে)। শুধু তাই নয়, ১৯৩৫ সালেও শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় ভূস্বামীদের জন্যে আসন সংরক্ষিত রাখার পরিপ্রেক্ষিতে জমিদার সংঘের সভাপতি ময়মনসিংহের মহারাজ বলেছিলেন, শ্রেণী হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব রাখতে হলে ইংরেজ শাসনকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী করে তোলা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।'[৫৭]

অন্যদিকে, আবার রায়তদের পক্ষে সরকারী যে কোন ধরনের সংস্কারের তারা ছিলেন ঘোর বিরোধী। ভূমি সংস্কারমূলক বিভিন্ন আইনের বিরুদ্ধে তাদের সভাসমিতি, স্মারকলিপি প্রভৃতি এর উদাহরণ।[৫৭ক] কিন্তু জমিদাররা যে প্রজাবৎসলও ছিলেন বা আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্যে কাজ করতেন তা প্রমাণের জন্যে অনেকে গ্রামে গ্রামে জমিদারদের পাঠশালা বা স্কুল স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছেন। সরকার ও তাদের ভালো কাজগুলিকে পাঁচভাগে ভাগ করেছিলেন, যেমন, রিলিফ ও দাতব্য খাজনা মওকুফ ও অন্যান্য দয়া, এবং ব্যক্তিগতভাবে রিলিফের

কাজে অংশগ্রহণ।[৫৮] কিন্তু তাদের দানধ্যানের পরিমাণ কোথায় কোন খাতে তা করেছেন, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, নিঃস্বার্থভাবে তারা দেশের জন্যে যা ব্যয় করেছেন তার থেকে বেশী না হলেও বিদেশী স্বার্থে কম দান করেন নি। আর স্থানীয়ভাবে যা ব্যয় করেছেন তা নিজের প্রজাদের কথা ভেবে নয়, ব্রিটিশ কোন প্রতিনিধির সে অঞ্চলে পদার্পণকে স্মরণ রাখার জন্যে বা ঔপনিবেশিক সরকারের অনুরোধে। উদাহরণস্বরূপ ঢাকার নবাব আবদুল গনির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দানধ্যানের জন্যে তিনি ছিলেন বিখ্যাত। ঢাকা শহর উন্নয়নের জন্যেও তিনি অনেক দান করেছিলেন। কিন্তু তুলনামূলকভাবে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, রাজপ্রতিনিধির আগমন স্মরনার্থে, বা কর্তৃপক্ষের অনুরোধে করা তাঁর দানের পরিমাণ নেহাৎ কম নয়।[৫৯]

এক কথায় বলা যেতে পারে, জমিদার সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিলেন ঔপনিবেশিক কাঠামোর ওপর। সমাজে তার কোন উৎপাদনমূলক ভূমিকা না থাকায়, পরিণত হয়েছিলেন তিনি পরগাছায়।

খ. পেশাজীবী/মধ্যশ্রেণী

জমিদার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যবর্তী স্তরের লোকদের সাধারণ-ভাবে মধ্যশ্রেণীর অন্তর্গত বলে ধরে নিতে পারি। মধ্যশ্রেণীর এক বিরাট অংশ ছিলেন চাকুরিজীবী। এছাড়া স্বাধীনপেশা, যেমন, আইনজীবী, ডাক্তার বা মধ্যস্বত্বের অধিকারী এবং ব্যবসায়ী প্রভৃতিও ছিলেন মধ্যশ্রেণীর অন্তর্গত। মধ্যশ্রেণীকে কখনও 'ভদ্রলোক হিসেবেও অভিহিত করা হত। তবু শুধু বিত্তের জোরেই 'ভদ্রলোক' হওয়া যেত না, এর সঙ্গে যোগ থাকতে হত শিক্ষার। আমার আলোচ্য সময়ে এই ভদ্রলোকরা সমাজে সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন।

ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামোর স্থিতির সঙ্গে সঙ্গে অধস্তন কর্মচারীর সংখ্যাবৃদ্ধিরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এবং এর প্রধান কারণ ছিল প্রশাসনিক কেন্দ্রীভূতকরণ।[৬০] এ কারণে 'আনকভেনেন্টেড' বা প্রাদেশিক সার্ভিসের, যেমন, আইন, রাজস্ব, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি দফতরের পদগুলি ভারতীয়দের জন্যে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। এ পদে যোগদানের বা সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল শিক্ষা।[৬১]

ঔপনিবেশিক সরকারের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, জমির ওপর

পুরোপুরি নির্ভর করতে না পেরে মধ্যস্বত্বের অধিকারীর সন্তানরা বিভিন্ন হাই স্কুলগুলিতে ভীড় জমিয়েছিল এবং সরকারী চাকুরী পাবার আশায় ইংরেজী শিখছিল। এ জন্যে তাদের প্রয়োজন মিটিয়েছিল, বিভিন্ন জেলা স্কুল, আবার কলেজিয়েট বা পোগজ স্কুলের মত কিছু স্কুল এবং ঢাকা কলেজ। এক হিসেবে জানা যায়, ঢাকা বিভাগে ১৮৮১ সালে হাইস্কুলে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৫৯১ জন এবং ১৮৯১তে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ১০,৩৭১ জনে।[৬২]

নতুন এই পেশাজীবী শ্রেণীর যারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন তারাও গ্রামের বাসিন্দা এবং তারাও কোন না কোনভাবে গ্রামের উপর নির্ভরশীল। মধ্যস্বত্বের অধিকারীদের পড়তি অবস্থা, জমিদারীর ভাঙ্গন প্রভৃতি বাধ্য করেছিল তাদের জীবীকা অর্জনের নতুন পথ খুঁজে নিতে। যেমন, সিলেটের রাধানাথ চৌধুরীর কথা ধরা যাক। তাঁর পিতামহ ছিলেন জমিদার। রাধানাথের জন্মের সময় জমিদারীর অবস্হা পড়ে গিয়েছিল। তাঁর ভাইরা কেরানী অথবা ছোটখাট চাকুরি গ্রহণ করেছিলেন।[৬৩] উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের কৃতি ব্যক্তিরা যারা আত্মজীবনী লিখেছেন তাঁদের প্রায় সবার লেখার মধ্যেই এ চিত্রটি ফুটে উঠেছে। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন গ্রামের জমির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সে জমির পরিমাণ কোন কোন ক্ষেত্রে এতোকম যে তাতে সংসার চলে না, ফলে জীবীকার জন্যে তাকে অন্যপথ খুঁজে নিতে হয়েছিল। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল ঢাকা এবং তারপর কলকাতা। ঢাকা ব্যবসা ও প্রশাসনিক কেন্দ্র, ইংরেজী স্কুল কলেজ আছে সেখানে। ফলে সেখানে খানিকটা শিক্ষালাভ করে একটি চাকুরীর বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। সুতরাং সে গ্রাম থেকে পাড়ি জমাতো ঢাকা অথবা আত্মীয়স্বজন আছে এমন কোন মফস্বল শহরে। সেখানে জায়গীর থেকে অথবা কয়েকজন মিলে মেস করে শুরু করতো পড়াশোনা। এবং শিক্ষা শেষ হলে বা শিক্ষারত অবস্থায়ই তার আত্মীয়স্বজনরা তাকে কোন একটি চাকরিতে ঢুকিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতো।[৬৪]

ঔপনিবেশিক সরকারের চাকুরি পাওয়ার প্রধান মাধ্যম ছিল শিক্ষা। ঔপনিবেশিক সরকার শিক্ষার ধাঁচ আবার এমন করেছিলেন, যার ফলে এ শিক্ষা মাধ্যম থেকে যারা এসেছিলেন তারা হয়েছিলেন অনুকরণকারী, সিভিল সার্ভিসের যে কোন পদের আকাংখী যা তাদের অর্থ ও ক্ষমতা

দেবে। ঔপনিবেশিক সরকারের চাকুরিতে যারা গিয়েছিলেন তারা টাকা জমিয়ে, বিনিয়োগ করেছিলেন জমিতে। কিন্তু সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করেন্ নি ব্যবসায় বা বাণিজ্যে। কারণ ঔপনিবেশিক গঠনে, মেট্রোপলিটন পুঁজির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তারা যেতে চান নি, অনিশ্চয়তার কারণে।

এ বিষয়ে রক্ষণশীল মধ্যশ্রেণীর পত্রিকা 'হিন্দু রঞ্জিকা' ও আক্ষেপ করে লিখেছিল, দিন দিন মধ্যশ্রেণীর বিশেষ করে ভদ্রলোকদের অবস্থা খারাপ হচ্ছে, কারণ তাদের ফাঁকা গর্ব এবং স্বাধীন ব্যবসায় নামার লজ্জা। এ অবস্থা চললে দেশের কোন উন্নতি হবে না। চাষীরা এখন কেরাণীদের থেকেও ভালো আছে, কারণ সাংসারিক স্বাচ্ছ্যন্দ্যের জন্যে তারা সবকিছু করতে প্রস্তুত। যদি কেউ একটু উঁচু পদের চাকরি করেন তা'হলে সবাই তার ওপর নির্ভরশীল হবে তবুও স্বাধীন-ব্যবসায় কেউ নামবে না।[৬৫] স্বাধীন ব্যবসায় না যাওয়ার একটি কারণ হতে পারে শিক্ষা সম্পর্কে ফাঁকা গর্ব। কিন্তু যে কারণে জমিদাররাও স্বাধীন ব্যবসায় বা শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করেন নি, সেই একই কারণে মধ্যশ্রেণী ব্যবসায় যেতে চান নি।[৬৬]

পূর্ববঙ্গের ইংরেজী শিক্ষিতরা পেশা হিসেবে, আমার আলোচ্য সময়ের শুরুতে কি বেছে নিচ্ছিলেন তার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে, ঢাকা কলেজের ছাত্ররা কোন কোন পেশা বেছে নিয়েছিলেন তা বিশ্লেষণ করে। এখানে উল্লেখ্য, কলেজের পড়া শেষ করে যে অনেকে চাকরি নিয়েছিলেন তা'নয়। ফোর্থ থেকে ফার্ষ্ট ক্লাশ—এই চারটি শ্রেণীতে অধ্যয়নকালেই অনেকে পেশা বেছে নিয়েছিলেন। ১৮৪৮ থেকে ১৮৫২ পর্যন্ত—এ চার বছরের এক তালিকায় দেখা গেছে, অধিকাংশই (৪৪ জন) নিযুক্ত হয়েছিলেন ছোটখাট সরকারী চাকুরিতে। এ সব চাকুরির মধ্যে ছিল কেরানী, সেরেস্তাদার, মুনসেফ, দারোগা (১০ জন) প্রভৃতি। এসব চাকুরির বেতন ছিল চল্লিশ থেকে একশো টাকা পর্যন্ত। তারপরে স্থান ছিল শিক্ষকতার। ১৫ থেকে ৪৫ টাকা পর্যন্ত বেতনে ৩৬ জন নিযুক্ত হয়েছিলেন বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী স্কুলে। আইন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন চৌদ্দ জন। ১ জন হয়েছিলেন একাউনটেন্ট। চারজন কলেজ পাশ করে কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়তে গিয়েছিলেন, এবং এদের মধ্যে একজন ছিলেন অন্নদাচরণ খাস্তগীর, যিনি পরে পূর্ববঙ্গের এক প্রধান ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন।[৬৭]

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর, জমি-জমা সংক্রান্ত জটিলতাই আইন ব্যবসায়ের পথ খুলে দিয়েছিল। যারা আইন ব্যবসা শুরু করেছিলেন, বলা যেতে পারে পরোক্ষভাবে তারাও জমির ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। ক্রমে এ পেশা লাভজনক এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৮৬৪-৭৩—এ ক'বছরে কলকাতা থেকে আইন বিষয়ে ডিগ্রী নিয়েছিলেন ৭০৪ জন। ১৮৮১ সালের এক হিসাবে জানা যায় শুধু পুরো বাংলা প্রদেশেই ৫.১৮ কোটি টাকার (সম্পূর্ণ ভারতের $\frac{১}{৩}$) মামলা হয়েছিল।[৬৮]

ঔপনিবেশিক শাসকের আইন যে নিরপেক্ষ এবং তা গরীবের রক্ষক এ বিষয়ে মধ্য শ্রেণী নিশ্চিত ছিলেন উনিশ শতকে। তাই তিনি যোগ দিয়েছিলেন সিভিল সার্ভিসে আইনের অধস্তন রক্ষক হিসেবে। আইন পাশ করে আইনের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্যে হয়েছিলেন তিনি ব্যারিস্টার, এডভোকেট, উকিল প্রভৃতি।[৬৯] সভাসমিতি, সংস্থা, সবকিছু গড়তে এসেছিলেন তারাই উদ্যোগী হয়ে। মফস্বলে সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল কোর্ট কাচারী এবং একে আশ্রয় করেই জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন অনেকে।

যা হোক এই নতুন মুনসেফ, ডেপুটি, ইস্কুলের সাবইনসপেক্টর, উকিল—প্রায় সবাই চাকুরিগত কারণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিলেন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন মফস্বল শহরগুলিতে। সেখানে আধাগ্রামীন আধা নাগরিক সমাজে তারাই হয়ে উঠেছিলেন সমাজের নেতা। স্কুল গড়েছিলেন তারা, সভাসমিতি করেছিলেন, নজর দিয়েছিলেন নিজ নিজ জীবন যাপনের শৃংখলার দিকে।[৭০]

ছুটিতে জমিদারদের মত তারাও গ্রামের বাড়ীতে যেতেন, দান-ধ্যান সালিশ করতেন, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে তারা কৃত্রিম আড়ম্বরের দিকে মন দিয়েছিলেন। বিয়ে, ধর্মীয় উৎসব, পোষাক আষাক সবক্ষেত্রেই তারা ঝুঁকেছিলেন আড়ম্বরের দিকে—তারা যে আলাদা একটি শ্রেণী, তার স্বাতন্ত্র্য জ্ঞাপনের জন্যে।[৭১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে মধ্যশ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জমিদারদের মত এরাও পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে জমির ওপর ছিলেন নির্ভরশীল, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাও যুক্ত ছিলেন একটি পেশার সঙ্গে। আগ্রহী ছিলেন তারা প্রধানতঃ শিক্ষার প্রতি কারণ সমাজে হয়ে উঠেছিল তা মর্যাদার প্রতীক এবং মফস্বল শহরগুলিই ছিল তাদের প্রধান আবাসস্থল।

মধ্যশ্রেণী বা পেশাজীবী, জমিদারদের মতই সমাজে স্হিতিবস্হা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তার প্রমাণ, ঐ সময় তাদের পরিচালিত পত্র-পত্রিকা। জমিদারদের সঙ্গে যে তাদের সংঘাত ছিল না তা নয়, সামাজিক প্রাধান্য নিয়ে সংঘাত ছিল। বিশেষ করে সভাসমিতি, স্বায়ত্ব-শাসিত সংস্হাগুলির নির্বাচনে প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা গেছে কোন জমিদার নির্বাচনে দাঁড়ালে পেশাজীবীরা একত্রিত হয়ে তাকে পরাজিত করেছেন। যেমন, ১৮৮৪ সালে, ঢাকার পৌরসভার প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন আইনজীবী আনন্দচন্দ্র রায়, যদিও ঢাকা শহরে নবাবদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তখন অসামান্য। লোকাল বোর্ড নির্বাচনে জমিদারদের খানিকটা প্রধান্য থাকলেও ডিস্টিক্ট বোর্ডগুলিতে প্রাধান্য ছিল ছিল পেশাজীবী, বিশেষ করে আইনজীবীদের।[৭২] এর কারণ, মফস্বল শহরগুলিতেই আইনজীবীদের ভীড় ছিল বেশী। অন্যদিকে গ্রাম বা ইউনিয়ন পর্যায়ে জমিদারের প্রতিপত্তি থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক।

পেশাজীবীদের আচরণ দেখে অনেক সময় আবার মনে হতে পারে যে, তিনি বুঝি সাধারণ মানুষের পক্ষে। অন্ততঃ নীল বিদ্রোহের সময় কৃষকদের পক্ষে মধ্যশ্রেণীর উচ্চকণ্ঠ এর উদাহরণ। রনজিৎ গুহ (১৯৭৪) এ পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যশ্রেণীর মনোভাব বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, আসলে নীলকরদের নিপীড়ন মধ্যশ্রেণীর উদারনীতিতে আঘাত করেছিল। নীলকরদের ঔদ্বত্য তার মনে আঘাত হেনেছিল যা তৈরী হয়েছিল পাশ্চাত্যের মানবতাবাদ ও ভারতীয় অভিভাবকবাদের মিশ্রণে। শহরে বাস করলেও গ্রামের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি। নীলকররা আঘাত হেনেছিল তার অর্থনৈতিক অবস্থা (গ্রামের মধ্যস্বত্ব বা বর্গা) এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্তৃত্বে (গ্রামীণ এলিটদের সদস্য হিসেবে)। তাই কৃষকের পক্ষে সে দাঁড়াতে চেয়েছিল নিজেকে সমর্থনের জন্যে। নীলকরের বিরুদ্ধে রায়ত অস্ত্র তুলে নিলে তার আপত্তি নেই কিন্তু সে নিজে অস্ত্র তুলে নেবে না কারণ তা'হলে তা'হবে নীলকরদের মত বেআইনী। সুতরাং এই নিপীড়ন বন্ধ করতে পারে একমাত্র আইন। আইনের রক্ষক সরকার এবং তা প্রয়োগ করতে পারেন সরকারই। সুতরাং কুসংস্কারের দেশে, উদারনীতির নতুন ধর্ম আরেকধরনের কুসংস্কারের জন্ম দেয়, ঔপনিবেশিক মধ্যশ্রেণীর নৈতিকতা, রাজনীতি ও মননে খাপ খাওয়ানোর জন্যে।[৭৩]

মধ্যশ্রেণী প্রজার মুরুব্বী হতে পছন্দ করে কিন্তু তাকে যদি জমিদার ও প্রজার মধ্যে একটি পক্ষ বেছে নিতে বলা হয় তা'হলে সে বেছে নেবে জমিদারের পক্ষ। এ পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যশ্রেণী পরিচালিত দু'টি পত্রিকা থেকে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। রক্ষণশীল 'হিন্দু হিতৈষিণী' লিখেছিল—গ্রামঞ্চলে যে সব দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় তার কারণ জমিদাররা নয়, রায়তরা। দেশের অধিকাংশ জমিদারই শিক্ষিত এবং রায়তদের তারা ভালোবাসেন। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জমিদারদের অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেছে। দুঃখের বিষয়, আইনে জমিদার বা প্রজাদের অধিকারের বিষয় নির্দিষ্ট করে কিছু লেখা নেই। এবং এর সুযোগে সরকার প্রায়ই অন্যায়ভাবে জমিদারদের ওপর কঠোর আচরণ করেন।[৭৪] আর অপেক্ষাকৃত উদারনৈতিক 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' লিখেছিল, সরকারের উচিত খারাপ বা ভালো জমিদারদের মধ্যে পার্থক্য করা।[৭৫]

ঔপনিবেশিক কাঠামোয় মধ্যশ্রেণীর ভূমিকা এ রকমই ছিল। তারা তুলে ধরেছিল শাসকের শিক্ষাসংস্কৃতি রুচি। এই কাঠামোয় তাদের প্রধান ভূমিকা আবার তাদের করে তুলেছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব অন্বেষী। কিন্তু অর্থনৈতিক পুঁজির ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এবং সামাজিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় তাদের রাজনীতি হয়ে উঠেছিল সমঝোতাপূর্ণ এবং আদর্শ বিকৃত। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয়ে উঠলেও চরম কোন পরিবর্তন এনে সমাজের আমূল পরিবর্তন করতে পারেনি।[৭৬]

গ. ব্যবসায়ী

জমিদার, পেশাজীবী বা মধ্যশ্রেণী এবং সাধারণ মানুষ বা কৃষক ছাড়াও, আরেকটি প্রভাবশালী শ্রেণী আমরা ঐ সময় দেখতে পাই—ব্যবসায়ী, যারা আন্ত এবং বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং এর অধিকাংশই ছিলেন হয় অবাঙ্গালী অথবা ইংরেজ।

১৮৩৩ থেকে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য বিকশিত হয়েছিল এবং আমাদের আলোচ্য সময়ে এর দ্রুত বিকাশ ঘটেছিল। এর কারণ উন্নত ও দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা। পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম বন্দর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল নীচের সারণী যার প্রমাণ। এ ছাড়া আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি পূর্ববঙ্গের কৃষককে যুক্ত করেছিল বিশ্ববাজারের সঙ্গে।[৭৭]

সারণী ঃ ৪

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে রপ্তানীকৃত পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য[৭৮]

১৮৮৯-১৯০১

বৎসর	পরিমাণ (পাট)	মূল্য/রুপি	পরিমাণ (চা, পাউণ্ডের হিসাবে)	মূল্য/রুপি
১৮৮৯-৯০	৭৫,২৮৫	১,৩৬,৫৬,৭৭১	১১,৯২,৫৪৪	৬,১২,৫৮৭
১৮৯০-৯১	৬৮,৯৮০	১,১৫,৪০,৫৭৩	১১,৮০,৯৯৩	৫,৮৭.১৫২
১৮৯১-৯২	৪৬,২০৩	৭৬,১০,৩৫৪	১২,৬২,১৭৪	৬,১২,৫৮১
১৮৯২-৯৩	৪৭,৫৪৯	৭৪,৩৭,৫৯৭	১০,৭৮,৪৫৭	৫,৬০,২১৭
১৮৯৩-৯৪	৩৩,৭৬২	৫৮,৫১,১১৮	১১,১৯,৪২৬	৫,৮৯,৬০৫
১৮৯৪-৯৫	৩৭,৩৯৫	৬৭,৩১,৯৯১	১০,৭৫,৯৪৮	৬,২১,৫০৪
১৮৯৫-৯৬	৪৫,১২৮	৭১,৪১,৮৪২	৯,৬৮,৯২৯	৫,২০,২৫৫
১৮৯৬-৯৭	৩১,৮৮৭	৩৮,২৭,৪৮০	১১,৩০,৯৮৩	৬,২৭,৮০৬
১৮৯৭-৯৮	৩৬,৬১৩	৬০,০২,৯৮০	১৮,৯৯,৫৯০	৪,৯৫,২৩৭
১৮৯৮-৯৯	৩১,৩৫৪	৫২,৩৮,৭৮৫	৮,৯০,৫২৫	৪,৫৯,২৮৯
১৮৯৯-১৯০০	২৩,৬৯৬	৪১,৯৮,৬৭২	১০,৮২,৮১৪	৫,২৩,৬৪৩
১৯০০-১৯০১	২৭,৬০৯	৪৮,৪৩,৫৩০	১১,৫৩,০৮৬	৫,৬০,১৬০

উৎস ঃ Misbahuddin Khan, *Port of Chittagong* (Unpublished Manuscript)

বৈদেশিক বাণিজ্য প্রায় পুরোটাই ছিল বৃটিশদের হাতে। এ সময় যে সব চেম্বার অফ কমার্স বা বাণিজ্যিক সংস্থা গড়ে উঠেছিল সেগুলিও কাজ করেছিল বৃটিশ স্বার্থের অনুকূলে। যেমন, নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স। এক হিসাবে দেখা গেছে ১৮৩৩ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত এই সত্তর বছরে বাংলার বহির্বাণিজ্য বেড়ে গিয়েছিল চৌদ্দগুণ।[৭৯]

অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছিল একদিকে, বৃটিশ কারখানার জন্যে কাঁচামাল সরবরাহকারী এবং অন্যদিকে বৃটিশ ও ইউরোপীয়দের তৈরী বাজার। চা ও পাট এ সময় হয়ে উঠেছিল প্রধান রপ্তানীকারক পণ্য।[৮০] কিন্তু এতদসত্বেও প্রাথমিক উৎপাদনকারী কখনই তার পণ্যের জন্যে ন্যায্য দাম পায় নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

পূর্ববঙ্গের কৃষক পাট উৎপন্ন করে। ফড়িয়া কৃষকের কাছ থেকে পাট কিনে নেয়, তারপর বিক্রি করে তা নারায়ণগঞ্জে বেপারী বা আড়তদারের কাছে। সে আবার তা বিক্রি করে কলকাতার বড় ব্যবসায়ী বা রপ্তানীকারকের কাছে। এখানেও আমরা দেখছি কৃষক ও রপ্তানীকারকের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল বেশ ক'টি স্তরের।[৮১]

পূর্ববঙ্গের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতেন উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের অবাঙ্গালী বা বিদেশীরা। যেমন, ঢাকার লবন, চামড়া ও পাটের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতেন আর্মানী, গ্রীক, মাড়োয়ারী বা ইংরেজরা। দু'একজন বাঙ্গালী যে ছিলেন না তা নয়, কিন্তু তা ছিল খুবই নগণ্য। তবে মধ্যবর্তী স্তরে ছিলেন বাঙ্গালীরা যাদের মধ্যে তিলি, সাহারা ছিলেন আবার প্রধান।

ঘ. সাধারণ মানুষ/অধস্তন শ্রেণী

সংজ্ঞা ও সংখ্যা

অধস্তন শ্রেণী বা সাধারণ মানুষ এখনও গবেষণার বিষয় নয়। সুতরাং এ অনুচ্ছেদ আলোচনায় আমাদের বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে। সঠিক তথ্যের অভাব একটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা। এ ছাড়া অধিকাংশ তথ্যের উৎস সরকারী নথিপত্র এবং এগুলি আমাদের বিশ্লেষণের বয়নের দিক থেকে নির্ভরশীল নয়।

উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষ/অধস্তন শ্রেণীর ওপর এ পর্যন্ত সফিউদ্দিন জোয়ারদার (১৯৭৮) রচিত প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য।[৮২] তাঁর প্রবন্ধের ভিত্তিও সরকারী নথিপত্র কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন, ঐ সব রিপোর্টগুলিতে কি পরিমাণ ভ্রান্তি ছিল। এবং ঐ বিভ্রান্তির বেড়াজাল দূর করে তিনি চেষ্টা করেছেন উনিশ শতকের শেষার্ধে রাজশাহীর শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা তুলে ধরতে। বর্তমান অনুচ্ছেদেও আমি বিচার বিশ্লেষণ করে সরকারী নথিপত্র ব্যবহার করবো, তবে আমার প্রধান অবলম্বন হবে জোয়ারদারের প্রবন্ধ ও ১৮৮৯ সালে এ, সি, সেনের লেখা ঢাকা জেলা সম্পর্কিত কৃষিবিষয়ক একটি রিপোর্ট।[৮৩]

প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার সাধারণ মানুষ/অধস্তনশ্রেণী হিসেবে কাদের অভিহিত করবো? এবং আমার আলোচ্য সময়ে এর সংখ্যাই বা ছিল কত? জোয়ারদার তাঁর প্রবন্ধে তিন শ্রেণীর লোকদের 'শ্রমজীবী'র

সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন,—

ক. জমির পরিমাণ অল্প হওয়ায় যে সমস্ত লোক তাদের সংসার চালানোর জন্য কায়িক শ্রমে নিজেদের নিয়োজিত করত ;

খ. যাদের কোন জমিজমা নেই এবং দিন মজুরীই যাদের আয়ের একমাত্র উৎস ; এবং

গ. কারিগর শ্রেণী।[৮৪]

জোয়ারদার 'অবস্থাপন্ন চাষী' বা মাঝারি ধরনের কৃষকদের বাদ দিয়েছিলেন তাঁর আলোচনা থেকে। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন, ঐ ধরনের কৃষকরা মোটামুটি স্বাচ্ছ্যন্দ্যে কালাতিপাত করছে। কিন্তু আমি, সরকারী নথিপত্রের ভাষায় 'সম্পন্ন' চাষীদেরও আমার আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করে দেখাতে চেষ্টা করবো তাদের সম্পন্ন বলাটা কতটা যুক্তিযুক্ত। এ পরিপ্রেক্ষিতে, আদমশুমারীগুলি ব্যবহার করতে পারলে আমাদের পরিশ্রম কিছুটা লাঘব হত। কিন্তু তা'ব্যবহার করা যে কতোটা জটিল তা আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। আদমশুমারীতে 'সাধারণ মানুষ' বলে কোন শ্রেণী ছিল না, সমগ্র জনসংখ্যাকে এখানে ছ'সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। যেমন, 'প্রফেশনাল', 'এগ্রিকালচারাল', 'ডোমেষ্টিক' ইত্যাদি। 'এগ্রিকালচারাল' কি ছিল শুধু কৃষিজীবী? না, এর অন্তর্গত ছিল—'Persons engaged about animals, workers, dealers in mixed materials, workers, dealers in mixed fabrics and dress' ইত্যাদি।[৮৫] সুতরাং বর্তমান অনুচ্ছেদে সঠিকভাবে আদমশুমারী ব্যবহার করাও সম্ভব হবে না।

অধস্তন শ্রেণী সম্পর্কে রণজিৎ গুহের সংজ্ঞাটিকে গ্রহণ করতে পারি।[৮৬] তাঁর মতে, অধস্তন শ্রেণী বলতে আমরা সেই শ্রেণীকে বুঝবো যারা ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত নন, ক্ষমতার বিন্যাস : অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক/প্রশাসনিক মতাদর্শগত দিকের সঙ্গে যারা যুক্ত নন কিন্তু প্রবলশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভুত্ব অর্থনৈতিক স্বার্থ ও মতাদর্শগত প্রভাবের মধ্যে যারা অন্তরিত। সে জন্যে তাদের পক্ষে সক্রিয়ভাবে প্রবলশ্রেণীর অর্থনীতি রাজনীতি এবং মতাদর্শের চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব নয় যদিও অধস্তন শ্রেণীর নিজস্ব মতাদর্শ ক্রিয়াশীল থাকে। যে মুহূর্তে অধস্তন শ্রেণী প্রবল শ্রেণীকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হয় সে মুহূর্তে অধস্তন শ্রেণী সমাজগঠনে শ্রেণী

হিসেবে, শ্রেণী সচেতন অংশ হিসেবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। আমার আলোচ্য সময়ে অধস্তন শ্রেণী ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের মধ্যে প্রথমোক্ত অর্থে ক্রিয়াশীল ছিল দ্বিতীয় অর্থে নয়।

সুতরাং এ অনুচ্ছেদে, অধস্তন শ্রেণীতে 'সম্পন্ন' বা 'মাঝারি কৃষক', জোয়ারদারের কথিত শ্রমজীবী মানুষ এবং আদমশুমারীর ৫টি বিভাগ ও (৬ টির মধ্যে এখানে উদাহরণ স্বরূপ আমরা ১৮৮২ সালের আদমশুমারী ব্যবহার করবো) অন্তর্ভুক্ত।

আমার আলোচ্য সময়ে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের মোট সংখ্যা কত ছিল তা উল্লেখ করা অসম্ভব। কারণ বাংলা প্রদেশের সীমানা বিভিন্ন সময় বদলেছিল। এবং পূর্ববঙ্গ বলতে আমি যে ভূখণ্ডের কথা উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে দেওয়া হয়েছিল বা যুক্ত করা হয়েছিল। সুতরাং জনসংখ্যার সঠিক হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। তা'ছাড়া অনেকক্ষেত্রে জনসংখ্যাকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করার ফলে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, জোয়ারদার রাজশাহীর জনসংখ্যা নির্ণয়ের জন্যে হান্টারের 'স্টাটিসটিক্যাল রিপোর্ট অফ বেঙ্গল' গ্রন্থটি ব্যবহার করতে গিয়ে দেখলেন, হিন্দু জনসংখ্যার পেশা দেখে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চিত্র পাওয়া যায় বটে কিন্তু মুসলমানদের পাঠান সৈয়দ শেখ ভাগে বিভক্ত করার ফলে তাদের পেশা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। সুতরাং সঠিক সংখ্যার ভিত্তির ওপর জোর না দিয়ে অনুমানের চেষ্টা করবো, উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর তুলনায় সাধারণ মানুষ বা অধস্তন শ্রেণীর অনুপাত কেমন ছিল। এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ আমি ব্যবহার করবো ১৮৮১ সালের আদমশুমারী ও জোয়ারদারের প্রবন্ধে উল্লিখিত নন্দজীর রিপোর্ট।

সারণী ৫

পূর্ববঙ্গের তিনটি বিভাগের পেশাজীবী জনসংখ্যার হার/১৮৮১

বিভাগ	মোট জনসংখ্যা	পেশাজীবীর সংখ্যা	হার
রাজশাহী	২৭৩৯৪২৯	৫৪,১৬১	১.৯৭
চট্টগ্রাম	৩০০৮১১৩	৭৫,৯৩৮	২.৫২
ঢাকা	১৯৬০৮২৬	৩৪,৩৯৩	২.৯৭

উৎস : *Census 1881* : Table XXVII এর উপাত্তের ভিত্তিতে।

সারণী ৬

পূর্ববঙ্গের তিনটি বিভাগের 'কৃষিজীবী' জনসংখ্যার হার/১৮৮১

বিভাগ	মোট জনসংখ্যা	কৃষিজীবীর সংখ্যা	হার
রাজশাহী	২৭৩৯৪২৯	১৮৭৮২৭২	৬৮.৫৬
চট্টগ্রাম	৩০০২১১৩	২০০১৫৫৯	৬৬.৫৩
ঢাকা	১১৬০৮২৬	৬৪১৯৬৯	৫৫.৩০

উৎস ঃ *Census 1881* : Table XXVII এর উপাত্তের ভিত্তিতে।

মোট জনসংখ্যার তুলনায় পেশাজীবীর হার যে কত নগণ্য ছিল সারণী ৫ তার প্রমাণ। সেন্সাসের 'এগ্রিকালচারাল' শ্রেণীর হার ছিল সবচেয়ে বেশী। আর আমি যদি পূর্বোক্ত সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষের (সেন্সাসের 'প্রফেশনাল অর্ডার' বাদ দিয়ে বাকী ৫টি অর্ডার) আনুপাতিক হার জানতে চাই, তা'হলে দেখবো ১৮৮১ সালে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগে সে হার ছিল যথাক্রমে ৯৮.০৩, ৯৭.৪৮ এবং ৯৭.০৩।

এবার আরো ছোট একটি এলাকা নিয়ে পর্যালোচনা করতে পারি। নঁওগা মহকুমার দুবলহাটীর সেটেলমেন্ট অফিসার মুন্সী নন্দজী ১৮৮৭ সালে দশটি গ্রাম জরীপ করে সাধারণ মানুষ সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ ঃ

সারণী ৭

	অর্থনৈতিক কার্যে নিযুক্ত লোক	মোট জনসংখ্যার শতকরা
ক.	যারা কামলা নিয়ে নিজ জমি চাষ করে	৭.৬
খ.	যারা নিজেরাই নিজেদের জমি চাষ করে	৬০.০
গ.	জমির স্বল্পতাহেতু যারা মাঝে মাঝে দিন মজুরীও করে	২৪.৬
ঘ.	যারা দিন মজুরী করেই সংসার চালায়	৫.১
ঙ.	যারা অন্যের দয়ার উপর নির্ভরশীল	১.০৩
চ.	চামড়ার ব্যবসায়ী	১.০৩

উৎস ঃ নন্দজী রিপোর্ট, রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের রিপোর্টের অংশ বিশেষ, Report on the Condition of the Lower Classes of Population, 1888, p. 2. উদ্ধৃত, জোয়ারদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩।

জোয়ারদার দেখিয়েছেন, ঐ দশটি গ্রামে শ্রমজীবী (অর্থাৎ 'গ' ও 'ঘ') মানুষের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার প্রায় ত্রিশ ভাগ। আর আমাদের সংজ্ঞা প্রয়োগ করলে দেখবো ঐ গ্রামের ৯৯.৩৬ ভাগ লোকই অতি সাধারণ।

সুতরাং ধরে নিতে পারি, আমার আলোচ্য সময়ে পূর্ববঙ্গে অধিকাংশ মানুষই ছিলেন অধস্তন শ্রেণীর অন্তর্গত এবং এর মধ্যে সাধারণ কৃষকের সংখ্যাই ছিল বেশী।

সরকারী রিপোর্ট ও সাধারণ মানুষ

সরকারী রিপোর্টগুলিতে প্রায় সময়ই (১৮৭২-৭৩, ১৮৭৩-৭৪ ইত্যাদি; স্ক্রাইন ১৮৯২) উল্লেখ করা হয়েছিল যে, সাধারণ মানুষের অবস্থা দিন কে দিন উন্নত হচ্ছে।[৭৮] ১৮৮০ সালে সেন উল্লেখ করেছিলেন—কৃষকরা আগের থেকে— 'better fed, better clothed, better housed, and have got more ready money in their pockets...'[৮৮] কিন্তু সরকারী এ মন্তব্য সমূহই কি সাধারণ মানুষের আসল চিত্র? না। এবং সরকারী তথ্যের ভিত্তিতেই আমি তা দেখাবার চেষ্টা করব।

একজন সাধারণ মানুষের আয় ব্যয়

একজন কৃষকের আয়ের প্রধান মাধ্যম হল জমি। সেনের রিপোর্টে, কৃষকের জমির পরিমাণ কেমন ছিল (১৮৮৯ সালে) সে সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। জোয়ারদার রাজশাহী জেলার সদর মহকুমার ৬৩ জন রায়ত অধ্যুষিত একটি গ্রামের কৃষকদের জমির মালিকানার হিসাব দিয়েছেন তা উল্লেখ করছি সারণী ৮-এ (পৃ ১১২)।

সঙ্গত কারণেই অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, একটি গ্রামের উদাহরণ দিয়েই কি সমগ্র পূর্ববাংলার অবস্থা নিরূপণ সম্ভব? হয়ত নয়। কিন্তু এ থেকে পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে একটি ধারণা পেতে পারি। সারণীঃ ৮ এ দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ কৃষকের জমির পরিমাণ ৫ বিঘার কম। এ জন্যে তাদের অনেককে বাড়তি আয়ের জন্যে দিনমজুরী করতে হত। কিন্তু শুধু গরীব কৃষক নয়, দেখা যাচ্ছে, সেন, ঢাকা জেলার যে সম্পন্ন চাষীর কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁর পরিবারও বাড়তি আয়ের জন্যে

সারণী ৮

রাজশাহী জেলার সদর মহকুমার একটি গ্রামের জমির মালিকানার ধরন/১৮৮৭

জমির পরিমাণ/বিঘায়	কৃষকের সংখ্যা	মোট কৃষকের কত শতাংশ
ক. পাঁচ বিঘার কম	৩৫	৫৫.৬
খ. ৫ থেকে ১০	৯	১৪.৬
গ. ১০ থেকে ২০	১৫	২৩.০০
ঘ. ২০ বিঘার উপর	৪	৬.৮

উৎস : Report of the Commissioner of Rajshahi Division, RCLC, p. 7, জোয়ারদার, প্রাগুক্ত।

নৌকোর মাঝি হিসেবে কাজ করতেন। সুতরাং মনে হয়, জোয়ারদার উল্লিখিত শুধু 'শ্রমজীবী' নয় পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ কৃষককে, সংসার নির্বাহের জন্যে জমি ছাড়াও বাড়তি কাজের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হত।

একজন কৃষকের জীবনযাপনের ধরন বুঝতে পারবো আমরা তার বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। সেন, ঢাকা জেলার রায়পুরার (ধামরাইয়ের ৩ মাইল পশ্চিমে) একটি 'সম্পন্ন' নমশূদ্র কৃষক পরিবারের কথা উল্লেখ করেছেন। সেন, কৃষক পরিবারের জমির পরিমাণের কথা উল্লেখ করেননি কিন্তু আমরা তার উৎপন্ন ফসলের অনুপাতে ধরে নিচ্ছি ঐ পরিবারের জমির পরিমাণ ছিল ২৫ বিঘা। (সেন উল্লেখ করেছেন, প্রতি বিঘায়, আমন হত ৩-১০ মন, আউশ ৪-৬ এবং বোরো ৪-১২ মন, পৃঃ ৬৩, জোয়ারদার রাজশাহীর এক হিসেবে দেখিয়েছেন বিঘে প্রতি সেখানে ৬ মন ধান উৎপন্ন হত। এখানে অর্থাৎ ঢাকা জেলায় গড়ে বিঘা প্রতি ৫ মন করে ধান ধরলে ২৫ বিঘায় উৎপাদিত ধানের পরিমাণ ১২৫ মন)। ঐ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬ জন (এক ভাই, দু ভাইয়ের স্ত্রী এবং বৃদ্ধা মা)। এবার দেখা যাক তাদের বাৎসরিক আয় কত ছিল—সারণী ৯ (পৃ ১১৩)।

এর সঙ্গে যোগ করতে হবে মাঝি হিসেবে বাড়তি আয় ৭০ রূপি। তা'হলে ঐ পরিবারের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল বছরে ৩১৬ রূপি অর্থাৎ গড়ে মাথা পিছু বাৎসরিক ৫৩ রূপি।

সারণী ৯

ঢাকা জেলার একজন সম্পন্ন কৃষকের বার্ষিক উৎপাদন ও আয়

১৮৮৮ সালে

উৎপন্ন দ্রব্য	পরিমাণ/মন হিসেবে	আয়/রূপি
মটর	৭০	৮০
ধান	১২৫	১৫০
তিল	২	৬
চিনা	৩	৬
কাউন	১	৪
	মোট আয়	২৪৬

উৎস ঃ *ARDD* ঃ ১৪ এর তথ্যের ভিত্তিতে।

এবার দেখা যাক তার বাৎসরিক ব্যয় কত ছিল। এ খাতে আমি শুধু জমি (সংক্রান্ত ব্যয়) খাদ্য ও কাপড়ের ব্যয় ধরবো।

প্রতি বিঘার উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য পওয়া যায় নি। এ সম্পর্কে খানিকটা অনুমান করে নিতে হবে। ধান উৎপাদন দিয়েই শুরু করা যাক। জয়পুরার ৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারটির ২৫ বিঘা জমিতে ধান উৎপাদন করতে কত খরচ হত ? সেন, এ সম্পর্কে কোন তথ্য দেন নি। জোয়ারদারও তাঁর প্রবন্ধে ধান উৎপাদনের খরচ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লেখেন নি। তবে সেন প্রতি বিঘায় পাট উৎপাদনের একটি খরচ দেখিয়েছেন। সেখান থেকে আমরা কিছু তথ্য নিতে পারি।

উপরোক্ত ব্যয় থেকে আমরা বীজ, মাটিগুড়া করা, খাজনা ও পাটের আঁশ বার করার খরচটি বাদ দিতে পারি। অর্থাৎ ৪ রূপি ২ আনা ৯ পাই। তা'হলে প্রতি বিঘায় খরচ পড়েছিল সাতরূপি আট আনা। ক্ষেতের বাকী কাজ ধরে নিচ্ছি তিন ভাইই করতেন। কিন্তু আমাদের এর সঙ্গে যোগ করতে হবে বীজের ব্যয়। সেন, ধানের বীজের কোন দর দেন নি। তবে জোয়ারদার, এক হিসেবে দেখিয়েছেন রাজশাহীতে ৫ বিঘা জমির জন্যে লাগতো ২ মন বীজ যার দাম ছিল ৩ রূপি।[৮৯] ঐ হিসাব ধরলে দেখা যায় ২৫ বিঘার জন্যে প্রয়োজন ছিল ১০ মন ধান অর্থাৎ ১৫ রূপি। ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে জমির খাজনা ছিল বিভিন্ন রকম। তবে সবচেয়ে কম ছিল

সারণী ঃ ১০

প্রতি বিঘায় পাট উৎপাদনের ব্যয়/১৮৮৯

বিবরণ	রুপি	আনা	পয়সা
সার	১	০	০
দশটি লাঙ্গল	২	১২	০
২১/২ সের বীজ	০	০	৯
নিড়ানী ৬ জন	১	৮	০
মাটিগুড়া করা ২১/২ জন	০	১০	০
পাট কাটা ৮ জন	২	০	০
শুকানো ১ জন	০	৪	০
খাজনা	১	৮	০
পাট থেকে আঁশ বার করা ৮ জন	২	০	০
মোট	১১	১০	৯

উৎস ঃ *ARDD* পৃঃ ৫১ এর তথ্যের ভিত্তিতে।

কাসিমপুর পরগণায়—৮ আনা থেকে দু'আনা। প্রতি বিঘায় গড় প্রতি খাজনা ধরতে পারি ১ রুপি।

এরপর প্রত্যেকের দৈনিক খাবার খরচের একটি হিসাব নেওয়া যাক। সকালে নাস্তা, সঙ্গে বাসি ডাল বা তরকারী অথবা শুধু নুন বা লংকা; দুপুরে ও রাতে ভাত, তরকারী ও ডাল। মুসলমানরা কচিৎকখনো ডিম বা মুরগী খেতেন এবং তা ছিল রীতিমত বিলাসিতা।[৯০] সেন ঢাকা জেলার ৮ জনের একটি পরিবারের (স্বামী-স্ত্রী, প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ও ৫টি শিশু) দৈনিক খাদ্য বাবদ যা ব্যয় হত তার হিসেব দিয়েছেন এ ভাবে—

সারণী ঃ ১১

বিবরণ	রুপি	আনা	পয়সা
চাল, তিনবেলা ৫ সের		৪	০
ডাল			৪১/২
তরকারী			৪১/২
নুন			৩
তেল			৪১/২
মশলা			৩
মাছ			৬
পান/তামাক			৪১/২
	মোট	৬	৬

উৎস ঃ *ARDD*, পৃঃ ১৭ এর তথ্যের ভিত্তিতে।

জোয়ারদার রাজশাহীর দু'জনের একটি পরিবারের দৈনিক খাদ্য বাবদ ব্যয় দেখিয়েছেন ৫ আনা ৯ পাই।[৯১] আমরা দু'জনের পরিবারের জন্যে ব্যয় কমিয়ে ৫ আনা করে ধরতে পারি।

বাকী থাকে এখন পোশাক। সেন, ঢাকা জেলার চাষীদের বাৎসরিক পোশাক বাবদ ব্যয়ের একটি হিসাব দিয়েছেন—

সারণী ঃ ১২

পরিবারের সদস্য	বিবরণ	রূপি	আনা
একজন প্রাপ্ত বয়স্ক	৪ ধুতি	২	৮
	২ গামছা	০	৮
	১ চাদর		৮ থেকে ১০ আনা
	১ শীতের চাদর		১২-১ রূপি ৮ আনা
মহিলা	৫ থেকে ৬টি শাড়ী	৪	
শিশু	২ গামছা		৮

*মহিলাদের জন্যেও গামছা, চাদরের ব্যয় ধরা হয়েছে।[৯২]

উৎস : *ARDD*, পৃঃ ১৭ এর তথ্যের ভিত্তিতে।

আমাদের জয়পুরার আলোচ্য পরিবারের তিনজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের পোষাক বাবদ খরচ পড়ছে কম করে ১২ রূপি ৮ আনা। তিনজন মহিলার ১২ রূপি। শিশুর খরচ বাদ দেওয়া গেল।

এখন দেখা যাক, জয়পুরার সেই পরিবারের বাৎসরিক ব্যয় কত ছিল। এখানে কিন্তু সরকারী হিসেব থেকেও ব্যয়ের হার কিছুটা কমিয়ে ধরেছি।

সারণী ঃ ১৩

একটি কৃষক পরিবারের আনুমানিক বাৎসরিক ব্যয়

ব্যয়ের খাত	পরিমাণ রূপি	আনা
২৫ বিঘায় ধান উৎপাদনের ব্যয়	১৮৭	৮
২৫ বিঘা জমির খাজনা	২৫	০
খাদ্য	১১৪	
পোষাক	২৪	১২
মোট	৩৫১	৪

আমি এখানে অন্যান্য রবি ফসল উৎপাদন, অসুখ হলে অষুধ, ঘরবাড়ী সংস্কার ও সাংসারিক অন্য খরচ বাদ দিয়েছি। তা সত্বেও 'সম্পন্ন' পরিবারটি বাৎসরিক ঘাটতি ছিল বছরে—৩৫ রূপি।

অন্যদিকে জোয়ারদার, রাজশাহী অঞ্চলে ৫ বিঘা জমি আছে এমন একজন কৃষকের বাৎসরিক আয় দেখিয়েছেন ৯০ টাকা। তার তার ব্যয় ছিল বাৎসরিক ২২১ রূপি ১ আনা। অবশ্য জোয়ারদার ঐ হিসাবে বিবাহাদির খরচ দেখিয়েছিলেন। ঐ খাত বাদ দিলে, ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৬ রূপি। অর্থাৎ ঘাটতি ১০৬ রূপি।[৯৩]

যারা ছিলেন ভূমিহীন, দিনমজুর বা ভৃত্য তাদের অবস্থা ছিল কি রকম? সরকারী একটি রিপোর্টে বলা হয়েছিল, নিয়মিত কাজ করলে তার রোজগারের পরিমাণও ছিল একজন কৃষকের সমান।[৯৪] অর্থাৎ সরকারী প্রশাসকরা ইঙ্গিত করেছেন, তাদের অবস্থাও ছিল ভালো।

ঢাকা জেলার (২৭৯৭ বর্গমাইল) মোট জনসংখ্যার (২১১৬,৩৫০ জন) ১.০৪ ভাগ (২২,১৯০ জন) ছিল এ ধরনের 'men without fixed pursuit.' বিভিন্ন অঞ্চলে এদের মুজুরির গড় ছিল ৪ আনা।[৯৫] নোয়াখালীতে দৈনিক মজুরি ছিল ৩ আনা ৩ পাই, চট্টগ্রামে ৫ আনা ৩ পাই; গড়ে চট্টগ্রাম বিভাগে এ হার ছিল চার আনা।[৯৬] এ হিসাব ধরলে ঢাকা ও চট্টগ্রামের একজনের বাৎসরিক আয় ছিল ৯১ রূপি চার আনা; রাজশাহীর ৬৭ রূপি আট আনা;[৯৭] সরকারী তথ্য অনুযায়ী চট্টগ্রামের চারসদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবারের আয় ছিল বাৎসরিক ৭৫ রূপি ১২ আনা।[৯৮] অন্যদিকে সববাদ দিয়ে শুধু খাদ্যের বাবদ ব্যয় ধরলেও দেখবো আয় ব্যয়ের বিরাট অসামঞ্জস্য।

কারিগরদের অবস্থা ছিল একই রকম বা এর চেয়েও খারাপ। সরকারী রিপোর্টে যেমন একথা বলা হয়েছে (সেনঃ ১৮৮৯) তেমনি জোয়ারদারও তাঁর প্রবন্ধে এ কথা স্বীকার করেছেন।

সাধারণ মানুষ/অধস্তন শ্রেণীর অবস্থা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে অধস্তন শ্রেণীর অবস্থা পরিস্কার হয়ে উঠছে। সরকারী রিপোর্টে এদের অবস্থার উন্নতি হচ্ছেল বলে লেখা হয়েছিল বারবার। কিন্তু সরকারী উপাত্তের সাহায্যেই দেখা গেল উচ্চপদস্থ আমলাদের রিপোর্ট বিভ্রান্তিকর। সম্পন্ন বা মাঝারি চাষী

কারোই আয়-ব্যয়ের কোন সামঞ্জস্য ছিল না। এর একটি কারণ হতে পারে, যে, ফসলের ন্যায্য দাম কখনও তিনি পাননি। ফলে এদের সব সময়ই ধানের জন্যে মহাজন অথবা জমিদারের কাছে ঋণ নিতে বা জমি বন্ধক দিতে হয়েছিল এবং ক্রমে তিনি পরিণত হয়েছিলেন ভূমিহীনে।

কিন্তু সরকারী রিপোর্টগুলিতে আবার একই সঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছিল, কৃষকদের অবস্থা যতটা মনে করা হয় ততটা স্বচ্ছল নয়। এ ধরনের স্ববিরোধিতা, কাজ করেছে আমলাদের মধ্যে। যেমন, সেনের রিপোর্টে উপসংহারে বলা হয়েছিল, কৃষকদের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। তাদের অধিকাংশই এখনও থাকে কুঁড়েতে, শোয় মাটিতে। দিন আনে দিন খায়। এবং অধিকাংশের ঘাড়েই আছে ঋনের বোঝা। জমিদার ও তাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছাড়া সবাই ঋণে জর্জরিত এবং প্রথমোক্তদের সংখ্যা পঁচিশ এর বেশী নয়। দুর্ভিক্ষ হলে সরকারী সাহায্য ছাড়া কেউ বাঁচবেনা। অনেকে যে বলেন, উৎসবাদিতে তারা বেশী খরচ করে এবং দারিদ্রের সেটাও একটা কারণ—একথা ভুল। পাট উৎপাদকদের সম্পর্কেও যা বলা হয় তা অতিরঞ্জিত। কারণ তারাও প্রতারিত হয় ফড়িয়া, বেপারীদের দ্বারা।[৯৯] সেন আরো লিখেছিলেন—'As regards quality, the food of at least 90 percent, of the population of Bengal is not what it should be, and of this state of things the poverty of the people is far from being the only cause.'[১০০] অনেক সময়, নিম্ন পদস্থ আমলারা সত্যিকার চিত্র তুলে ধরতে চাইলেও কর্মকর্তারা সে সব মন্তব্যের অসারতা প্রমাণ করতে চাইতেন। যেমন, ১৮৭৪ সালে, পুটিয়ার রেশম কারখানার মালিক রাজশাহীর কালেক্টারকে জানান যে, ঐ অঞ্চলের জনসাধারণ কচু, শালুক ইত্যাদি খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। রাজশাহীর কালেক্টর এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে জানিয়েছিলেন—'but this is only in addition to other food.'[১০১]

মধ্যশ্রেণী পরিচালিত পত্র-পত্রিকায়, কৃষকদের প্রতি যেমন মাঝে মাঝে সহানুভূতি দেখানো হয়েছে[১০২] তেমনি তারা যে স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করে তাও বলা হয়েছে। এভাবেই ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের স্বার্থ এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও সমাজব্যবস্থার অঙ্গ মধ্যশ্রেণীর স্বার্থের মধ্যে একাত্মতা তৈরি হয়েছে।

৬. ভাবনার জগতে আধিপত্যবাদ

ঔপনিবেশিক শাসনে শ্রেণীবিন্যাসের রূপটি পূর্বের অনুচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনে ব্যক্তি একই সঙ্গে সমান্তরালভাবে যুক্ত শ্রেণী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে। এই যুক্ততা তৎকালীন শ্রেণী ও সম্প্রদায় বিন্যাসের ওপরও তৈরী করেছিল প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া। একদিকে, পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক সমাজ গঠনের মধ্যে গ্রামীণ বিন্যাস ছিল প্রবল, অন্যদিকে, গ্রামীণ বিন্যাসের মধ্যে বাজার ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার সীমাবদ্ধ ছিল বলে ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করি এক ধরনের নিশ্চলতা বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে আমরা শ্রেণীযুক্ততা ও সম্প্রদায়িক যুক্ততার মধ্যে তেমন কোন ভিন্নতা দেখি না। কিন্তু ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের পরবর্তী পর্যায়ে একপক্ষে বাজারের বিকাশ ও অন্যপক্ষে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত কৃষজ পণ্যের বিস্তারের দরুণ সমাজ গঠনের মধ্যে শ্রেণীবিন্যাস ও সম্প্রদায়িক বিন্যাসের মধ্যে ভিন্নতা তৈরী শুরু হয়েছিল। যেহেতু সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শ্রেণীবিন্যাসের দিক থেকে অধিকাংশ মুসলমান ছিলেন কৃষিজীবী এবং যেহেতু কৃষিজীবী বিন্যাস থেকে নেতৃত্ব উৎসারিত হয় নি তখনও সে জন্য মুসলমান সমাজে উচ্চ পর্যায় থেকে উৎসারিত হয়েছিল নেতৃত্বের বিন্যাস। এ কারণে, একপক্ষে উচ্চ পর্যায়ের উৎসারিত নেতৃত্বের বিন্যাস, ও অন্যপক্ষে অধস্তন শ্রেণী থেকে উপযুক্ত নেতৃত্ব তৈরীর অক্ষমতা—এ দুইয়ের যোগাযোগের ফলে সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে, শ্রেণীবিন্যাস থেকে সাম্প্রদায়িক বিন্যাস হয়ে উঠেছিল অধিকতর শক্তিশালী। এ প্রতিক্রিয়া ঐ সময় প্রতিফলিত হয়েছিল বিভিন্নভাবে। কারণ, মুসলমান সমাজের অন্তর্গত অধস্তন শ্রেণী একই পর্যায়ে উচ্চ পর্যায়ে উৎসারিত সম্প্রদায়িক নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল এবং একই সঙ্গে সেই নেতৃত্ব অস্বীকার করে শ্রেণী-বিন্যাসের ভিত্তিতে থেকে কৃষক আন্দোলন করেছিল। সেই সব ক্ষেত্রে, মুসলমান সমাজ গঠনের মধ্যে অধস্তন শ্রেণী হিন্দু সমাজ গঠনের অধস্তন শ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হয়েছিল, অপর পক্ষে, এই একাত্মতার ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। যখনই ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ উৎসারিত হয়েছিল তখনই লক্ষ্য করি হিন্দু-মুসলমান সমাজের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণী কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে

একই সুরে কথা বলছে এবং ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে আবেদন করেছে যাতে এই আন্দোলন ও বিদ্রোহের ব্যাপ্তি না ঘটে। কারণ ব্যাপ্তি ঘটলে তাদের ভাষায়, সমাজের শান্তি ও শৃংখলা বিঘ্নিত হবে।

এই ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের ভিত্তি ছিল প্রশাসন, শিক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্য ও সম্পত্তি। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা যেহেতু সরাসরি ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিল সে জন্যে শিক্ষার মাধ্যমে এ পর্যায়ে সমাজে অধিকতর গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি। এখানে উল্লেখ্য এই যে, শিক্ষা যেমন ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনে গতিশীলতার প্রধান মাধ্যম হয়েছিল তেমনি শিক্ষা জড়িত মূলধন আবার নিয়োগ করা হয়েছিল জমিতে। এ কারণেই এ গতিশীলতার প্যাটার্ন চক্রাকার অর্থাৎ ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের অবস্থানই এ পর্যায়ের চিন্তার জগতের রূপরেখা তৈরী করেছিল।

এই অনুচ্ছেদে, বুদ্ধিজীবীদের বিশ্লেষণ করবো গ্রামসীর অনুসরণে। গ্রামসীর (১৯৭৬) ভাষায় বলতে গেলে এরা সবাই বুদ্ধিজীবী।[১০৩] তবে গ্রামসী বুদ্ধিজীবীদের প্রকৃতি ও ভূমিকা নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা জটিল। কারণ, গ্রামসী প্রধানত দু'টি ভিন্ন অর্থে 'বুদ্ধিজীবী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, শ্রেণী থেকে স্বাধীন সামাজিক ক্যাটেগরি হিসেবে বুদ্ধিজীবীদের আলাদা করে দেখা ভুল। কারণ, সব মানুষই বুদ্ধিজীবী, কারণ, তাদের বুদ্ধি আছে এবং তা তারা ব্যবহার করে, কিন্তু সামাজিক কর্মক্ষেত্রে আবার সবাই বুদ্ধিজীবী নয়। যেমন, অনেকে তো রান্না করতে বা কাপড় সেলাই করতে পারেন কিন্তু তাই বলে তার পেশা পাচক বা দর্জি নাও হতে পারে।

গ্রামসীর জন্ম দক্ষিণ ইতালীতে, যেখানে শিল্প গড়ে উঠেছিল কম। দক্ষিণ ইতালী ছিল প্রধানত কৃষিভিত্তিক যেখানে ধর্মের প্রাধান্য ছিল বেশী। তাই গ্রামসী যখন বুদ্ধিজীবীদের কথা আলোচনা করেছেন তখন দক্ষিণ ইতালীর পটভূমিকা তিনি ভুলতে পারেন নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামসী বুদ্ধিজীবীদের প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন, ঐতিহ্যবাহী বা ট্রাডিশনাল এবং সৃষ্টিশীল বা অর্গানিক। এ ছাড়াও আরেক ধরনের বুদ্ধিজীবীদের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, যাদের উল্লেখ করা যেতে পারে ক্রান্তিকালীন বলে।

ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীরা দু'ধরনের হতে পারেন, এক, যারা পেশাগতভাবে ধর্মভিত্তিক শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত যেমন যাজক, দুই,

যারা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার বা পেশার সঙ্গে যুক্ত যেমন শিক্ষক বা উকিল। নির্দিষ্ট একটি সমাজে এরা বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দেন। তবে গ্রামীণ পরিসরই ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করে বেশী। অর্থাৎ এরা প্রধানতঃ গ্রাম বা মফস্বল শহরের সঙ্গে যুক্ত। তবে তাই বলে এরা যে গ্রামের সাধারণ মানুষের অংশ, তা'নয়। চাষীদের বা সাধারণ মানুষের চোখে তারা ঈর্ষার পাত্র এবং চাষী বা সাধারণ মানুষ চান তাদের পুত্র-কন্যারা যেন বুদ্ধিজীবীদের ঐ স্তরে পৌঁছতে পারে।

ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীরা সাধারণ মানুষকে প্রদান করেন আদর্শ ও দর্শন যা শাসক শ্রেণীকে আবার সহায়তা করে আধিপত্য বিস্তারে, গড়ে তুলতে বিশ্বাসের ভিত্তি, যা আবার গ্রহণ করেন সাধারণ মানুষ। তাই সাধারণ মানুষ শাসকদের কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন না। এরা আদর্শগত ব্যবস্থার মাধ্যমে শোষিতের ওপর শোষকের যন্ত্র হিসেবে কাজ করে যারা আবার তার প্রধান সংগঠক। এক কথায়, এদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, বর্তমান আধিপত্য সংরক্ষণ, পরিপোষণ ও সমর্থন।[১০৪]

একজন ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবী আবার সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠেন তখন যখন তিনি বোঝেন যে, ইতিহাসের গতি বইছে কোন দিকে। অর্থাৎ গণ আন্দোলনের সময় যে বুদ্ধিজীবী জনতার কাতারে নেতৃত্ব দেন তিনিই পরিণত হন সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবী হিসেবে। গ্রামসীর মতে, সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবী এলিটরা ইতিহাস তৈরী করে নি, করেছেন সে সব বুদ্ধিজীবীরা যারা সচেতন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে (অঙ্গাঙ্গী-ভাবে) যুক্ত। শহরেই সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবী তৈরী হয় বেশী। কারণ, তারা গড়ে ওঠেন সাধারণ শিল্প বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। তবে মূলকথা, ঐতিহ্যবাহী বা সৃষ্টিশীল, দু'ধরনের বুদ্ধিজীবীরাই গ্রামীণ বা শহুরে পরিবেশে সংযুক্ত থাকতে পারেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গ্রামসী স্থায়ী বিপ্লবের বদলে 'বেসামরিক আধিপত্য' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর মতে, বিপ্লবী দলের কর্তব্য হচ্ছে এধরনের আধিপত্য বিস্তার করা।

গণ জাগরণের সময় অনেক ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবী নিজ পেশা ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হয়ে সৃষ্টিশীল হওয়ার সময়টুকুতে তিনি পরিণত হন আবার ক্রান্তিকালীন বুদ্ধিজীবীতে।

গ্রামসী আরো বলছেন, আইনগত ভিত্তি দিয়ে রাষ্ট্র তার জবরদস্তি ক্ষমতা খাটায় এবং পুরো সমাজের জন্যে তা চালু রাখে। এই আইনের

মাধ্যমেই রাষ্ট্র শোষক শ্রেণীকে সমমাত্রায় পরিণত করে এবং এক ধরনের সামাজিক বিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে যা শোষক শ্রেণী অনুসৃত নিজ বিকাশের জন্যে প্রয়োজন। অর্থাৎ রাষ্ট্র শাসন চালায় আইনের দোহাই দিয়ে। ফলে সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা হয়ে যায় আইন নির্দিষ্ট। কিন্তু সমাজ স্তর বিশিষ্ট, ফলে স্তরায়িত সমাজে আইনেরও স্তরায়ণ হয়। ব্যক্তি তখন আইনকে ভিত্তি করে তার নির্দিষ্ট অধিকার ও দায়িত্বের কথা তোলে। কিন্তু তাই বলে কি সমাজের সবাই আইনের সুযোগ নিতে পারে? পারে না, আইনের সুযোগ তারাই নেয় যারা সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।

শিক্ষার ওপরও জোর দিয়েছেন গ্রামসী। শিক্ষাকে তিনি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করতেন। আইন এবং শিক্ষা রাষ্ট্রের ভায়োলেন্সকে 'cultural idiom'-এর মাধ্যমে প্রকাশ করে।

গ্রামসীর বক্তব্যের পটভূমিকায় এবার আমি আমার আলোচ্য সময়ের পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও তাদের চিন্তার জগৎ পর্যালোচনা করবো।

পূর্ববঙ্গ ছিল কৃষিভিত্তিক যেখানে ধর্মের প্রাধান্য ছিল বেশী। শিল্প বিপ্লব বা শিল্পায়ন না হওয়ায় দূরত্ব সৃষ্টি হয় নি শহর ও গ্রামের মধ্যে। এ দূরত্বহীনতার দরুণ পূর্ববঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাই ছিল বেশী।

পূর্ববঙ্গেও ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন দু'ধরনের। এক, যারা ধর্মের সঙ্গে ছিলেন যুক্ত, যেমন মোল্লা, মৌলভী, পুরোহিত প্রভৃতি, দুই, পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত বা আলোকিত এবং খানিকটা যুক্তিবাদী, যেমন শিক্ষক, উকিল প্রভৃতি।

ধর্মভিত্তিক পেশার সঙ্গে যারা ছিলেন জড়িত গৌণতঃ তারা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর ছিলেন নির্ভরশীল কারণ তারা যে পেশার সঙ্গে যুক্ত যেমন মাদ্রাসা বা টোল সেগুলি সমাজ থেকে উৎসারিত, রাষ্ট্র থেকে নয়। কিন্তু গৌণতঃ হলেও তারা ছিলেন ঔপনিবেশিক কাঠামোর ধারক, বাহক এবং সমর্থক।

যারা ধর্মনিরপেক্ষ পেশার সঙ্গে ছিলেন যুক্ত, তারা সরাসরি নির্ভরশীল ছিলেন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে। সে জন্যে প্রত্যক্ষভাবে তারা সমর্থন করেছেন ঔপনিবেশিক শাসনকে। বা এককথায় বলা

যেতে পারে, ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীদের দু'অংশই সমর্থন দিয়েছিলেন ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদকে।

আইন এবং শিক্ষা উনিশ শতকে বাঙ্গালী বৃটিশ শাসকশ্রেণীর সংস্কৃতির দু'টো প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে হয়ে উঠেছিল পরস্পর নির্ভরশীল। ইংরেজী শিক্ষা সামাজিক মর্যাদা ও গতিশীলতা সবকিছুর প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছিল। আবার এই শিক্ষা তৈরী করেছিল বুদ্ধিজীবী বা আমলা যারা চালাতেন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্র। এই রাষ্ট্রযন্ত্রের সংজ্ঞা নির্ণীত হয়েছিল আইন শাস্ত্রের সাহায্যে, নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল বিচার বিভাগের মাধ্যমে, এই আইন সংরক্ষিত হয়েছিল শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে, আবার এর যৌক্তিক ভিত্তি দেওয়া হয়েছিল আইনের সাহায্যে।[১০৫] কিন্তু এই আইনের সুবিধেটুকু পেত সমাজে প্রাধান্য বিস্তারকারী শ্রেণী। সাধারণ মানুষকে এর সুবিধে নিতে হলে দিতে হত অর্থ, থাকতে হত অভিজ্ঞতা এবং প্রভাব। নয়ত এ সবকিছু আইনের সুবিধা গ্রহণে বিঘ্ন সৃষ্টি করত। শিক্ষিত ও পেশাজীবীদের সবকিছু বিচারের মাপকাঠি ছিল আইন। এবং তারা সমাজকে দেখতেন নিজেদের দর্পনে বা বিচার করতেন এর ভিত্তিতে।

এ পটভূমিকায় দেখবো, প্রাধান্যবিস্তারকারী শ্রেণী, ঔপনিবেশিক শাসকের সমর্থনে কি ভাবে চিন্তার ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করেছিল সূক্ষ্মভাবে। ঔপনিবেশিক শাসকদের পক্ষে এ কাজটি করে দিতেন ঐতিহ্য-বাহী বুদ্ধিজীবীরা ফলে শাসকদের আর বেগ পেতে হত না ঔপনিবেশিক কাঠামো ঠিক রাখতে। আদর্শ কি ভাবে আধিপত্য বিস্তারে সহায়তা করে তা প্রমাণের জন্যে, উদাহরণ স্বরূপ উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের একজন প্রধান সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনের দু'টি গ্রন্থ—'জমিদার দর্পণ', ও 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' নিয়ে আলোচনা করবো।[১০৬]

মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' আলোচিত হয়েছে নানা কারণে। এর মধ্যে প্রধান দু'টি কারণ বোধহয়, এক, লেখক মুসলমান এবং তিনি জনৈক মুসলমান জমিদার তথা জমিদার শ্রেণীর নিপীড়ণের চিত্র তুলে ধরেছেন। দুই, বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গ দর্শন' এ লিখেছিলেন, বইটি ভালো তবে এর প্রচার না হওয়া বাঞ্চনীয়। কারণ 'প্রজার হিতকামনা আমরা কখনও ত্যাগ করিব না। কিন্তু আমরা পাবনা জিলার প্রজাদিগের আচরণ

শুনিয়া বিরক্ত ও বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিস্প্রয়োজন।' তাঁর উক্তি এ ধারণার সৃষ্টি করেছে যে, বইটি কৃষকদের পক্ষে, যেমন ছিল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। তা'ছাড়া বই দু'টির নামের মিলও হয়ত এ ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। তিনি প্রজাদের প্রতিবাদ সে মাত্রা পর্যন্ত সহ্য করেছেন যতটুকু আইন সহ্য করে। একজন ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবী এ ধরনের পরিস্থিতিতে কি আচরণ করেন বঙ্কিম-চন্দ্রের উক্তি এর প্রমাণ।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা' ততোটা আলোচিত না হলেও এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিল আছে প্রথমোক্তটির। কারণ এ গ্রন্থেরও উপজীব্য হল—জমিদার, নীলকর এবং প্রজা।

'জমিদার দর্পণের' নায়ক হায়ওয়ান আলী, সে কামুক, অত্যাচারী। আবু মোল্লা তার রায়ত। মোল্লার স্ত্রী নূরন্নেহার সুন্দরী। হায়ওয়ান তাকে হস্তগত করতে চায় এবং এ জন্যে সে আবু মোল্লার ওপর অত্যাচার করে এবং নুরন্নেহারকে জবরদস্তি করে তুলে আনে, ধর্ষণ করে, নুরন্নেহারের মৃত্যু হয়। মামলা চলে, কিন্তু যেহেতু জমিদার ও আইনের রক্ষকের মধ্যে আঁতাত আছে সেহেতু হায়ওয়ান মুক্তি পায় এবং মোল্লা সর্বস্বান্ত হয়।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র কাহিনী আবর্তিত হয়েছে নীলকর রেনীকে কেন্দ্র করে। একজন নীলকরের পক্ষে প্রজার ওপর যা যা অত্যাচার করা সম্ভব রেনী তা করেছে এবং তাকে সহায়তা করেছে প্রভাবশালী জমিদার মীর সাহেব। তবে প্যারীসুন্দরী নামে এক মহিলা জমিদার রেনীর বিরোধিতা করে। অন্য দিকে মীরের জামাই সাগোলাম তাকে সম্পত্তিচ্যুত করে এবং সবশেষে প্রজার পক্ষ নেয়। মীর কিন্তু জমিদারীচ্যুত হয়েও রেনীর পক্ষে থাকে। অন্তিমে, রেনী সর্বস্বান্ত হয়।

মশাররফ হোসেন, দু'টি গ্রন্থেই মূলতঃ চেয়েছেন প্রজার ওপর জমিদার ও নীলকরের অত্যাচার তুলে ধরতে। জমিদারী অত্যাচারে তিনি ব্যথিত, ক্রুদ্ধ। এবং তাই নাটকের সূত্রধর মফস্বলের জমিদারদের পরিচয় দেয় জানোয়ার হিসেবে (আরবী হায়ওয়ানের অর্থ জানোয়ার) যাদের জন্যে, 'মফস্বলে শ্যাল কুকুর, শূকর, গরু, পর্যন্ত পার পায় না।'[১০৭]

কিন্তু তাঁর এই ক্রোধের কারণ কি? কারণ, পাশ্চাত্যের মানবতাবাদী ধারা ও ভারতীয় পিতৃত্বমূলক ভাবধারার মিশ্রণে, উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল মশাররফ হোসেন তার বাইরে ছিলেন না। এর অর্থ, প্রজার ওপর অত্যাচার সে মেনে নিতে পারে না, তার বিবেকে বাধে। তাই সে প্রজার পক্ষ নেয়, কিন্তু অন্তিমে জমিদারের সঙ্গে সংঘাত থাকলেও ঔপনিবেশিক কাঠামোয় দু'পক্ষই আঁতাত সৃষ্টি করে। প্রজা হয়ে ওঠে নিয়তিবাদী, যার পক্ষে শাসকের কাছে আবেদন করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

জমিদার অত্যাচার করে কারণ, ঔপনিবেশিক শাসক তাকে মদদ দেয়। মশাররফ হোসেনও তা জানেন কিন্তু তিনি তা উল্লেখ করেন না বরং বলেন, দুর্বলের ওপর অনেকেই অত্যাচার করে, জমিদারও করে। কিন্তু প্রজারা আবার এও জানে যে জমিদার ছাড়া দুঃখ শোনার কেউ নেই।[১০৮]

ঔপনিবেশিক কাঠামোয়, ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীরা সবকিছুকে ভালো ও খারাপ—এ দু'টি সরল ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। দেশে যত অন্যায় হচ্ছে তার জন্যে দায়ী খারাপ ইংরেজ ও খারাপ জমিদার। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসক বা জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে, শ্রেণীস্বার্থের কারণেই তাদের কোন বক্তব্য নেই। আছে বরং শ্রেণী সহযোগিতা। এবং তাই দেখি, উদাসীন পথিকের জমিদার ভৈরববাবু, নীলকর রেনীর চরিত্র, অভিসন্ধি ভালো করে জেনেও স্নেহচ্ছলে তাকে ভৎর্সনা করে বলেন, 'দেখ, তুমি আমাদের দেশের রাজা।'[১০৯] এবং রেনীও ভৈরববাবুর বুদ্ধি দেখে চমকৃৎ হয়ে, শত্রু জেনেও প্রতিজ্ঞা করে, 'আমি জানলাম তুমি যথার্থ বাবু। আমি আর তোমার সঙ্গে বিবাদ করিব না।'[১১০] শুধু তাই নয়, জমিদারী প্রথাতো ইংরেজদের অনুগ্রহেই হয়েছিল। তারা ছিলেন সত্যিকারের ইংরেজ যাদের অনেককে দেবতা হিসেবে পূজা করা যায়, কিন্তু রেনীরা হচ্ছে 'শূকর'।[১১১]

মশাররফ হোসেনের নায়ক জমিদার মুসলমান। তিনি মুসলমান ও হিন্দু জমিদারকে দু'টি দলে ভাগ করেছেন।[১১২] জমিদার দর্পণে মুসলমান জমিদার মুসলমান রায়তের ওপরই অত্যাচার করছে। তাঁর কাছে শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের ব্যাপারটি স্পষ্ট নয়। তাই তিনি যেমন শ্রেণী নির্ণয় করতে পারছেন না তাই রায়তের শত্রুকে—তা নির্ণয়

করাও তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

অবশেষে লেখক আশ্রয় নেন আইনের পক্ষপুটে। নুরন্নেহারকে ইচ্ছে করলেই হায়ওয়ান তখনই তুলে আনতে পারে কিন্তু সে ইতস্তত করছে কারণ 'এখন ইংরেজী আইন বিষদাত ভাঙ্গা।'[১১৩] আর 'আইনের বেড়াজাল যে কত বিস্তার করেছে তা বোঝা যায় এই উক্তিতে, 'কোণের বউ পর্যন্ত আইন আদালতের খবর রাখে। হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুয়িটি আর কমনলর মারপ্যাঁচ বোঝে।'[১১৪]

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় প্রজা বলে, 'নিজেরা অশক্ত হইলে রাজদ্বার খোলা আছে। তখন রাজার আশ্রয় লইব। দেশের হাকিমের নিকট জানাইব—রক্ষা কর বলিয়া গলবস্ত্রে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইব।'[১১৫]

শাসকের আদর্শ বা তাদের আধিপত্য কি ভাবে বুদ্ধিজীবীরা বিস্তৃত করছে তার পরিচয় পাওয়া যায় গ্রন্থকার কর্তৃক রায়তের চরিত্র চিত্রণে। নীলদর্পণের তোরাপের মতই এখানে রায়ত নমিত। নুরন্নেহার ধর্ষিত হয়, প্রজা প্রহৃত হয়, কিন্তু তারা রুখে দাঁড়ায় না বরং ভারতেশ্বরী ও তাঁর আইনের প্রতি এদের শ্রদ্ধা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। তাই মৃত্যুপথ যাত্রী নুরন্নেহার বলে, 'শুনেছি যে মহারাণী সকলের উপরে বড়, সাহেবদের উপরেও বড়। আমরা যেমন প্রজা তেমনি তুমিও তার প্রজা। তিনি কি এর বিচার করবেন না? প্রজা বলে কি তার দয়া হবে না? মা। তুমি বেলাতে থাক। তোমার প্রজার প্রতি এত দৌরাত্ম্য হচ্ছে তুমি কি জানতে পাচ্ছো না? কেবল বড় বড় লোকই কি তোমার প্রজা? আমরা গরীব বলে তুমি কি আমাদের মা হবে না'?[১১৬] মধ্যশ্রেণীর যে বিশ্বাস বৃটিশ রাজই আইনের রক্ষক তা আর টলে না।

এখানে রায়তকে করে তোলা হয়েছে অদৃষ্টবাদী। সবই তার কাছে নসিবের দোষ।[১১৮] নিরস্ত্র লাল পাগড়ী দেখে জবরদস্ত লাঠিয়ালরা ভয়ে কাঁপে, পালায়, রায়তরাও ভালো খারাপ ইংরেজের মধ্যে পার্থক্য টেনে, ভালো ইংরেজের পক্ষ সমর্থন করে বলে, ইংরেজদের কথার মূল্য অনেক। তারা যা বলে তাই করে।[১১৭] আসলে নিজেকে সমর্থনের জন্যেই বুদ্ধিজীবী কৃষকের পক্ষ সমর্থন করতে চায় কিন্তু একটা মাত্রা পর্যন্ত। তাই রায়তরা খানিকটা প্রতিবাদ জানায় একটা মাত্রা পর্যন্ত, কিন্তু

বিদ্রোহ করে না। যে মীর নীলকরের পক্ষে, প্রজারা তাকেও রেহাই দেয়। শুধু তাই নয়, প্রজারা যে কত নমিত তা বোঝা যায় যখন পূর্বের অত্যাচার সম্পর্কে তারা মন্তব্য করে, এ বলে যে, 'যা হবার হয়েছে।'[১১৯] এমনকি কুচক্রী জমিদার সা গোলামও একসময় প্রজার মুরুব্বী হয়ে ওঠে। এক কথায় ঔপনিবেশিক কাঠামোতে বুদ্ধিজীবীর কাজই হয়ে ওঠে, চিন্তার জগতে শাসকের আধিপত্য বিস্তারের জন্যে সক্রিয় হয়ে ওঠা। মীর মশাররফ হোসেন তাঁর আমলের অনেক ঔপন্যাসিক নাট্যকারের মত একটি উদাহরণ মাত্র।[১২০]

ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের ফলে যে আদর্শ গড়ে উঠেছিল এবং যারা এর চর্চা করেছিলেন তাদের সামনে আদর্শগত বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। এর মধ্যে প্রধান ছিল স্ববিরোধিতা। এক পর্যায়ে যিনি প্রগতিশীল পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায় তিনিই হয়ে উঠেছেন রক্ষণশীল। যেমন, কালী প্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০)। একসময় মেতে উঠেছিলেন তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলন নিয়ে, ছিলেন পূর্ব্ব বঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজের এক অন্যতম নেতা। কিছু দিন পর দেখা গেল আশ্রয় নিয়েছেন তিনি হিন্দু ধর্মে এবং লিখেছিলেন, জাতিভেদ হচ্ছে 'মহতী জাতিভেদ পদ্ধতি'।[১২১] ধরা যাক মীর মশাররফ হোসেনের কথা (১৮৪৮-১৯১১) প্রথম জীবনে তিনি লিখেছিলেন 'জমিদার দর্পন' (১৮৭৩), 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০), 'গো-জীবন' (১৮৮৮) বা 'গাজীমিয়ার বস্তানী' (১৮৯৯) যেগুলি কোনভাবেই ধর্মভিত্তিক ছিল না। কিন্তু জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি লিখছেন, 'মৌলুদ শরীফ' (১৯০৫), 'মদিনার গৌরব' (১৯০৬)', 'মোস্লেম বিজয়' (১৯০৮) বা 'ইসলামের জয়' (১৯০৮)—যেগুলি ধর্মভিত্তিক। এককথায় বলা যেতে পারে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও ছিল সংঘাত এবং মনে হয় সে কারণেই মূলত ব্যক্তি বিকশিত হতে পারেনি পুরোপুরি।

ঐ একই কারণে আমরা দেখি, ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনে যুক্তি ব্যবহৃত হয়েছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে বা ধর্মকে আধুনিক করে তোলার জন্যে (এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গ্রামে বা মফস্বলে ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবী হিসেবে মোল্লামৌলবী বা পুরোহিতের প্রভাব অনস্বীকার্য। তারা যে শিক্ষা দেন প্রাথমিক অবস্থায় নিশ্চয় মনের গড়নে প্রভাব বিস্তার করে থাকে তা আজীবন)। পাশ্চাত্যের অভিঘাতের ফলেই

বুদ্ধিজীবীরা ইউরোপীয় আদর্শের আলোকে সব ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় আদর্শ, উপনিবেশে এসে দিকভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল। প্রায় সবকিছুই তখন ধর্মীয় আলোকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং বোধহয় সে কারণেই পূর্ববঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতা বিকশিত হয়নি। বরং যারা বুদ্ধির চর্চা করেছেন, তারা জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে মীরমশাররফ হোসেন বা কালী প্রসন্নের কথাতো আগেই উল্লেখ করেছি। এ পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমার আলোচ্য সময়ে দেখা যায়, মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের অনেকে যেমন, রেয়াজ আল-দিন আহমদ মাশহাদি (১৮৫৯-১৯১৩), রেয়াজউদ্দিন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩), মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী (১৮৭৪-১৯৫০), মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০) প্রমুখ, ইসলামের 'ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সমাজনীতি'র ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এবং আগ্রহ দেখিয়েছিলেন শিক্ষার প্রতি। তারা চেষ্টা করেছিলেন, 'যুক্তি ও তর্কের আলোকে পুরনো বিশ্বাস'কে বাতিল করে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক স্থাপনের।[১২২] ঐ সময়ের হিন্দু মালিকানায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতেও, হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে একই ধরনের মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছিল যা আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে।

অন্যদিকে, গ্রামাঞ্চলে গ্রামীণ বুদ্ধিজীবীরা ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন অন্যভাবে। গ্রামাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারকারী মোল্লা মৌলবীরা ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রদানের জন্যে বাহাস বা ওয়াজের আয়োজন করতেন। সেখানে জোর দিতেন তারা ইসলামের শুদ্ধিকরণের ওপর। একই সঙ্গে তারা আবার ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ বা পুরনো 'ইনিসটিটিউশন'কে গড়তে চেয়েছিলেন নতুন ভাবে।[১২৩] পাশ্চাত্য শিক্ষায় ছিলেন যারা শিক্ষিত এবং ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে ছিলেন যারা জড়িত-উভয়ই ধর্ম সম্পর্কিত ব্যাখ্যার, মনোভাবের হয়ত খানিকটা তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু দু'পক্ষেরই মূলে ছিল ধর্ম যার পুণর্মূল্যায়নে ছিলেন তারা উৎসাহী।

আগেই উল্লেখ করেছি ঔপনিবেশিক কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন ইংরেজরা। সম্প্রদায় হিসেবে এর পরের স্তরে ছিলেন হিন্দু এবং সবশেষে মুসলমানরা। পূর্ববঙ্গে মুসলমানরা সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় হওয়া সত্বেও

তারা অধস্তন ভূমিকা পালন করে গেছেন। রাষ্ট্রীয় কাঠামো বা রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা থেকে সামগ্রিকভাবে মুসলমানরা ছিলেন অনেক দূরে। এ ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন হিন্দুরাই। ফলে সম্প্রদায়-গতভাবে হিন্দুদের এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে মুসলমানদের দূরত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ধর্মীয় পুনর্জাগরনের সময় দু'সম্প্রদায়ই চোখ ফিরিয়েছিল তাদের ঐতিহ্যের দিকে। কিন্তু উপনিবেশে আদর্শগত সমস্যা সবকিছুকে আরো জটিল করে তুলেছিল।

ঐতিহ্য আবিস্কার করতে গিয়ে হিন্দুরা প্রাচীনকালের ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে তুলেছিলেন এবং ঔপনিবেশিক শাসনে যে তারাই সম্প্রদায়গত ভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে আছেন একথা বলতে তারা ভুললেন না। বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষ তিনদশকের হিন্দু পরিচালিত পত্র পত্রিকাগুলি যেমন, 'ঢাকা প্রকাশ' 'হিন্দু রঞ্জিকা' প্রভৃতিতে এ মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছিল ঘুরেফিরে—আক্রমনাত্মক এবং উদ্ধতভাবে। মধ্যযুগে ভারতে আগত মুসলমানদের তারা চিহ্নিত করে ছিলেন আক্রমণকারীরূপে[১২৪] কিন্তু ইংরেজরাও যে আক্রমণকারী এবং শাসক ও লুটেরা[১২৫]—সে সব কথা তারা ভুলে গিয়েছিলেন। বংকিম-চন্দ্র, রমেশচন্দ্র বা ভূদেব এঁদের সব রচনাতেই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য, ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করা হয়েছে।

অন্যদিকে মুসলমানরা ঐতিহ্য খুঁজতে গিয়ে নিজেদের আবিস্কার করেছিলেন আগন্তুক হিসেবে এবং ঔপনিবেশিক আমলে দেখা গেল, তারা শুধু রায়ত এবং রায়ত হিসেবে তিনি কোন মর্যাদার অধিকারী নন। তখন তিনি আবিস্কার করেছিলেন নিজ সম্প্রদায় এবং নিজ ঐতিহ্য খুঁজে পেয়েছিলেন ইরান তুরানে। আমার আলোচ্য সময়ের মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলিতে এ বক্তব্যই বারবার ঘুরে ফিরে এসেছিল। ফলে, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ক্ষেত্রে দু'সম্প্রদায়ই বেছে নিয়েছিলেন স্বতন্ত্র পথ। এবং দেখা গিয়েছিল, হিন্দু পুনর্জাগরণ আর মুসলিম প নর্জাগরণবাদ পূর্ণোদ্যমে স্বতন্ত্র লক্ষ্যের পথ ছুটে গেল।'[১২৬]

সবশেষে, বলা যেতে পারে, ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনে শ্রেণী এবং সম্প্রদায়গত কাঠামোর সমস্যা সবসময় থেকে যায়। এই কাঠামোয় সমাজ গঠন অপরিণত বলে ব্যক্তি প্রধানতঃ সম্প্রদায়ের সংলগ্ন, শ্রেণীর

সঙ্গে নয়। তাই সে সব সময় শ্রেণীর বদলে আবিস্কার করে সম্প্রদায়। এ কারণেই ব্যক্তির বাস্তব অভিজ্ঞতা তাৎক্ষণিক, প্রত্যক্ষ, বিষয়ী। সে জন্যে ব্যক্তির পক্ষে স্বার্থকে ব্যক্তি সম্পর্ক রহিত করে সমাজ ও শ্রেণী কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করে চিন্তা করা সম্ভব হয় নি। ব্যক্তি অত্যাচারী, এ সত্য যত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার কাছে তত স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি যে, এ সব কিছুই বর্তমান ব্যবস্থা থেকেই উৎসারিত। ঔপনিবেশিক কাঠামোর পরপারে যে শক্তির অবস্থান তার প্রতি আবেদনের প্রশ্ন বারবার দেখা দিয়েছে কিন্তু গণআন্দোলনের চিন্তা করেনি (বা সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবীতে পরিণত হতে পারেনি)। সুতরাং 'নীল দর্পণ' বা 'জমিদার দর্পণ' ব্যক্তিক প্রতিক্রিয়ারই ফলাফল।

তথ্য নির্দেশ

১. আনিসুজ্জামান, "মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য," ঢাকা, ১৯৬৪, পৃঃ ৫ (ভূমিকা)।

২. উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিষয়ের ওপর ইংরেজ সিভিলিয়ানদের অনেক লেখা আছে। এখানে হান্টারকে উদাহরণ হিসেবে নিয়ে তাঁর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে বেশী। কারণ বাংলা প্রদেশের ওপর হান্টারের রচনা সংখ্যা ছিল সম্ভবত সবার ওপরে।

৩. E.T. Stokes, 'The Administration and Historical Writing of India', C.H. Philips (ed), *Historians of India, Pakistan and Ceylon*, London, 1961, p. 403.

৪. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, Muhammad Delwar Hussain, "Some Aspects of Henry Beveridges History of Bakarganj", *Bangladesh Historical Studies*, Vol. IV, 1979, pp. 93-94. হান্টারের *England Works in India* গ্রন্থেও একই বক্তব্য প্রতিধ্বনিত হয়েছে, পৃঃ ৯১।

৫. ঐ, পৃঃ ৯০।

৬, Roger Owen, 'Imperial Policy and Theories of Social Change : Sir Alfred Lyall in India' Talal Asad (ed), *Anthropology and the Colonial Encounter*, London, 1973, p. 223.

৭. দেলোয়ার হোসেনের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ৯১।

৮. ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, "পল্লীবাংলার ইতিহাস," (The Annals of Rural Bengal গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। ওসমান গণি অনূদিত), ঢাকা ১৯৬৯, পৃঃ ৪-৫।

৯. ঐ, ৭। 'ইণ্ডিয়ান মুসলমান' লেখার সময় প্রুফ দেখাকালীন হান্টার এক চিঠিতে তাঁর প্রকাশককে জানিয়েছিলেন, যারা এই বইয়ের প্রুফ দেখেছেন তাঁরাই বলেছেন, সাম্রাজ্যের জন্যে এটি একটি বিশেষ সেবামূলক কাজ। এখানে উল্লেখ্য, সরকারী মহলে তিনি ছিলেন প্রভাবশালী এবং মুসলমানদের প্রতি ভবিষ্যত সরকারী নীতি কি হবে তিনি তা আঁচ করতে পেরেছিলেন এবং তাই মাত্র তেরদিনে (মতান্তরে একমাস) বইটি লিখে ফেলেছিলেন। সুতরাং এ বই লিখে একটি জনমত সৃষ্টি করে, সরকারী নীতি বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিয়েছিলেন মাত্র। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দেখুন, Muhammad Delwar Hussain 'Life and Works of Sir William Wilson Hunter (1840-1900)' *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, August 1977, Vol XXI, No 2.
১০. রজার ওয়েন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৭-৩৩।
১১. Alfred Lyall, 'The Religious Situation in India,' quoted in Roger Owen, *op cit*, p. 236.
১২. রজার ওয়েন, ঐ, পৃঃ ২৩৮।
১৩. Sekhar Bandyopadhyay, *Caste, Class and Census : Aspects of Social Mobility under British Rule in the Late Nineteenth and Early Twentieth Century Bengal*, 1872-1931, (Centre for Southeast Asian Studies, University of Calcutta, Monograph), pp. 2-3.
১৪. *Census 1891*, p. 271.
১৫. ঐ, পৃঃ ১৬৮।
১৬. *Census 1901*, p. 461.
১৭. দেখুন, Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy*, London, 1971.
১৮. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫৩।
১৯. যেমন তিনি লিখেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছিল ১৯২০ সালে, (পৃঃ ৮) খাজা আহসানউল্লাহ ইন্তেকাল করেছিলেন ১৯১৯ সালে (পৃঃ ৬৯) বা শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক ছিলেন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক (পৃঃ ৩১৪)। কিন্তু সঠিক তথ্য হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছিল ১৯২১ সালে, খাজা আহসানউল্লাহ ইন্তেকাল করেছিলেন ১৯০১-এ, এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ভোলার কবি মোজাম্মেল হক। তিনি উল্লেখ করেছেন জামালউদ্দিন আফগানী ছিলেন মিশরের ইত্যাদি। এমনকি মীর মশাররফ হোসেনের 'গাজীমিয়ার বস্তানী' সম্পর্কেও বিভ্রান্তিকর, ভুল তথ্য দিয়েছেন (পৃঃ ১০৮)।

২০. সুপ্রকাশ রায়, "ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম", কলকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ৩৪৬।
২১. Wan Hashim, 'The Political Economy of Peasant Transformation. Theoretical Framework and a Case Study', *The Journal of Social Studies* (এরপর শুধু JSS নামে উল্লিখিত হবে) No 10, October, 1980, p 49.
২২. Hamza Alavi, 'The Colonial Transformation in India', *JSS*, No. 8, April, 1980, p 58.
২৩. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন—Hamza Alavi, 'Structure of Colonial Formation', *Economic and Political Weekly*, Annual Number, March, 1981 and Hamza Alavi, 'Colonial Transformation in India,' *JSS*, No. 7, January, 1980.
২৪. ওয়ান হাশিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫২।
২৫. Hamza Alavi, 'India and the Colonial Mode of Production' Ralph Miliband and John Saville (eds) *The Socialist Registrar 1975*, London 1975 ; এবং বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন *Economic and Political Weekly* প্রকাশিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।
২৬. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'বাংলাদেশে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ', "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা," পঞ্চম সংখ্যা জুন ১৯৭৭।
২৭. আলাভী, "সোস্যাল রেজিষ্ট্রারে" প্রকাশিত প্রবন্ধ, পৃঃ ১৮৫।
২৮. ঐ, পৃঃ ১৮৬।
২৯. ঐ, পৃঃ ১৮৬-১৮৭।
৩০. S. Nurul Hasan, 'The Position of the Zemindars in the Mughal Empire', Indian Economic and Social History Review I, Quoted in Alavi, *JSS*, No. 7, pp 19-20.
৩১. ঐ, পৃঃ ২০-২১।
৩২. ঐ, নং ৮, পৃঃ ৪৮।
৩৩. আলাভী, "সোশাল রেজিষ্ট্রারে" প্রকাশিত প্রবন্ধ, পৃঃ ১৮৭।
৩৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্যে, প্রেমেন আড্ডি ও ইবনে আজাদ সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ এবং মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙ্গালী সমাজ," ঢাকা, ১৯৭৫।
৩৫. আবদুর রাজ্জাক, 'উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মন' (মাহমুদ রশীদ অনূদিত), "বক্তব্য," ২ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, পৃঃ ২।
৩৬. Romesh Dutt, *The Economic History of India* (1957-1837), London, 1901, p 94.

৩৭. নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ, "বাংলার অর্থনৈতিক জীবন," কলকাতা, ১৯৬৭, পৃঃ ৮৫।

৩৮. ঢাকার নবাবরা জমিদার হওয়ার আগে ছিলেন ব্যবসায়ী। ঢাকার আর্মেনী জমিদার যেমন পোগজ বা মানুক—এরাও ছিলেন লবনের ব্যবসায়ী। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, ভাগ্যকূলের রায় পরিবার লবনের ব্যবসা করে প্রচুর বিত্ত অর্জন করেছিলেন এবং জমিদারী কেনা শুরু করেছিলেন। ঐ আমলে তাঁরা ছিলেন পূর্ববঙ্গের বেশ প্রভাবশালী পরিবার। বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, দেবেন্দ্রনাথ দে, "ভাগ্যকুল রায় পরিবার," ঢাকা, (প্রকাশের তারিখ নেই)। পূর্ববঙ্গের বনেদী জমিদাররা ছিলেন-ভুষনা, নাটোর দিঘাপাতিয়া, তাহিরপুর, আটিয়া এবং মুক্তাগাছার।

৩৯. Karl Marx, Notes on India History, উদ্ধৃত হয়েছে সুপ্রকাশ রায়, "ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম," কলকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ১৩৯।

৪০. সিরাজুল ইসলাম, 'পত্তনী প্রথা ও মধ্যস্বত্ব সমস্যা', "বাংলাদেশের ভুমি ব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা," ঢাকা, পৃঃ ৮৮। ১৯৭২ এর আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলার ২৭টি জেলায় জমিদারীর সংখ্যা ছিল ৩৭২৩৪টি। তার মধ্যে পূর্ববঙ্গে (যশোর, দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা) এর সংখ্যা ছিল ২৪৯৩২টি। পূর্ববঙ্গে জমিদারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী ছিল চট্টগ্রামে ৫০০৪টি। ঐ আদমশুমারীতে কৃষক ও জমিদারের মাঝে উপস্বত্বের দেওয়া তালিকা থেকে পূর্ববঙ্গের এ তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। কোন অঞ্চলের কোন স্তরের সংখ্যা বেশী তা বন্ধনীতে দেওয়া হয়েছে।

জমিদার	২৪৯৩২
ইতমামদার	৫৮৬ (একমাত্র চট্টগ্রামে)
তালুকদার	১৭২ (সিলেটেই ১৬৮ জন)
ইজারাদার	২৩৪৩ (ত্রিপুরাতেই ১০৮৮ জন)
লাখেরাজদার	১১,১৪১ (সিলেটেই ৮৮৮৫ জন)
জায়গীরদার	২৯ (রাজশাহীতেই ২৬ জন)
ঘাটোয়াল	৬০ (একমাত্র যশোরে)
তালুকদার	৫২,১৯৫ (চট্টগ্রামে ১৬,৩০০ জন)
পত্তনিদার	১৭৮২ (সিলেটে ৫৭৩ জন)
মহলদার	১২০ (নোয়াখালীতে ২১ জন)
জোতদার	৫৮২৫ (যশোর ৫৬৯৭)
গাঁতিদার	৯৬৭ (একমাত্র যশোরেই)
হাওলাদার	২১ (ঐ)

গোমস্তা	৮৪৫২ (চট্টগ্রামে ১৮০৬)
তহশীলদার	৮৪৮৫ (ঢাকা ২০৬৬)
পাটোয়ারী	৮৩৯ (দিনাজপুরে ২৪৬ জন)
পাইক	৯৭৫৫ (রাজশাহীতে ১৭৭০)
জমিদারের ভৃত্য	৩৬৭৫ (সিলেটে ২১৮৬। কিন্তু আদমশুমারীতে উল্লিখিত হয়েছে নোয়াখালীতে এর সংখ্যা মাত্র ১ জন। তা কি ভাবে সম্ভব ?)
দফাদার	৩০ (পাবনা ২২ জন)
দেওয়ান	৫০ (ঢাকায় ৩০ জন)
মণ্ডল	১১৯৭ (ময়মনসিংহে ৪৮৩ জন)
নায়েব	৭৪ (পাবনা ২৪ জন)
এস্টেট ম্যানেজার	১৮ (বাখরগঞ্জ ৯ জন)

বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, *Census 1872.*

৪১. সিরাজুল ইসলামের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ৯২।

৪২. Sirajul Islam, *The Permanent Settlement in Bengal : A Study of its Operation, 1790-1819,* Dacca 1979, p. 4.

৪৩. নতুন জমিদাররা ছিলেন পেশাদারী করসংগ্রাহক। পালিতের মতে জমিদারী পরিণত হয়েছিল অনেকটা পেশায়, Chittabrata Palit, *Tensions in Bengal Rural Society,* Calcultta, 1975, p. 19.

৪৪. বড়-ছোট সব ধরনের জমিদাররা প্রায় ক্ষেত্রেই ছিলেন আঞ্চলিক মহাজন যারা টাকা বা ধানের মহাজনী কারবার চালাতেন, ঐ, পৃঃ ২০।

৪৫. এ পরিপ্রেক্ষিতে দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। গনিউর রাজা ছিলেন সিলেটের ছোটখাট জমিদার। ১৮৯৩ থেকে ১৯০৫ এর মধ্যে পাঁচবার সিলেট থেকে তিনি ঢাকা এসেছিলেন শুধুমাত্র বারাঙ্গনা নিয়ে ফুর্তি করতে। প্রতিবারই টাকা শেষ হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বেশ কিছুদিন কাটাতেন তিনি বারাঙ্গনাপূর্ণ ঢাকা শহরে (১৯০১ সালের সরকারী হিসাব অনুযায়ী, ঢাকায় বসবাসরত ৯০,৫৪২ জনের মধ্যে ২১৬৪ জন ছিল বারাঙ্গনা)। ঢাকায় তিনি একবার দেখেছিলেন, নবাব আহসানউল্লাহ একদিনে বেলুন উড়িয়ে খরচ করেছিলেন দশহাজার টাকা। বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, দেওয়ান গনিউর রাজার রোজনামচা থেকে, "বিচিত্রা," ৭ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮।

৪৬. সেখ আবদোস সোবহান, "হিন্দু মোসলমান," ঢাকা, ১৮৮৯, পৃঃ ৪৮।

৪৭. টেরিটোরিয়াল ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী হল্ট ম্যাকেঞ্জি লিখেছিলেন, ১৮২০ এর মধ্যে বাংলার অনেক ধনী জমিদার শহরে এসে আস্তানা গেড়েছিলেন। এবং 'the Bengal Baboos and persons of that description, who now appear to be the principal Zemindars, are as much

foreigners in their habits and pursuits to the cultivating classes as we are. They-live in cities and towns far away from their Zemindarees, and know less of the people than either our Judges or collectors who live amongst them.' J. Sutherland, Sketches of the Relation Subsisting between the British Government and the different native states, p. 14, Quoted in S, Islam, *Permanent Settlement in Bengal*, p. 221.

৪৮. ঐ।

৪৯. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal, Vol. V* (Reprint) Delhi, 1973, pp. 214, 333, 458. এ হিসেব ১৮৭০-১৮৭৩ সনের।

৫০. রাধারমন সাহা, "পাবনা জেলার ইতিহাস," ৩ খণ্ড, পাবনা ১৩৩৩, পৃঃ ১৬৩-১৬৪।

৫১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্গদেশের কৃষক' "বঙ্কিম রচনাবলী" (সাহিত্য সংসদ) দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৪, পৃঃ ২৯১-২৯৪।

৫২. "ঢাকা প্রকাশ" ১ম বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ১১ আশ্বিন, ১২৬৮ ; ১৮২০ সালে পটুয়াখালীর এক গ্রামে রায়তদের নিম্নলিখিত হারে জমিদারকে আবওয়াব দিতে হত—

খোদ নজর বা জমিদারকে উপহার	প্রতিজমায় চার টাকা
নায়েব নজর বা নায়েবকে উপহার	প্রতি জমায় দু'টাকা
তহুরী বা বিবিধ	প্রতি টাকায় এক আনা
রোশান বা জমিদারীর বাড়ী ও	
কাচারীতে দীপ জ্বালাবার জন্যে	প্রতি কড়া জমিতে এক আনা
ভাণ্ডারী এবং মহুরী	প্রতি জমায় বারো আনা
দাখিলা বা দখলি চার্জ	প্রতি জমায় দু'আনা
পেয়াদা এবং মৃধা	প্রতি জমায় তিনটাকা
মাতবরী বা গ্রামের প্রধানদের জন্যে	প্রতি জমায় এক টাকা

S. Islam, *Permanent Settlement in Bengal*, p. 224.

৫৩. প্রমথ চৌধুরী, "রায়তের কথা," কলকাতা, ১৯৪৪, পৃঃ ২৫।

৫৪. এ পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন Kalimohan Chowdhury, *The Traditional History of My Family*, Rajshahi, 1913.

৫৫. ১৮৮৬ সালের লোকাল বোর্ড নির্বাচনে পুরো বাংলায় জমিদার সদস্যের শতকরা হার ছিল ৫১ ভাগ। এখানে শুধু পূর্ববঙ্গের তালিকা দেওয়া হল। পুরো বাংলার হিসাব উল্লিখিত হয়েছে—Bengal Administration Report 1887-88, p. 69, উদ্ধৃত হয়েছে, Rokeya Rahman Kabeer,

Administrative Policy of Government of Bengal 1870-1890, Dacca, 1965, p. 55.

৫৬. এখানে যদিও শুধুমাত্র মুসলমান প্রতিনিধিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তবুও জমিদারদের প্রভাব প্রতিপত্তি বোঝার জন্যে এটা যথেষ্ট। উৎস: Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal*, Appendix-C থেকে পূর্ববঙ্গের জন্যে আলাদাভাবে হিসাব করা হয়েছে।

৫৭. R. Palme Dutt, *India Today*, Bombay 1949, p, 219.

৫৭ক ১৮৮৩ সালে সরকার 'বেঙ্গল টেনান্সি বিল'এর প্রস্তাব করলে এর বিরুদ্ধে জমিদার ও জমিদারপক্ষীয়দের অনেক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ ধরনের কয়েকটি পুস্তিকার কথা উল্লেখ করছি। যেমন—Ashutosh Mookerjea; *An Examination of the Principles and Policy of the Bengal Tenancy Bill*, Calcutta, 1884 ; Peary Mohun Mookerjea (compiled), *Opinion of Mofussil Landholders on the Bengal Tenancy Bill*, Calcutta, 1883 ; Keshub Chunder Acharya, *Strike but Hear*, Mymensingh, 1881 ; *Publications of London Committee formed to Oppose the Bengal Tenancy Bill* (প্রকাশ স্থল ও তারিখের উল্লেখ নেই) ; Roper Lothbridge, *The Mischief threaterned by the Bengal Tenancy Bill*, London, 1883 ; Parbati Charan Ray, *The Rent Question*, Calcutta, 1881.

৫৮. Tarini Das Bannerji (compiled) *The Zemindars and the Ryot in Bengal*, Calcutta, 1883, p. 42.

৫৯. নবাব আবদুল গনির দানের একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল। পাঁচহাজার টাকার কম দান এ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে—

জলের কল বাবদ	২০০০০০
মক্কার 'জবিদা' খাল সংস্কারে	৪০০০০
১৮৬৭ সালের দুর্ভিক্ষে সাহায্য	১০০০০
১৮৮৫ সালের জল প্লাবনে সাহায্য	১০০০০
১৮৬৪ সাল ঝড়ে সাহায্য	৫০০০
১৮৬৭ সাল ঝড়ে সাহায্য	৫০০০
ফরাসী জার্মান যুদ্ধে আহতদের জন্যে	৫০০০
ঢাকা মাদ্রাসার জমি ক্রয়ে	৫৫০০
লেডী ডফরিন ফাণ্ড	১০০০০
বাকল্যাণ্ড বাধ	৩৫০০০
রুষ তুর্কী যুদ্ধে আহতদের জন্যে (১৮৮৭)	২০০০০
১৮৮৭ সালে বরিশাল শহরের জন্যে	৫০০০

১৮৭৪ সালে বরিশালে দুর্ভিক্ষ	৫০০০
১৮৭৬ সালে বরিশালে ঝড়ে	৫০০০
কাশ্মীরে ভূমিকম্পে আহতদের সাহায্যার্থে	১৫০০০
ডিউক অব এডিনবরার আগমনে	১২০০০
কলকাতার চিড়িয়াখানায়	১১৩০০
আটিয়ার প্রজাদের সাহায্যার্থে	১০০০০
মেঃ মানিকজির মারফত নানা বিষয়ে	৩৮০০০
সুসঙ্গের মহারাজকে	৫০০০
রামচন্দ্রহরের মসজিদ ও ঘাটে	১০০০০
কুমিল্লা শহরে আলোর জন্যে	৫০০০
মিটফোর্ড হাসপাতাল	২৫২৪৫
প্রথমবার ৪০ জন মক্কাযাত্রীর সাহায্যে	৯০০০
ঢাকার টর্নেডো সাহায্য সমিতিতে	১০০০০
দ্বিতীয়বার ৪০ জন মক্কাযাত্রীর সাহায্যার্থে	৯০০০
প্রিন্স আলবার্টের অভ্যর্থনা কমিটিতে	৫০০০
তৃতীয়বার মক্কাযাত্রী ৪০ জনকে	৯০০০
চতুর্থবার মক্কাযাত্রী ৪০ জনকে	৬৮০০
সাহআলী সাহেবের দর্গার রাস্তায়	১০০০০
কুমিল্লার আকিকননেসাকে	৬৪৪০
ত্রিপুরা সুন্দরীর কর্জ রেয়াৎ	১০৯৪৪
জুবিলি মেমোরিয়াল ফাণ্ডে	৫০০০
ঢাকার ইমামবড়া মেরামতে	২০০০০

এখানে উল্লেখ্য যে, ঢাকা শহরের জন্যে এককালীন দু'লক্ষ টাকা দান ব্যতীত অধিকাংশই ঔপনিবেশিক শাসকের সম্মানার্থে বা ধর্মীয় কাজে ব্যয় হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে দান নগন্য। আরো উল্লেখ্য যে, ঢাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, ঢাকা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মওলানা ওবেদুল্লা ওবেদীর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা ও অনাথ শিশুদের সাহায্য করা হয়েছে ১৬৫৬ টাকা। কিন্তু জনৈক ত্রিপুরাসুন্দরীর ১০৯৪৪ টাকা কর্জ রেয়াৎ করে দেওয়া হয়েছে। "ঢাকা প্রকাশ," ৩০. ৮. ১৮৯৬।

৬০. A. R. Desai, *Social Background of Indian Nationalism*, Bombay, 1976, p. 308.

৬১. Barun De, 'Susobhan Chandra Sarkar,' *Essays in Honour of Prof. S.C. Sarkar*, New Delhi, 1976, p. XXI.

৬২. F.H.B. Skrine, *Memorandum on the Material Condition of the Lower Orders in Bengal during the ten years from 1881-82 to 1891-92*, Calcutta, 1862, p. 15.

৬৩. (লেখকের নাম নেই) "স্বর্গীয় রাধানাথ চৌধুরীর জীবনচরিত," কলকাতা, ১৩১৬।

৬৪. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, আদিনাথ সেন, "স্বর্গীয় দীনানাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ" (তিনখণ্ড ; প্রথমখণ্ড, কলকাতা, ১৯৪৮), বা বঙ্গচন্দ্র রায়, "আত্মজীবনী" (প্রকাশের স্হান ও তারিখ নেই)।

৬৫. হিন্দুরঞ্জিকা, ২৪. ৭. ১৮৭৮, *Report on Native Papers* (এরপর *RNP* নামে উল্লেখ করা হবে). নং ১৩, ১৮৭৮।

৬৬. চাকুরিজীবীরা যে বাণিজ্যের জন্যে কিছু কিছু উদ্যোগ নেন নি তা'নয়, কিন্তু সেগুলি খুব সম্ভব উদ্যোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। সত্তরদশকের পাঁচটি কোম্পানীর 'মেমোরেনডাম' দেখলে তাই মনে হয়। এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তারা বন্ধকী বা মহাজনী ধরনের ব্যবসায় উৎসাহী। শিল্পে নয়। পুঁজি সবারই বিশহাজার টাকা। যেমন—ময়মনসিংহ লোন অফিস লিঃ (১৮৭১)—উদ্দেশ্য বন্ধকী ব্যবসা করা। ময়মনসিংহ গ্রেট ইস্টারণ বেঙ্গল কোম্পানী লিঃ (১৮৭৪)—উদ্দেশ্য—'জীবনোপায়ের স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করা।' কিন্তু মেমোরেনডাম পড়লে মনে হয় পূর্বোক্তটির মতই ছিল এর লক্ষ্য। বগুড়া ট্রেডিং কোম্পানী লি: (১৮৭৭)—উদ্দেশ্য বাণিজ্য। ইস্ট বেঙ্গল মার্কেন্টাইল কোম্পানী লিঃ (১৮৭৭)—উদ্দেশ্য বাণিজ্য। কিন্তু নিয়মপত্রের একটি ধারায় লেখা ছিল—'চর্ম্ম, কি চর্ম্ম নিমিত দ্রব্য, সর্ব্ববিধ মাদক দ্রব্য, বিলাতীয় কি দেশীয় মাংসজ খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম বিরুদ্ধ' কোন কিছুর ব্যবসা করা যাবে না। ব্যবসায় ধর্ম টেনে আনলে তার পরিণতি কি হয় তা অনুমান করা যেতে পারে। এ ধরনের উদ্যোগ মধ্যবিত্ত অনেক নিয়েছে কিন্তু কোনটিই গড়ে উঠতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ। দেখুন—"শহর ময়মনসিংহ গ্রেট ইস্টারণ বেঙ্গল এক্সচেঞ্জ কোম্পানী লিমিটেড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েসন', অর্থাৎ "নিয়মপত্র." ময়মনসিংহ, ১৮৭৪। "সিলেট কলটিবেটিং কোম্পানী লিমিটেড সংস্থিটির নিয়মপত্র," কলকাতা, ১২৮১। "ইস্ট বেঙ্গল মার্কেন্টাইল কোম্পানী লিমিটেড সংস্থিটির নিয়মপত্র," ঢাকা, ১৮৭৭। "ময়মনসিংহ লোন আপিস লিমিটেডের আর্টিকেলস অব এসোসিএসন অর্থাৎ নিয়মপত্র", কলকাতা, ১২৮০। "বগুড়া ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড আর্টিকেলস অব এসোসিএসন অর্থাৎ নিয়মপত্র," কলকাতা, ১৮৭৭।

৬৭. বিশদ বিবরণের জন্যে দেখুন—*Annul Report of the College of Hadji Mohammad Mohsin with its subordinate schools ; and of the Colleges of Dacca and Kishnaghur.* তিন বছরের রিপোর্ট, ১৮৪৭-৪৮ (কলকাতা, ১৮৪৯) ১৮৪৯-৫০ (কলকাতা ১৮৫০) এবং ১৮৫১-৫২ (কলকাতা ১৮৫২)।

৬৮. দেশাই, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৮। আইন ব্যবসার এই প্রসারতার জন্যেই হয়ত

অনেকে বিশেষ করে ইংরেজ সিভিলিয়ানরা বাঙ্গালীদের মামলাবাজ ও ধূর্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বাংলার গ্রামীণ বাসিন্দাদের সংখ্যা অনুপাতে মামলার সংখ্যা ছিল অনেক কম। ১৮৭৪ সালে বাংলার লোক-সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে তিনকোটি আর অন্যদিকে দিওয়ানী মামলার সংখ্যা ছিল ১৩৪,৩৯৩। অর্থাৎ ২৬১ জন লোকে একটি মামলা। 'আবার লোকের আয়ু যদি উর্ধহারে ৩৫ বছর ধরা হয় তা'হলে দেখা যাবে যে, সাতজন লোকের মধ্যে ছয়জন দেওয়ানী আদালতের সংগে কোনও সংশ্রবে না এসেই জীবন কাটিয়ে দেয়।' আবদুল মওদুদ, 'আঠারো শতকের বাঙ্গলা দেশে বিচার ও শান্তিরক্ষা', ''ইতিহাস'', ১ম বর্ষ ২ সংখ্যা, ভাদ্র-অগ্রহায়ন ১৩৭৪, পৃঃ ১২৪।

৬৯. Ranajit Guha, 'Neel-Darpan : The Image of a Peasant Revolt in a Liberal Mirror', *Journal of Peasant Studies*, Vol. 2, No. 1, Oct. 1974, p. 8.

৭০. বরুন দে, পূর্বোক্ত।

৭১. সরকার নিযুক্ত ১৮৮৬ সালে 'স্যালারিজ কমিশন রিপোর্ট'-এ, এ বিষয়ে অনেক কিছু জানা যায়। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আগে কুলীন পাত্রের দাম ছিল, এখন ডিগ্রীধারীর। তবে খরচের দিক থেকে দেখলে মেয়ের বিয়ে কন্যাপক্ষের জন্যে ছিল মর্মান্তিক (পৃঃ ১৯৯)। এক হিন্দু ভদ্রলোক কমিশনকে জানিয়েছিলেন, আগে দুর্গাপূজায় বা নতুন বর কনেকে একটি ঢাকাই ধুতি, একটি চাদর, সোনারুপোর কাজ করা একজোড়া জুতো ও একটি রুমাল দিলেই চলতো কিন্তু এখন প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয়— একটি ঢাকাই ধুতি, একটি চাদর, সিল্ক বা দামীকাপড়ের একটি শার্ট, সিল্কের একটি রুমাল, একজোড়া মোজা ও জুতো, একটি হেয়ারব্রাশ এবং চিরুনী, এক বোতল ল্যাভেণ্ডার জল; একবোতল এসেন্স বা আতর, একটি সাবান ও তোয়ালে এবং ছেলে/মেয়ের পরিবারের সদস্যদের জন্যে ধুতি বা শাড়ী (পৃঃ ২০০)। নিমন্ত্রণে খাওয়ানোর খরচ বেড়েছে ৩০০% (পৃঃ ২০১)। মধ্যবিত্ত পরিবারে ভৃত্য রাখা ছিল সামাজিক স্ট্যাটাসের চিহ্ন। মফস্বলের একজন হেডক্লার্ক ভৃত্য রাখতেন নিম্নলিখিত হারে বেতন দিয়ে—

নাম	বেতনের হার
—	টাকা-আনা
রাঁধুনী	৮—৪
দারওয়ান	৭—০০
ভৃত্য (পুরুষ)	৬—০০
ভৃত্য (বালক)	৫—০০
দাসী দু'জন	৫—৮

এ ছাড়া দিতে হত তাদের খাওয়াদাওয়া এবং কাপড় বাবদ পাঁচজনে মাসে

দু'টাকা (পৃঃ ২০১-২০২)। আগে শীত গ্রীষ্মকালে অফিসে পরিধানের পোষাক ছিল মোটামুটি একই রকম। এখন দু'ঋতুতে দু'ধরনের পোষাক। এখন শীতকালীন পোষাকে লাগে ৭৮ টাকা, ২৫ বছর আগে লাগতো সাড়ে পাঁচ টাকা। এ ছাড়া হাতে আংটি বা সৌখিন ঘড়ি ইত্যাদিতো থাকতোই (পৃঃ ২০৪-২০৫)। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চাকরির বাজারও হয়ে উঠেছিল সীমিত। ২০ বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট একশো বা তার বেশী বেতনের চাকরি পেত। ২৫ বছর পর এম, এ, পাশও ত্রিশ টাকা বেতনের চাকরি পাচ্ছেনা। (পৃঃ ২০৮) *Report of the Government of Bengal to Revise the Salaries of Ministerial Offices, and to Reorganise the System of Business in Executive Offices 1885-86,* Calcutta 1886.

৭২. রোকেয়া রহমান কবীর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮।

৭৩. রণজিৎ গুহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।

৭৪. হিন্দুহিতৈষিণী, ২০. ২. ১৮৭৫, *RNP*, নং ৯, ১৯৭৫।

৭৫. "গ্রামবার্তা প্রকাশিকা", ৩০.১২. ১৮৭৪।

৭৬. Premen Addy and Ibne Azad, "Politics and Society in Bengal", Robin Blacklurn (ed), *Explosion in a Subcontinent,* London, 1975, p. 93.

৭৭. Nilmani Mukherjee, 'Foreign and Inland Trade 1833-1905', N. K. Sinha (ed) *History of Bengal,* Calcutta, 1966, p. 338. অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেলওয়ে এক প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯০৪ সালে ইস্ট বেঙ্গল সাবার্বান রেলওয়ের ট্রাফিক ইনসপেক্টর মিলস লিখেছিলেন, পাটের কারখানাগুলিতে রেলবাহিত ট্রাফিক ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলপথের তীব্র প্রতিযোগীতা সত্বেও। পৃঃ ১, C. J. Chatterton, *Railway Business and Jute Trade.* (প্রকাশের স্থান ও তারিখ উল্লিখিত হয়নি)।

৭৮. Misbahuddin Khan, Port of Chittagong (1889-1901). (Unpublished manuscript).

৭৯. নীলমনি মুখার্জী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩ ৪।

৮০. ঐ, পৃঃ ৩৫৬-৫৭।

৮১. ঐ, পৃঃ ৩৭০।

৮২. সফিউদ্দিন জোয়াদার, 'উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজশাহীতে শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা', "সমাজ নিরীক্ষণ", ১, নভেম্বর ১৯৭৮।

৮৩. Govt. of Bengal, *Agricultural Report of the Dacca District* (A. C. Sen), Calcutta, 1889.

৮৪. জোয়ারদার প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১।

৮৫. *Census* 1882, p. 169.

৮৬. Ranajit Guha, 'On Some Aspects of the Historiography of Colonial India', Ranajit Guha (ed), *Subalteran Studies I*, Delhi, 1982. এ ছাড়া আরো দেখুন একই লেখকের, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' "এক্ষণ", বর্ষা, ১৩৮৯। এ প্রবন্ধে উচ্চবর্গের সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি এ ভাবে—'উচ্চবর্গ বলতে আমি বোঝাতে চাই তাদেরই ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে যারা প্রভুশক্তির অধিকারী ছিল। প্রভুস্থানীয়দের দু'ভাগে ভাগ করা যায়—বিদেশী ও দেশী। বিদেশী প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যে যারা এই সংজ্ঞা সম্মত তারাও দু'ধরনের—সরকারী ও বেসরকারী। সরকারী বলতে গণ্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অভারতীয় কর্মচারী ও ভৃত্য সকলেই, আর বেসরকারী বলতে গণ্য বিদেশীদের মধ্যে যারা শিল্পপতি, বণিক, অর্থব্যবসায়ী, খনির মালিক, জমিদার, নীলকুঠি চা বাগান কফিক্ষেত বা ঐ জাতীয় যে সব সম্পত্তি প্লানটেশন প্রণালীতে চাষ করা হয় তার মালিক ও কর্মচারী, খৃষ্টান মিশনারী, যাজক, পরিব্রাজক ইত্যাদি।
দেশী প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যেও একটা মোটা ভাগ ছিল সর্বভারতীয় ও আঞ্চলিক স্বার্থের পার্থক্য অনুযায়ী। সর্বভারতীয়দের মধ্যে গণ্য বৃহত্তম সামন্ত প্রভুরা, শিল্পে ও বাণিজ্যে লিপ্ত সবচেয়ে শক্তিমান বুর্জোয়ারা এবং ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রে বা শাসনযন্ত্রের অন্যত্র যারা ছিল সবচেয়ে উচ্চপদের অধিকারী...
ঔপনিবেশিক ভারতে যারা এই সংজ্ঞা অনুযায়ী উচ্চবর্গের অন্তর্গত, সমগ্র জনসংখ্যা থেকে তাদের বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তারাই নিম্নবর্গ। এর মধ্যে শহরের শ্রমিক ও গরীব, সর্ব্বোচ্চ পদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী ও প্রায় গরীব মাঝারী চাষী নিম্নবর্গের মধ্যে গণ্য। তাছাড়াও এই সংজ্ঞার শুদ্ধ অর্থে গণ্য হবে নিবিত্ত ভূস্বামী, অপেক্ষাকৃত হীনবল গ্রামভদ্র, অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন মাঝারী কৃষক এবং ধনী কৃষকরাও . . .' (পৃঃ ১৬-১৭)।

৮৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্যে ১৮৭২ এর পরবর্তী *Administrative Report of Bengal* দেখুন, এখানে ১৮৭২ থেকে ১৮৭৫ পযন্ত রিপোর্ট ব্যবহার করা হয়েছে। কিংবা দেখুন, স্ক্রাইন, প্রাগুক্ত।

৮৮. *ARDD*, পৃঃ ১৭।

৮৯. জোয়ারদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬।

৯০. *ARDD*, পৃঃ ১৯।

৯১. জোয়ারদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬।

৯২. মুসলমান কৃষকদের ব্যয়ও ছিল একই রকম। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের হিসাবেও ধরা হয়েছে ৪টি ধুতি, ২টি গামছা, ১টি চাদর, ১টি শীতের চাদর। বাড়তি ছিল ১টি টুপি, দাম ১ আনা। তবে মুসলমান মহিলারা পড়তেন দেশী তাতীদের তৈরী মোটা কাপড় (দাম ঃ ৩ রুপি আট আনা) অন্যদিকে হিন্দু মহিলারা পড়তেন বৃটেনে তৈরী পাতলা কাপড়। *ARDD*

পৃঃ ১৭। মুসলমান মহিলাদের মোটা কাপড় পড়ার কারণ ছিল বোধহয় ধর্মীয়।

৯৩. জোয়ারদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬।

৯৪. স্ক্রাইন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

৯৫. *ARDD*, পৃঃ ১৪।

৯৬. স্ক্রাইন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

৯৭. জোয়ারদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০।

৯৮. স্ক্রাইন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

৯৯. *ARDD*, পৃঃ ২১।

১০০. ঐ, পৃঃ ২২।

১০১. Scarcity and Relief: District Fortnightly Report of the Draught of 1873-74: Rajshaye, Letter no. 987, 2.6. 1874, উদ্ধৃত, জোয়ারদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯১। এ পরিপ্রেক্ষিতে ক্যালকাটা রিভিয়ুতে প্রকাশিত একটি মন্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ১৮৬৫ সালের দুভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা করতে গিয়ে পত্রিকাটি লিখেছিল—"One of the most prominent facts laid bare by the report is the extraordinary want of knowledge on the part of all officials (with one or two notable exceptions) of the actual state of the people and country committed to their charge. When all was on the verge of ruin, these was still the greatest confidence amongst these to when the welfare of millions was entrusted. The cloud on the horizon to them was a trifle no bigger then a mans hard, cenveying no warning. There was no one to interpret the catastsophe was upon them." উদ্ধৃত, ঐ, পৃঃ ১৯২।

১০২. এ প্রসংগে দু'একজন লেখকের রচনা থেকে উক্তি দেওয়া যেতে পারে, যারা কৃষকদের দুর্দশা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। আবদোস সোবহান তাঁর 'হিন্দু মোসলমান' (ঢাকা, ১৮৮৯) গ্রন্থে লিখেছিলেন—'. . . এদিকে মাথার ঘাম পা দিয়া স্রোত চলিয়াছে, চক্ষু দু'টাতে রক্ত ভাসিতেছে,—ক্ষুধায় পেট পিঠের চর্ম্মকে আকর্ষণ করিয়া একত্র করিয়াছে—মুখ শুষ্ক হইয়া, এক হৃদয়বিদারক চিত্র আঁকিয়াছে। দারুণ জঠরানল, এতই প্রবল বেগে জ্বলিতেছে যে এই অগ্নি সদৃশ সুর্য্যোত্তাপ এখানে দাঁড়াইতেই অক্ষম।

এদিকে চাষীদের গৃহিনীরা, ছেড়া, জঘন্য কালো (যুগীয়া) কাপড় পরিধান করতঃ জঙ্গল হইতে শুষ্ক পত্র তৃনাদি, কুড়াইয়া ক্ষুদেরে শাক, গিমে শাক, সংগ্রহ করিয়া, গাছতলায় রান্না চড়াইয়াছে। অবলার কোমল শরীর, ইহাতে কি করিয়া অগ্নির উত্তাপ, রৌদ্রের উত্তাপ, উভয় উত্তাপ সহ্য হইবে?

অবলা ভাঁজা ভাঁজা হইয়াছে। শরীর দগ্ধ হইতেছে। রমণীর মুখে, বুকে, হাতে পা পর্যন্ত ঘর্ম্মের স্রোত চলিয়াছে। কোমল বালক বালিকাগণ, ক্ষুধায় ছটফট করিয়া "মা ভাত" বলিয়া মার অঞ্চল ধরিয়া কাঁদিতেছে। কিন্তু হায়! দরিদ্রতায় এতদূর আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে যে, হতভাগিনী জননী, প্রাণাধিক সন্তানের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে না পারিয়া অন্তরে দগ্ধ হইতেছে।'

আরেকজন লিখেছিলেন,—'এই দেশে পূর্ব্বে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল, ইংরেজ আমলে তাহা উঠিয়া গিয়াছে—এই কথা যিনি বিশ্বাস করিতে চাহেন, পূর্ব্ব বাঙ্গলা, বিশেষতঃ পাবনা, রাজশাহী ও বগুড়া জেলার কৃষকের অবস্থাটা তাঁহাকে একবার ভাল করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ইংরেজ রাজ নামে মাত্র কাগজে পত্রে উহা উঠাইয়া দিয়াছেন সত্য। কিন্তু ফলে তাহা ঘটে নাই। বিশেষতঃ পূর্ব বাঙ্গলার কৃষকগণ জমিদার কর্তৃক যে প্রকার ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার চেয়ে সম্ভবত পূর্ব্বকালীন দাসত্ব প্রথা ভাল ছিল।' মোহাম্মদ মোহসেন উল্লা, "বুড়ীর সুতা", কলকাতা, ১৩১৭, পৃঃ ৮।

১০৩. গ্রামসী সম্পর্কিত আলোচনাটি দুটি গ্রন্থ ও একটি প্রবন্ধের সাহায্যে তৈরী করা হয়েছে। সেগুলি হল—Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, (edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith) London, 1976. James Joll, *Gramsci*, London, 1977. Perry Andersons, 'The Antinomies of Antonio Gramsci,' *New Left Review*, No. 100 (Nov. 1976-Jan 1977). 'প্রিজন নোটবুর্কের দু'টি অধ্যায় ব্যবহৃত হয়েছে—'The Intellecetuals', 'on Education'.

১০৪. রুশ Gegemoniya, ইংরেজী hegemony এর বাংলা করা হয়েছে আধিপত্যবাদ। রুশ বিপ্লবের গোড়া থেকেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। কিন্তু একে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে অর্থবহ করে তোলেন গ্রামসী।

১০৫. রণজিৎ গুহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।

১০৬. মীর মশাররফ হোসেন, "মশাররফ রচনা সম্ভার" (এরপর উল্লিখিত হবে শুধু রচনা সম্ভার নামে) প্রথম খণ্ড, (সম্পাদনা ঃ কাজী আবদুল মান্নান), ঢাকা, ১৯৭৬—'জমিদার দর্পণ' এবং 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' সংকলিত হয়েছে এই রচনা খণ্ডে।

১০৭. ঐ, পৃঃ ১৯৪।
১০৮. ঐ, পৃঃ ১৯৭।
১০৯. ঐ, পৃঃ ৫২৭।
১১০. ঐ, পৃঃ ৫২৯।
১১১. ঐ, পৃঃ ৪২৩।
১১২. ঐ, পৃঃ ১৯৫।
১১৩. ঐ, পৃঃ ২০১।

১১৪. ঐ, পৃঃ ২০২।
১১৫. ঐ, পৃঃ ৫৬০।
১১৬. ঐ, পৃঃ ২২৭-২২৮।
১১৭. ঐ, পৃঃ ২০৪।
১১৮. ঐ, পৃঃ ৫৫৮।
১১৯. ঐ, পৃঃ ৫০৯।
১২০. মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীর নীচের উদ্ধৃত অংশটুকু পড়লে ঔপনিবেশিক শাসক সম্পর্কে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠবে—...'দীনবন্ধু মিত্র 'নীল দর্পণে' নীলকরের দৌরাত্ম্য অংশই চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। পরিণাম ফল—নীলকরের দৌরাত্ম্য সহিত পরিণাম ফল—কি প্রকারে বাঙ্গলাদেশের লোক নীল বর্জন করিল, নীলকরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল, কি প্রকারে শান্তির বাতাস বহিল, প্রজারা আশ্বস্ত হইল, বৃটিশরাজ প্রতি কি প্রকারে ভক্তি শ্রদ্ধা বাড়িল, সে সকল বিষয় এক 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকে নাই। দীনবন্ধু বাবু ইংরেজের ত্রুটি, ইংরেজের কুৎসাই গাহিয়া গিয়াছেন। ইংরেজ মধ্যে যে দেবভাব আছে, প্রজার প্রতি মায়া মমতা স্নেহ এবং ভালোবাসার ভাব আছে তাহা তিনি চক্ষে দেখিয়াও প্রকাশ করেন নাই। যে ইংরেজ জাতির নেমক রুটি খাইয়া বহুকাল জীবিত ছিলেন, যে ইংরেজের বেতনভোগী চাকর হইয়া আজীবন কাটাইলেন, উত্তরাধিকারীরাও সেই ইংরেজ প্রদত্ত টাকার উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন, বংশধরেরা যে ইংরেজ রাজ্যে বাস করিতেছেন, কেহ কেহ ইংরেজের নুন নেমক এখনও খাইতেছেন, সেই ইংরেজের কুৎসা গান করিয়া দু'শ বাহবা গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও দীনবন্ধুর প্রেত আত্মা বাহবা ভোগ করিতেছেন, ইহাদিগকে কি বলা যায়? ইহারই নাম ''পাতফোঁড়''—যে পাতে খান, সেই পাতেই ছিদ্র করেন। লবণ ফুটিয়া বাহির হইবে।' মীর মশাররফ হোসেন, ''আমার জীবনী'', (দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত), কলকাতা, ১৯৭৭ পৃঃ ১১।
১২১. কালী প্রসন্ন ঘোষ, ''ভারত বর্ষের ইতিহাস'', কলকাতা, ১৯১০, পৃঃ ৩১।
১২২. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫০।
১২৩. Rafiuddin Ahmed, *The Bengal Muslims 1871-1906. A Quest for Identity*, Delhi, 1981, p. 83.
১২৪. কালী প্রসন্ন ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন, '. . . পাঠান রাজদিগের সময় হিন্দুস্থানের যে কি ভয়ংকর অবস্থা ঘটিয়াছিল; আমরা তাহা কল্পনা করিতেও সমর্থ নহি। . . . গরীব দুঃখী লোকেরা প্রাণরক্ষার জন্য বনজঙ্গলে পলাইয়া যাইতঃ. . .বহু সংখ্যক হিন্দু মুসলমান হইয়াছিল। . .' ''ভারতবর্ষের ইতিহাস'', পৃঃ ১০২-১০৩।
১২৫. কালী প্রসন্ন ইংরেজ শাসনকে দেখিয়েছেন শৃংখলাপূর্ণ শাসনকাল হিসেবে যেখানে 'সকলেই এক মহান নৃপতির আশ্রয়ে অবস্থিত এবং একই মহতী ভারতীয় জাতির অন্তর্নিবিষ্ট।'. . .''ভারতবর্ষের ইতিহাস'', পৃঃ ৩০৫।
১২৬. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫৩।

তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক আন্দোলনঃ প্রতিক্রিয়া

সম্পূর্ণ উনিশ শতককে যদি আমরা দু'টি পর্বে ভাগ করি—১৮০০-১৮৫৭ এবং ১৮৫৭-১৯০০ তা'হলে দেখবো, দু'টি পর্বে কিছুটা পার্থক্য আছে। ১৮৫৭ থেকে ১৯০০ বা এই দ্বিতীয় পর্বেই দেখি, বাংলার সমাজ জীবন ক্রমেই জটিল এবং কলরবমুখর হয়ে উঠেছিল। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে, আমরা দেখেছি, এ সময় শিক্ষিত পেশাজীবী বা মধ্যশ্রেণীর প্রসার ঘটেছিল এবং সমাজে আধিপত্যকারী শ্রেণী হিসেবে তারা হয়ে উঠেছিল প্রভাবশালী। ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে এই শ্রেণীর সহযোগিতা এর একটি প্রধান কারণ। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণীর সঙ্গে কিছু কিছু স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে সংঘাতেরও সৃষ্টি হয়েছিল এবং বলা যেতে পারে এর ফলে জাতীয়তাবাদী ভাবধারারও সৃষ্টি হয়েছিল। এই পর্বের বিভিন্ন আন্দোলন এর প্রমাণ। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, তারা ঔপনিবেশিক শাসনের বিলুপ্তি চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল, তাদের স্বার্থের প্রসার এবং একারণেই রাজনীতির চরিত্র ছিল ঐ সময় আপোষের।

ঔপনিবেশিক কারণেই আমরা লক্ষ্য করি এ সময় সমাজ চিন্তায় প্রবল বৈপরীত্য দেখা দিয়েছিল যা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ফলে, জাতীয় চেতনা দ্বিখণ্ডিত হয় সাম্প্রদায়িক কারণে, যেহেতু হিন্দু সম্প্রদায় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণে প্রবল ছিল সে জন্যে চেতনার প্রধান ধারা গড়ে উঠেছিল ঐতিহ্যিক হিন্দু ভাবধারাকে আশ্রয় করে।

এ সময় প্রধান সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি গড়ে উঠেছিল প্রধানতঃ কলকাতাকে কেন্দ্র করে, তবে মাঝে মাঝে এ সব আন্দোলনের রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও। আমি এখানে,

আমার আলোচ্য সময়ের চারটি আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করবো এবং দেখবো পূর্ববঙ্গের সমাজে এগুলি কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু তার আগে, আমাদের নির্ধারণ করে নিতে হবে, সাধারণভাবে আন্দোলন, বিশেষ করে সামাজিক আন্দোলন বলতে আমরা কি বুঝবো? সামাজিক আন্দোলনের ভিত্তি বহুলোকের অংশগ্রহণ, একক অংশ গ্রহণ নয়; অন্যপক্ষে, আকস্মিক ঘটনাজাত প্রতিক্রিয়াও আন্দোলন নয়। আন্দোলন, আমাদের অর্থে, পরিকল্পিত, লক্ষ্য নির্ভর এবং বহুলোকের অংশগ্রহণ ভিত্তিজাত। যৌথ কর্মকাণ্ড কিছুটা সময় টিকে থাকলে তা আন্দোলনে রূপ নেয় তবে ঐ যৌথ কর্মকাণ্ড সংহত এবং সংগঠিত কিংবা স্বতস্ফূর্ত হতে পারে। আবার, যদি তা বেশ কিছু লোকের মনে সচেতনতা ও কৌতূহল জাগাতে পারে, তা'হলে তাকে আমরা আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। সুতরাং সামাজিক আন্দোলন, 'essentially involves sustained collective mobilization through either informal or formal organization.'[১]

অনেক সময়, অনেক আন্দোলনকে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক নাম দিয়ে সামাজিক আন্দোলন থেকে আলাদা করে দেখানো হয়। তবে তাদের আলাদা চরিত্র নির্ধারিত হলেও, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সব আন্দোলনই সংগঠিত হয় সমাজে এবং তা অভিঘাতও হানে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবেই সমাজ ব্যবস্থার ওপর।[২] সুতরাং ব্যাপকতর অর্থে, সব আন্দোলনকেই সামাজিক আন্দোলন বলা যেতে পারে। তবে কোনটার প্রাথমিক ভিত্তি হতে পারে রাজনীতি অথবা অর্থনীতি। অবশ্য আলোচনার সুবিধার জন্যে অনেক সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য টানা হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকার্য যে, সব আন্দোলনেরই একটি রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকে। হয়ত এ ক্ষেত্রে আন্দোলনকারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য নাও থাকতে পারে কিন্তু তা বলে ঐ রাজনৈতিক তাৎপর্যকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।[৩]

একটি সামাজিক আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন তার লক্ষ্য থাকে বিদ্যমান মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা, ব্যবস্থার আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন। আবার এটাও ঠিক, একই সময় এর বিপরীতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্যে প্রতিরোধও গড়ে উঠতে পারে।[৪] সামাজিক আন্দো-

লনে ব্যক্তির অংশগ্রহণ বহুবিধ কারণ হতে পারে ; যেমন, আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে যৌক্তিক বিশ্বাস অথবা নিছক সুবিধাবাদ। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কাজ করে আবেগ। যেমন, কোন অভিজ্ঞতা ব্যক্তিমানসে এ ধারণা বা বিশ্বাসের সৃষ্টি করতে পারে যে, কোথাও অবিচার হয়েছে। তখন সে অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায়। অনেক ক্ষেত্রে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা আন্দোলনের নেতার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েও তাতে যোগ দিতে পারে।[৫]

সামাজিক আন্দোলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আদর্শ। যেমন, আদর্শ ছাড়া একটি ধর্মঘট, একটি ব্যক্তিক বা নিঃসঙ্গ ঘটনায় পরিণত হতে পারে।[৬] সামাজিক আন্দোলন, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে একটি বিশেষ জনমত গঠনে সহায়তা করতে পারে। এমনও হতে পারে, আন্দোলনের কোন মূল আদর্শ জনমতে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে এবং ভবিষ্যতের রাজনৈতিক এলিট সৃষ্টি করতে পারে এর মাধ্যমে।[৭] সামাজিক আন্দোলন যখন বিদ্যমান ব্যবস্থায় গতিশীলতা ও পরিবর্তন আনে তখন তা সামাজিক পরিবর্তনের দিকে যেতে সাহায্য করে ফলে ঐতিহ্যগত শক্তি ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটে। এ ভাবে দেখা যায়, প্রতিবাদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সামাজিক আন্দোলন সামাজিক সম্পর্কের ঐতিহ্যগত কাঠামোয় পরিবর্তন আনে।[৮]

সামাজিক আন্দোলনের ফলে, সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি তিন-রকম হতে পারে—সংস্কার, পরিবর্তন এবং বিপ্লব। সংস্কারের অর্থ, একটি গোষ্ঠী বা গ্রুপের সদস্যদের বিশ্বাস, ব্যবস্থা বা জীবন যাত্রার পরিবর্তন। সমাজের সর্বস্তরে হঠাৎ সম্পূর্ণ পরিবর্তনের নাম বিপ্লব। আর পরিবর্তনের অর্থ ঐতিহ্যগত শক্তিসম্পর্কের ভারসাম্য এবং অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধস্তন-উধর্বতন সম্পর্কের পরিবর্তন।[৯]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, আমি আলোচনার জন্যে যে চারটি আন্দোলন বেছে নিয়েছি—১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ, ব্রাহ্ম আন্দোলন, সহবাস সম্মতি আন্দোলন এবং বঙ্গ বঙ্গ—ব্যাপকতর অর্থে সেগুলি সামাজিক আন্দোলনেরই অন্তর্গত। প্রথমোক্ত এবং শেষোক্তটির ভিত্তি শুধু নিছক সমাজ সংস্কার নয়, এর সঙ্গে জড়িত ছিল আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক প্রশ্নও। স্বভাবতই এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, আমি চারটি আন্দোলনকে আলোচনার জন্যে বেছে নিলাম কেন ? এর একটি

প্রধান কারণ চারটি আন্দোলনের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ—এ সময় থেকেই আমার আলোচনার সূত্রপাত। এ বিদ্রোহের প্রকৃতি একেবারে নির্দিষ্ট করে দেওয়া সম্ভব নয়। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে ছিল বৈপ্লবিক ইঙ্গিতময়তা, যদিও এর প্রকৃতি বৈপ্লবিক নয় কারণ সর্বস্তরে তা সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারে নি। তবে এ বিদ্রোহ তাৎক্ষণিকভাব না হলেও পরবর্তী সময়ের জন্যে কিছু প্রতীকী মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছিল। সাধারণ মানুষের মনে, এ বিদ্রোহ অন্তত এ ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে, বৃটিশ শাসন অমোঘ নয়। এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ সম্ভব। তা'ছাড়া, এ বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছিল কিছু জাতীয় বীরের এবং প্রায় প্রত্যেক আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বে এ ধরনের কিছু বীরের প্রয়োজন হয়। এ বিদ্রোহের ফলে ভারতীয়রা তা পেয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে আমরা এর প্রতিফলন দেখি সাধারণ মানুষের মধ্যে।

ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রকৃতি ছিল সংস্কারমূলক। অর্থাৎ, এ আন্দোলন সমাজের একটি গ্রুপের সদস্যদের বিশ্বাস ব্যবস্থা ও জীবন যাত্রায় পরিবর্তন এনেছিল। এ আন্দোলনের ছিল একটি আদর্শ। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মাধ্যমে হলেও ব্রাহ্ম আন্দোলন সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে একটি জনমত গঠনে সহায়তা করেছিল, খানিকটা পরিবর্তনও ঘটিয়েছিল ঐতিহ্য-গত শক্তি সাম্যের।

উনিশ শতকের শেষ দশকে হিন্দু পুর্ণজাগরণবাদ তুঙ্গে উঠেছিল সহবাস সম্মতি আইনকে কেন্দ্র করে। সহবাস সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল প্রধানতঃ স্থিতাবস্থা বজায় রাখার আন্দোলন। এর প্রকৃতি সংস্কারমূলক এবং পর্যবসিত হয়েছিল রক্ষণশীলতায়।

বঙ্গ ভঙ্গের প্রকৃতি ছিল পরিবর্তন। ঐতিহ্যবাহী শক্তি সম্পর্কের ভারসাম্য এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উধর্বতন অধস্তন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল এ আন্দোলন শুধু তাই নয় এর ফলাফলও ছিল সুদূর প্রসারী। বঙ্গ ভঙ্গ দুই সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে নতুন শ্রেণীর নেতৃবর্গের সৃষ্টি করেছিল। তা'ছাড়া আমার সময় সীমার পরিণতি টানছি আমি বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময়।

উপরোক্ত আন্দোলনগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর ওপর ভিন্ন ধরনের প্রতি-ক্রিয়া ও প্রভাবের সৃষ্টি করেছিল। কোন শ্রেণী, কোন আন্দোলনে

কি ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল, পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে তা'বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

এখানে, প্রথমে, প্রতিটি আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তারপর পূর্ববঙ্গে এর অভিঘাত ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো। তবে, এখানে উল্লেখ্য, বাংলার তথা ভারতের সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সমসাময়িক ইংল্যাণ্ডের চিন্তা, আদর্শ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ বিষয়ে আলোচনা করবো তৃতীয় অনুচ্ছেদ ও উপসংহারে।

১. ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ

বিদ্রোহ এবং বিপ্লবে পার্থক্য আছে। বিপ্লবের অর্থ শুধু শাসকের পরিবর্তনই নয়, সরকার ব্যবস্থা, সমাজ, অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রে সামগ্রিক পরিবর্তনই বিপ্লব।[১০] অন্যদিকে, কোন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মানে এ নয় যে সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন। বিদ্রোহ শুধুমাত্র শাসক পরিবর্তনের জন্যেও হতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, ১৮৫৭ সালে, ভারতীয় সিপাহীরা, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করেছিল তাকে আমি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ হিসেবে আখ্যায়িত করবো।

১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ, কলকাতার কাছে ব্যারাকপুরে মঙ্গলপাণ্ডে নামে এক ভারতীয় সৈনিক কর্তৃক জনৈক ইংরেজ অফিসারকে হত্যা প্রচেষ্টার মাধ্যমে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সূত্রপাত। কিন্তু প্রবল ও ব্যাপক আকারে প্রথম তা ছড়িয়ে পড়েছিল মিরাটে ১০মে, এবং এরপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে। পূর্ববঙ্গ বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র থেকে এক প্রান্তে অবস্থিত হলেও এর রেশ পৌঁছেছিল এখানে। ১৮৫৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর দিল্লীর পতন ও সম্রাট বাহাদুর শাহর গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহের মোটামুটি সমাপ্তি হয়েছিল, যদিও বিভিন্ন অঞ্চলে, আঞ্চলিক নেতারা তখনও যুদ্ধ করে চলেছিলেন। ১৮৫৮ সালের ৮ জুলাই লর্ড ক্যানিং আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্রোহের সমাপ্তি ও শান্তির সূচনার কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং ঐ বছরই ব্রিটিশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে বিদ্রোহের কারণগুলি সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা মোটামুটিভাবে একমত

পোষণ করেন। তাৎক্ষণিকভাবে, সামরিক বাহিনীতে বিদ্রোহ শুরু হলেও পরে তা আর সামরিক বাহিনীতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। আর্থ-সামাজিক কারণগুলি তখন বড় হয়ে উঠেছিল। সুতরাং ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে 'বিদ্রোহ' হিসেবে আখ্যায়িত করলেও এর ভেতরের সামাজিক আন্দোলনের উপাদানগুলি তুচ্ছ করার মত নয়।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ নিয়ে বিভিন্ন সব মতামত প্রকাশিত হয়েছে। সব মতামতকে এখানে কয়েকভাগে ভাগ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো—

ক. উনিশ শতকে ইংরেজ ঐতিহাসিক যেমন, কে (এ হিস্ট্রি অফ দি সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া, ১৮৬৪), ম্যালেসন (হিস্ট্রি অফ দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি, ১৮৭৮, দ্বিতীয় সংস্করণ), রাইস হোম্‌স (এ হিস্ট্রি অফ দি ইণ্ডিয়ান 'মিউটিনি ১৮৮৩) প্রমুখ ১৮৫৭ এর বিদ্রোহ সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ তত্ত্বই অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন যে, বৃটিশ কুশাসনই এ বিদ্রোহের কারণ। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তারা যুদ্ধের সামরিক প্রকৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বেশী।[১১]

খ. জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহাসিকরা বিদ্রোহকে চিহ্নিত করেছিলেন ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহী নেতারা পরিণত হয়েছিলেন জাতীয়বীরে। বিদ্রোহের প্রধান কারণ হিসেবে তাঁরা নির্ধারণ করলেন, বিদেশী শক্তির নিপীড়নকে। এ মতবাদ প্রথম উপস্থাপিত করেছিলেন সাভারকার ১৯০৯ সালে তাঁর 'দি ইণ্ডিয়ান ওয়ার অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' নামক গ্রন্থে।[১২] রাজনীতিবিদ, যেমন, আবুল কালাম আজাদ, অশোকমেহতা বা ভূপতি মজুমদার প্রমুখরাও উপরোক্ত মতবাদ সমর্থন করেছেন।[১৩]

১৯৫৭ সালে বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতে বেশ কিছু পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ সেন, রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং পি, সি, যোশীর (সম্পাদিত) গ্রন্থ তিনটি উল্লেখযোগ্য।[১৪] ঐ গ্রন্থ তিনটিতে আমরা আবার তিন ধরনের মত পাই।

গ. ভারত সরকারের অনুরোধে সেন তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। তাঁর মতে, বিরাট জাতীয় অভ্যুত্থান হিসেবে এ বিদ্রোহকে চিহ্নিত করা যায় না। তবে তিনি এটাও স্বীকার করেছেন যে, প্রাথমিকভাবে সামরিক বিদ্রোহ হিসেবে শুরু হলেও অন্তিমে তা আর সামরিক বাহিনীতেই

সীমাবদ্ধ থাকেনি।[১৫]

ঘ. রমেশচন্দ্র মজুমদারের অবস্থান একেবারে বিপরীত মেরুতে। তাঁর মতে, এটি স্বাধীনতার জন্যে জাতীয় যুদ্ধ ছিল না। বিদ্রোহের নেতাদের পূর্ব পরিকল্পিত কোন পরিকল্পনাও ছিল না। এবং তখন ছিল না কোনরকম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।[১৬] শশীভূষণ চৌধুরী তাঁর দু'টি গ্রন্থেই এ মতবাদ খণ্ডন করে বলেছেন, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে সামরিক ও বেসামরিক ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল এবং জনগণ সচেতনভাবে তা'সমর্থন করেছিলেন।[১৭]

ঙ. মাকর্সবাদী ঐতিহাসিকদের মত, জাতীয়তাবাদীদের মতামতের কাছাকাছি। কার্ল মার্কস প্রথম এই অভ্যুত্থানকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তবে মার্কসবাদীদের মতে, এটি ছিল কৃষকদের জাতীয় অভ্যুত্থান।[১৮] এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও ঐতিহাসিকদের সুপরিকল্পিত প্রচারের ফলে, 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামেই ভারতীয় মহাবিদ্রোহ আমাদের কাছে পরিচিত।[১৯]

মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ব্যতীত, বাকী সবার মতামতের সারসংক্ষেপ করেছেন মেটকাফ এ ভাবে—'It was something more than a Sepoy mutiny, but something less than a national revolt.'[২০]

বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে সেন এবং মজুমদার, মোটামুটি একই কথা বলেছেন। তাঁদের মতে, বিদ্রোহ সফল হলে, ইংরেজ আমলে সর্বক্ষেত্রে যেমন উন্নতি হচ্ছিল তা বন্ধ হয়ে যেত। এক কথায়, এর চরিত্র ছিল সামন্ততান্ত্রিক। সুশোভন সরকার এ মত খন্ডন করে দেখিয়েছেন, সেন ও মজুমদারের বক্তব্যে পরস্পর বিরোধিতা আছে। একদিকে তাঁরা যেমন বলছেন বিদ্রোহের চরিত্র ছিল সামন্ততান্ত্রিক অপর দিকে বলছেন; এ বিদ্রোহ ছিল অসংগঠিত ও স্বতস্ফূর্ত। সুতরাং তাঁদের বক্তব্য তাঁরাই নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এ ছাড়া, প্রমাণিত হয়েছে, অধিকাংশ জমিদার বা রাজ রাজড়ারা ছিলেন উপনিবেশিক সরকারের পক্ষে।[২১]

উপরোল্লিখিত মতামত বিশ্লেষণ করে বলতে পারি যে, সর্বভারতীয় পরিসরে বিচার করলে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ছিল প্রথম জাতীয় অভ্যুত্থান। এটিই ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ যা আঞ্চলিক

সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এর জন্যে নিঃসন্দেহে দায়ী ছিল ইংরেজদের লুণ্ঠন, অত্যাচার, শোষণ।

বলা যেতে পারে, ভারতীয় সিপাহীদের নির্দিষ্ট কিছু কারণ ছিল, কিন্তু, গোপালের ভাষায়, প্রায় ক্ষেত্রেই ছিল সে সিপাহীর পোষাক পড়া একজন কৃষক। যে গ্রাম থেকে সে এসেছিল, নিশ্চয় সে গ্রামের অবস্থা তার ওপর সৃষ্টি করেছিল প্রতিক্রিয়ার।[২২] এ বিদ্রোহের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ, কৃষকের স্বার্থ ও ক্রোধ উৎসারিত হয়েছিল।

তবে, সমগ্র ভারতে, বিভিন্ন অঞ্চলে সমাজ গঠনে বিভিন্নতার দরুণ, বিদ্রোহের পরিসর, আয়তন, কেন্দ্রবিন্দু হয়েছিল বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম। এবং তাই আমরা দেখি, পরবর্তী পর্যায়ে সামগ্রিকভাবে ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে, এ বিদ্রোহের প্রভাব বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। যেমন, পূর্ববঙ্গ ছিল বিদ্রোহের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে, এবং এখানকার মানুষ এ বিদ্রোহে তেমনভাবে সাড়া দেয়নি। কিন্তু পরে, কৃষক বিদ্রোহের সময় লক্ষ্য করা যায়, এ বিদ্রোহ কৃষকদের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এখন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে, ১৮৫৭ সালরে বিদ্রোহ কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা' আলোচনা করবো।

পূর্ববঙ্গে একমাত্র চট্টগ্রামেই সিপাহীরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যখন বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল তখন চট্টগ্রামে মোতায়েন ছিল ৩৪ নেটিভ ইনফেনট্রির তিনটি কোম্পানী। এর বাকী সাতটি কোম্পানীকে আগেই নিরস্ত্র করা হয়েছিল ব্যারাকপুরে।[২৩] তবে চট্টগ্রামের অবস্থা ছিল 'ভয় ভীতিপূর্ণ'।[২৪]

১৮ নভেম্বর পর্যন্ত চট্টগ্রামের সিপাহীরা ছিল শান্ত। কিন্তু ঐ দিন রাতে হঠাৎ তারা বিদ্রোহ করে ট্রেজারি লুট করেছিল, জেলভেঙ্গে বন্দীদের দিয়েছিল মুক্তি, এবং তার পর সরকারী তিনটি হাতি নিয়ে ত্যাগ করেছিল চট্টগ্রাম। সাধারণ মানুষের তারা কোন ক্ষতি করেনি।[২৫] কমিশনার খবর পেয়ে শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করেছিলেন। মহিলা ও শিশুদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বন্দরে। ইংরেজরা গড়ে তুলেছিল একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এবং নিজেদের রক্ষার জন্যে সাময়িকভাবে নির্মাণ করেছিল একটি দূর্গ প্রাচীর।

১৩ ডিসেম্বর বিদ্রোহীরা পৌঁছেছিল সিলেট জেলার দক্ষিণাংশে। জেলার উপকণ্ঠে সরকার অনুগত বাহিনীর সঙ্গে এক যুদ্ধে ২৬ জনকে মৃত ফেলে রেখে সিপাহীরা পালিয়ে গিয়েছিল জঙ্গলে। ইংরেজ পক্ষে নিহত হয়েছিল পাঁচজন, আহত হয়েছিল একজন।[২৬]

১৮৫৭ সালের মার্চ মাস থেকেই ঢাকার সাধারণ মানুষ আশংকা করছিল বিদ্রোহের। ঢাকায় সিপাহীদের সংখ্যা ছিল প্রায় দু'শো এবং নেতৃত্বহীন দৃশো লোক পুরো শহরবাসীর বিরুদ্ধে কি করতে পারে— এ ধরনের প্রশ্ন তুলে অনেকেই বলেছিলেন, শহরের বাসিন্দা এবং সিপাহীরা দু পক্ষই পরস্পরকে ভয় করছে। কারণ সিপাহীদের সঙ্গে শহরবাসীর সম্পর্ক ভালো নয়।[২৭] অন্য আরেকটি ভাষ্যে জানা যায়, দেশী সিপাহীরা থাকতো তখন লালবাগে এবং পরিচিত ছিল তারা কালা সিপাহী নামে। ইংরেজ সৈন্যদের বলা হত গোরা সিপাহী। কালা সিপাহীরা ছিল শক্ত সমর্থ, অমায়িক এবং এ জন্যে শহরের মুসলমানদের মধ্যে ছিল তারা খুব জনপ্রিয়।[২৮]

মে মাসে মীরাটের বিদ্রোহের সংবাদ এসে পৌঁছেছিল ঢাকায়। মিশনারীদের ঐ সময় বাজারে ধর্ম প্রচারে সিপাহীদের কিছুটা প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।[২৯] বাংলাবাজার 'ফিমেল স্কুল' ও এ সময় প্রায় ছাত্রীশূন্য হয়ে গিয়েছিল কারণ গুজব রটেছিল সিপাহীরা স্ত্রী শিক্ষা পছন্দ করে না।[৩০] মে মাসের শেষে এবং জুন মাসের শুরুতে ৭৩ এর দু'টি কোম্পানী জলপাইগুড়ি থেকে ঢাকা এসে পৌঁছেছিল বদলি হিসেবে। ১০ জুন ইউরোপীয় বাহিনী আসতে পারে শুনে সিপাহীরা হয়ে উঠেছিল বেশ উত্তেজিত।[৩১] বোঝা যাচ্ছে উভয় পক্ষই চরম দিনটির জন্যে অপেক্ষা করছিল।

জুনমাসে, শহরের ইউরোপীয় বাসিন্দারা একটি 'কমিটি অফ সেফটি' গঠন করে কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছিল, শহরবাসী ভদ্রলোক [অর্থাৎ ইংরেজরা] যেন কোন গুজবে কান না দেন এবং কোন গুজব শুনলে তা যেন ম্যাজিস্ট্রেট বা কমিটির সদস্যদের জানান। তাঁরা তখন এর সত্যতা যাচাই করবেন। বিজ্ঞপ্তিতে, বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে ঢাকার খৃস্টান অর্থাৎ ইউরোপীয়দের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল, বিপদে যেন তারা পরস্পরকে রক্ষা করেন। এ জন্যে, তাদের প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত শহরের

একটি বাড়ী ঠিক করা, যেখানে বিপদের সময় সবাই মিলে আশ্রয় নেওয়া যাবে। এবং এ জন্যে কমিশনারের বাড়ীই সবচেয়ে উপযুক্ত।[৩২]

এর মধ্যে লেফটেন্যান্ট লুইসের অধীনে একশো নৌ-সেনা দু'টি ১৪ ইঞ্চির কামান নিয়ে পৌঁছেছিল ঢাকায়।[৩৩] আস্তানা গেড়েছিল তারা ব্যাপটিস্ট চার্চের উল্টোদিকে এক বাড়ীতে এবং যারা শহর ছেড়ে পালিয়েছিল তারা আবার ফিরে এসেছিল নিজ নিজ বাড়ীঘরে।[৩৪]

ইতিমধ্যে ৩০ জুলাই ঢাকা কলেজে ইউরোপীয় অধিকাংশকে [প্রায় ষাটজন] নিয়ে একটি সভা হয়েছিল। উদ্দেশ্য একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গড়ে তোলা। ঠিক হয়েছিল, দু'ধরনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী হবে। পদাতিক এবং ঘোড় সওয়ার। মেজর স্মিথ ও মিঃ হিচিন্স যথাক্রমে অধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন পদাতিক এবং ঘোড়সওয়ার বাহিনীর।[৩৫]

উত্তেজনা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তার বিস্ফোরণ ও সমাপ্তি ঘটেছিল ২১ থেকে ২৬ নভেম্বরের মধ্যে।

২১ নভেম্বর গোয়েন্দা সূত্রে, চাঁটগার সিপাহীদের বিদ্রোহের খবর ঢাকায় পৌঁছুলে লেঃ লুইস, সামরিক ও বেসামরিক লোকদের এক বৈঠকে ঠিক করেছিলেন যে, ঢাকার দেশী সিপাহীদের নিরস্ত্র করা হবে।[৩৬]

২২ নভেম্বর সকাল পাঁচটায় স্বেচ্ছাসেবকদের জড়ো হতে বলা হয়েছিল (জায়গার নাম উল্লেখ করা হয় নি)। ঠিক সময়ে কমিশনার, জজ, কিছু সিভিলিয়ান এবং বিশ ত্রিশজন স্বেচ্ছাসেবক জড়ো হয়েছিল। ভোরের আলো ফোটেনি তখনও।[৩৭]

প্রথমে, তারা নিরস্ত্র করেছিল তোষাখানার প্রহরীদের। প্রহরায় ছিল তখন পনের জন প্রহরী। যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছিল তারা এবং তা জানিয়েছিলও। প্রহরীরা বলেছিল, এসবের কোন দরকার ছিল না। অফিসাররা নির্দেশ দিলেই তারা আত্ম সমর্পন করতো।[৩৮]

নৌসেনারা লালবাগ দুর্গে পৌঁছে দেখেছিল সিপাহীরা প্রস্তুত। তারা বোধহয় আগেই খবর পেয়েছিল। প্রহরী গুলি ছুড়েছিল। ইংরেজ পক্ষের মারা গিয়েছিল একজন। অন্যান্য সিপাহীরাও এরপর গুলি ছোড়া শুরু করেছিল। নৌসেনারা অগ্রসর হয়েছিল কেল্লার দক্ষিণ দিকের ভাঙ্গা ফটক দিয়ে। এই ফটক রক্ষার জন্যে বিবি পরীর কবরের সামনে কামান বসানো হয়েছিল। নৌসেনারা ভেতরে ঢোকা মাত্রই উড়ে এসেছিল

এক ঝাঁক গুলি। লেঃ লুইস সৈন্যদের নিয়ে বাঁ দিকে দুর্গ প্রাচীরের ওপর ওঠে বেয়নেট চার্জ করে সিপাহীদের পিছু হটাতে লাগলেন। সিপাহীরা আশ্রয় নিয়েছিল নিজেদের আস্তানায় কিন্তু সৈন্যরা সেখান থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাদের বের করতে লাগলো। ভয়ংকর যুদ্ধের পর কেল্লা ছেড়ে পালিয়েছিল সিপাহীরা। পেছনে রেখে গিয়েছিল ৪০টি মৃতদেহ। ইংরেজ পক্ষে নিহত হয়েছিল একজন।[৩৯]

কিন্তু হৃদয়নাথ মজুমদার নামে একজন বাঙালী উকিলের বিবরণ, ইংরেজ ব্রেনাণ্ড (১৯১৫) থেকে একটু ভিন্ন। এবং সত্য বোধহয় লুকিয়ে আছে এই দু'য়ের মাঝে।

হৃদয়নাথ লিখেছেন, ব্যাটালিয়ানের কাপ্তান একদিন আনুষ্ঠানিক-ভাবে তার সুবাদারকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিল, পেনসন দিয়ে তাদের চাকরি থেকে অবসর দিলে তারা রাজী আছে কিনা। সুবাদার তার সংগীদের সংগে পরামর্শ করার সময় চেয়েছিল।[৪০]

কিন্তু ঐ রাতেই ইংরেজরা আক্রমন করেছিল দুর্গ। সিপাহীরা এ ধরনের কোন আক্রমণ আশা করেনি। নিরুদ্বেগে তারা ঘুমিয়েছিল। গুলিবর্ষনের শব্দে বিমূঢ় হয়ে গেলেও, বিপদ দেখে ত্বরিত তারা নিজেদের তৈরী করে নিয়েছিল। তাদের প্রত্যেকের কাজেই ছিল দশরাউণ্ড গুলি এবং প্রত্যুত্তর দিয়েছিল তারা তা দিয়েই।

অস্ত্রাগারের চাবি ছিল সুবাদারের কাছে।[৪১] সিপাহীরা তাকে অস্ত্রাগার খুলে দিতে বললে সে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। সুবাদারের স্ত্রীও অনুরোধ জানিয়ে হয়েছিল প্রত্যাখ্যাত। সিপাহীরা এ পর্যায়ে সুবাদারকে হত্যা করে চাবি ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল কিন্তু তখন ইংরেজরা হয়ে উঠেছিল প্রবল এবং অস্ত্রের অভাবে সিপাহীদের তখন আত্মসর্পণ করতে হয়েছিল।[৪২]

আরেকটি বিবরণে জানা যায়, ভোরে দুর্গ আক্রমণের সময় সিপাহীরা একেবারেই তৈরী ছিল না। কারণ তখন তারা 'প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনে' ব্যস্ত ছিল।[৪৩]

এ সব বিবরণ থেকে একটি জিনিষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইংরেজরা বিনা প্ররোচনায় সিপাহীদের আক্রমন করে তাদের নৃশংস ভাবে হত্যা করেছিল। সিপাহীদের মারা গিয়েছিল একচল্লিশ জন, তিনজনের মৃত্যু হয়েছিল নদী পেরুতে গিয়ে। আহতের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। ইংরেজ পক্ষে আহত হয়েছিল আঠারো জন। গ্রেফতারকৃত কুড়িজনের দশজনকে

ফাঁসি এবং বাকী দশজনকে দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। পলায়নরত সিপাহীদের বাহিনী জামালপুর, ময়মনসিংহ হয়ে ব্রহ্মপুত্রের কাছে পৌঁছায় এবং তারপর ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে চলে গিয়েছিল রংপুরে।[৪৪]

সিপাহীদের বিচারের বর্ণনা দিয়েছেন ব্রেনাণ্ড খুব সাধারণভাবে, যেন এটাই ছিল ভবিতব্য। যেমন ৩০ নভেম্বরের রোজনামচায় তিনি লিখেছেন, তিনজন বিদ্রোহীকে আজ সকালে ফাঁসি দেওয়া হল। আগে দেওয়া হয়েছিল আটজনকে। সবমিলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হল এগারোজনকে (সরকারী হিসেবে ১০ জন)। আমরা মনে করি এ সময় এ ধরনের উদাহরণের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এ ধরণের উদাহরণ মানুষের ওপর চমৎকার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। এখন নেটিভরা যেমন ভদ্র, আগে আমার মনে হয় না তাদের কখনও এমন দেখেছি।[৪৫]

নোয়াখালীতে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের খবর পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট সাইমন প্রস্তুত হয়েছিলেন দু'হাজার সশস্ত্র লোক নিয়ে [মনে হয় সংখ্যাটি অতিরঞ্জিত] ভুলুয়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ যোগাড় করে পাঠিয়েছিলেন এদের। রাজারা শক্ত দেয়াল দিয়ে ঘেরা তাদের পাকা কাছাড়ি ছেড়ে দিয়েছিলেন ইংরেজদের ব্যবহারের জন্যে এবং সেটাকেই পরিণত করা হয়েছিল দুর্গে।[৪৬] কিন্তু সিপাহীরা আসেনি নোয়াখালীতে।

কুমিল্লাতেও এই পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়েছিল উত্তেজনার এবং ইউরোপীয়রা পরিবার পরিজনদের পাঠিয়ে দিয়েছিল ঢাকায়। কিন্তু সিপাহীরা কুমিল্লায় না এসে সিঙ্গার বিলের মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছিল সিলেটের দিকে।[৪৭]

ময়মনসিংহে ঢাকার ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়েছিল যথেষ্ট উত্তেজনার। শহরের অধিকাংশ অধিবাসী ছিলেন হিন্দু এবং নভেম্বর মাসে তারা এই ভেবে ভয় পাচ্ছিলেন যে, ঢাকার বিদ্রোহী সিপাহীরা শহরে ঢুকে লুটপাট করতে পারে। সিপাহীরা যেদিন প্রবেশ করেছিল ময়মনসিংহে সেদিনের বিবরণ দিয়েছেন কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর আত্ম-জীবনীতে। শহর ছেড়ে ঐ দিন লোকজন পালিয়েছিল। কৃষ্ণকুমারের পরিবারের সদস্যরা বাড়ীর পিছনে ঝোপঝাড়ে জিনিসপত্র ও নিজেদের লুকিয়েছিলেন। লিখেছেন তিনি, 'ঐ দিন শহরময় যে চিৎকার হইয়াছিল তাহা বেশ মনে আছে।'[৪৮] সিপাহীরা নীরবে শম্ভুগঞ্জ বাজারের মধ্যে

দিয়ে উত্তর পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরে চলে গিয়েছিল।[৪৯]

বিদ্রোহের সময় যশোরের সিভিল ও সেশন জজ ছিলেন সেটনকার। ঐ সময় যশোরে কোন সিপাহী ছিল না। ছিল পঁয়ত্রিশজন 'নজিব' বা আধাসামরিক বাহিনীর লোক। বিভিন্ন অঞ্চলে যখন চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিল তখন একদিন রাতে জনৈক বাঙ্গালী কর্মচারী ইংরেজ ওপরঅলাদের খবর দিয়েছিল যে, নজিবদের দলপতি জমাদার বিদ্রোহের চিন্তাভাবনা করছে। ইংরেজ কর্মচারীরা সেটনকারকে না জানিয়ে রাতে নজিবদের আস্তানা ঘেরাও করে পাঁচ-ছ'জনকে গ্রেপ্তার করেছিল। আদালতে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছিল। বিচারক ছিলেন কার নিজে এবং কেন যেন তাঁর মনে হয়েছিল আসল লোককে ধরা হয়নি। সুতরাং সব কজনকে পোরা হয়েছিল জেলে এবং তারপর সহজেই দোষী নজিবকে চিহ্নিত করা গিয়েছিল। তার নাকি পরিকল্পনা ছিল, বিদ্রোহ করে ইংরেজদের খেদিয়ে 'নেটিভরাজ' প্রবর্তন করা। সুতরাং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে জামাদারকে ফাঁসি দিয়ে যশোরের রাস্তায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। পরে কিছু নৌসেনা রওয়ানা হয়েছিল যশোরের দিকে। রাস্তার আশেপাশের গ্রামের লোকেরা শুনেছিল পাইপ খাওয়ার জন্যে নাকি তাদের আগুনের দরকার হবে। তাই কয়েকমাইল পরপর তারা মালষায় অগুণ রেখে পালিয়ে গিয়েছিল। সেটনকারকে এভাবে বিদ্রোহ দমনের জন্যে লর্ড ডালহৌসী ও লেডী ক্যানিং অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন।[৫০]

রাজশাহীতে সবসময় বিরাজ করছিল উত্তেজনা। প্রথমতঃ জলপাই-গুড়িতে সিপাহীদের অবস্থানের জন্যে। কারণ এদের মধ্যে অশ্বারোহীরা পরে বিদ্রোহ করেছিল। দ্বিতীয়তঃ এ ভয়ও সবাই করেছিল যে, ঢাকা থেকে সিপাহীরা রাজশাহী আক্রমণ করতে পারে।[৫১]

বরিশালও পল্লবিত হয়ে উঠেছিল গুজবে। বাজারে কাবুলিরা নাকি বিদ্রোহের 'গুজব' ছড়াচ্ছিল।[৫২] স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল সেখানে।[৫৩] এ ছাড়া পুরো অঞ্চল ছিল মোটামুটি শান্ত।

সিলেটের বাহিনী ছিল সরকার অনুগত। তাই সেখানে তেমন কিছু ঘটেনি। তবে জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে হঠাৎ শোনা গেল হাজী সৈয়দ বখত নামে এক মুসলমান জমিদার অস্ত্র সংগ্রহ করছেন। তদন্ত করে জানা গেল, তাঁর কাছে চাঁদির কামান আছে ছ'টি যা

মহররমের সময় ব্যবহার করা হত। কামানগুলি হাজী বখত থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া সিলেটে তেমন কিছু আর ঘটেনি।[৫৪]

সামগ্রিকভাবে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ পূর্ববঙ্গে এ ভাবেই হয়েছিল। পূর্ববঙ্গ থেকে বিদ্রোহের মূল কেন্দ্রগুলি ছিল অনেকদূরে। কিন্তু তার রেশ পৌঁছেছিল এখানেও। কলকাতা বা ঢাকার মত শহরে যদি খোলা-খুলি বিদ্রোহ শুরু হত তা'হলে উত্তরাঞ্চলের মত বাংলায় হয়ত তা ছড়িয়ে পড়তো। তখন, 'বাংলা সরকারের অধীনে এমন একটা জেলা ছিল না যা প্রত্যক্ষ বিপদের মধ্য দিয়ে যায়নি কিংবা ঘোরতর বিপদের আশংকা করেনি।'[৫৫]

উপরোক্ত বিবরণও তা সমর্থন করে। পুরো পূর্ববঙ্গ তখন কাটিয়েছিল আতঙ্কে। চট্টগ্রামেই মাত্র সিপাহীরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছিল। ঢাকার সিপাহীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল মাত্র। কিন্তু ইংরেজদের অতি আতঙ্কের কারণে সেটাই হয়ে উঠেছিল অপরাধের বিষয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, পূর্ববঙ্গে ঐ সময় কারা সমর্থন করেছিল ঔপনিবেশিক সরকারকে?

জমিদাররা সামগ্রিকভাবে সাহায্য করেছিল ইংরেজদের। ঢাকার কমিশনার জানিয়েছিলেন, তাঁর বিভাগের 'নেটিভ জমদার' ও অন্যান্যরা তাঁকে প্রচুর সাহায্য করেছিল, যেমন শিবজয় উজির, নাসিরুদ্দীন, মনোহর, রাজ কিষেন রায়, মাহমুদ গাজী চৌধুরী, বিবি আসান্নিসা, আসাদ আলী মৌলভী এবং যশোধর কুমার পাইন। বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছিল জমিদার গণি মিয়ার কথা, পরবর্তী কালে যিনি এ কারণে নবাব খেতাব পেয়েছিলেন।[৫৬] নবাব গণি বলেছিলেন, 'এই সঙ্কটময় সময়ে আমার উপস্থিতি সরকারকে সাহস যোগাবে। আমার অনুপস্থিতিতে আতঙ্ক বিস্তার করবে যা রোধে আমরা এখন শঙ্কিত।' তিনি তারপর তাঁর বাড়ী দুর্ভেদ্য করেছিলেন, পরিবারবর্গকে সজ্জিত করেছিলেন অস্ত্রে, সরকারকে দান করেছিলেন মোটা অঙ্কের অর্থ। সাহায্য করেছিলেন সরকারকে হাতি, ঘোড়া, নৌকো সবকিছু দিয়ে।[৫৭] এক কথায় বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের জমিদার, তিনি হিন্দুমুসলমান যাই হোন না কেন সমর্থন করেছিলেন ঔপনিবেশিক সরকারকে। কারণ নিজ অস্তিত্বের জন্য তারা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিলেন ঔপনিবেশিক শাসনের ওপর। (পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

মধ্যশ্রেণী, পেশাজীবীদের একাংশও সমর্থন করেছিলেন ইংরেজদের। ঢাকায় সিপাহীদের নিপাতের খবর শুনে ভদ্রলোকরা বেশ উল্লসিত হয়েছিলেন। চাকুরিজীবী মধ্যশ্রেণীরা ইংরেজ শাসনে প্রগতির পথ লক্ষ্য করেছিলেন। প্রাক ইংরেজ আমলকে তারা মনে করতেন ভয়াবহ সামন্তযুগ বলে।[৫৮] তবে পূর্ববঙ্গের শহরবাসীদের বিরাট অংশ যে ইংরেজদের সহযোগীতা করেছিল এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। বরং সরকারী এবং অন্যান্য সূত্রে জানা যায়, সরকারকে ঐ সময় তারা এড়িয়ে চলতে চেয়েছিল। সরকারের পক্ষে তখন বাংলাদেশ থেকে রসদ ও যানবাহন সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং জোর করে কৃষকদের কাছ থেকে তা সংগ্রহের জন্য পাশ করতে হয়েছিল 'ইমপ্রেসমেন্ট এ্যাক্ট'। এই আইনবলেও সরকার তেমন সুবিধে করতে পারেনি।[৫৯] রংপুরের কালেক্টর সরকারকে জানিয়েছিলেন, সাধারণ মানুষ সৈন্যদের এড়িয়ে চলে এবং রসদ ও অন্যান্য জিনিসপত্র যাতে সরবরাহ করতে না হয় সে জন্য পালিয়ে বেড়ায়।[৬০]

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ, ইংরেজরা দমন করেছিল দু'বছরের মধ্যে। বিদ্রোহ দমিত হয়েছিল সত্যি কিন্তু এর স্মৃতি কখনও ভারতীয়দের [বা বাঙালীদের] মন থেকে মুছে যায় নি। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসীম। পরবর্তীকালের ভারতীয় জেনারেশনকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল এ বিদ্রোহ। বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে, লোকগাথায় টিকে ছিল বিদ্রোহীদের স্মৃতি।[৬১]

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ তাৎক্ষণিক ভাবে না হলেও, পরবর্তী সময়ের জন্যে কিছু প্রতীক মূল্যবোধের সৃষ্টি করেছিল। প্রথমত, সাধারণ মানুষের মনে অন্তত এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, বৃটিশ শাসন অমোঘ নয়। এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করা চলে। দ্বিতীয়, এ বিদ্রোহ কিছু জাতীয় বীরের সৃষ্টি করেছিল। এবং প্রায় প্রত্যেক আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বে এ ধরনের কিছু বীরের প্রয়োজন হয়। ভারতীয়রা তা' পেয়েছিল। এর প্রতিফলন দেখি আমরা সাধারণ মানুষের মধ্যে।

১৮৫৭ সালের ঘটনাবলী পূর্ববঙ্গের কৃষক নীরব দর্শক হিসেবেই অবলোকন করেছিলেন, কিন্তু, এসব ঘটনাবলী যে তার ওপর ছাপ ফেলেনি একথা বলা যাবে না। কারণ এ বিদ্রোহের দু'বছর পরই আমরা দেখি বাংলা জুড়ে শুরু হয়েছিল নীল বিদ্রোহ। ঔপনিবেশিক প্রতিভূদের বিরুদ্ধে

যে প্রতিবাদ করা যায়, কৃষকদের মনে অন্তত এ চেতনার সৃষ্টি হয়েছিল। শুধু তাই নয়, যশোর খুলনায় নীলবিদ্রোহের সময় দেখা গেছে, চাষীরা তাদের নেতাদের নাম আদর করে রেখেছিলেন নানা সাহেব বা তাতিয়া তোপী।[৬২] আসলে, অন্যান্য অঞ্চলের মত, পূর্ববঙ্গেও বিদ্রোহের উপকরণ জমা হয়েছিল, কিন্তু সফল যোগাযোগের অভাবেই ব্যাপক বিদ্রোহ এখানে ঘটেনি।[৬৩]

২. ব্রাহ্ম আন্দোলন

উনিশ শতকের বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে ব্রাহ্ম আন্দোলন প্রধান যা ঐতিহ্যগত হিন্দু ধর্মের মূল্যবোধের সঙ্গে পাশ্চাত্যের খৃষ্ট ধর্মের নীতিগত ও সামাজিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিল।[৬৪] রেঁনেসার সময়, প্রটেষ্টান্ট আন্দোলন ইউরোপের জন্যে যা করেছিল, বাংলায় ব্রাহ্ম আন্দোলন করেছিল অনেকটা তাই। অবশ্য, প্রটেষ্টান্ট আন্দোলনের প্রভাব সমাজ রাজনীতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন ব্যাপক ছিল, ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রভাব তার সংগে তুলনীয় নয়, কিন্তু বাংলার সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর একটি বিশেষ অংশে ব্রাহ্ম আন্দোলন পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেছিল, সৃষ্টি করেছিল কিছু নতুন মূল্যবোধের, সচলতা এনেছিল অনড় সমাজে বাদ প্রতিবাদ, তর্কবির্তক, আলোড়ন তুলে। ব্রাহ্ম আন্দোলন, অন্তত সে জন্যে উনিশ শতকের বাংলায়তো বটেই, পূর্ববঙ্গের সমাজের জন্যেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রাহ্ম আন্দোলনের শুরু বলা যেতে পারে ১৮১৫ সালে রামমোহন রায় প্রবর্তিত 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা থেকে।[৬৫] সেই থেকে বিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত—এই সুদীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলন অগ্রসর হয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্যে আমরা ব্রাহ্ম আন্দোলনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে নিতে পারি।

প্রথম পর্যায়ে, আমরা দেখি, রামমোহন রায় এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। 'আত্মীয় সভা' অংকুর হলেও 'ব্রাহ্মসমাজ' হিসেবে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল আরো তেরবছর পর। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে, হিন্দু সমাজের ব্যভিচার দুর্নীতি ও বহিরাগত খৃষ্টান প্রচারকদের হিন্দুধর্ম বিরোধী প্রচারণা আলোড়িত করেছিল রামমোহনকে বা বলা চলে মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি ধর্ম সংকটের। এবং তাই

বোধহয় 'ব্রহ্ম ধর্মের মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন ও সংস্কার সাধনে'[৬৬] ১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট, রামমোহন ভাড়া করা এক বাড়ীতে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রামমোহন বোধহয় স্বতন্ত্র কোন ধর্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করার কল্পনা করেন নি কারণ তাঁর সমাজে সব ধর্মের লোকই উপাসনায় যোগ দিতে পারতেন। শুধু নিষিদ্ধ ছিল কোন সাম্প্রদায়িক নামে ভগবানের উপাসনা ব প্রতিমূর্তি ব্যবহার এবং পানভোজন।

১৮৩৩ সালে ইংল্যাণ্ডে, রামমোহনের মৃত্যু হলে ব্রাহ্ম সমাজ নির্জীব হয়ে পড়েছিল। তবে রামমোহনের কর্মকাণ্ড তৎকালীন সমাজে আঘাত হেনেছিল। এরপর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রহণ করেছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের ভার। শুরু হলো ব্রাহ্ম আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়।

দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন ব্রাহ্ম আন্দোলনের জন্যে ছিল এক বিরাট ঘটনা। তৎকালীন বাংলার নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা এতে অংশ নিয়েছিলেন এবং সে সভাই 'ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনা ও ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের ভার' গ্রহণ করেছিল।[৬৭] আগে সমাজের কোন বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন ছিল না। পৌত্তলিকতা বর্জনকে মূল নীতি করে দেবেন্দ্রনাথ কিছু নিয়ম কানুন প্রবর্তন করেছিলেন। ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ ও একুশজন ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, 'ব্রাহ্ম সমাজে এ একটা নুতন ব্যাপার। পূর্ব্বে ব্রাহ্ম সমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্ম ধর্ম হইল।'[৬৮] সভার মুখপত্র রূপে দেবেন্দ্রনাথের ভাষায়, 'কার্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্ন সভ্যদের' মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপনের জন্যে (১৮৪৩ সালের ১৬ আগস্ট) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হতে লাগলো।[৬৯] পরবর্তীকালে আমরা দেখবো ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারে এ পত্রিকা পালন করেছিল এক বিরাট ভূমিকা।

কিন্তু ১৮৪৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত ব্রাহ্ম সমাজ বা ধর্ম পরিচিত ছিল 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম' নামে। নাম দেখেই বোঝা যায়, হিন্দু ধর্ম থেকে বিচ্যুত না হয়ে শুধু হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতা বিরোধীসূত্রের ওপরই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের নেতৃত্বে তত্ত্ববোধিনী সভার তরুণ সভ্যরা বেদান্তের অভ্রান্ততা নিয়ে প্রশ্ন তুললে দেবেন্দ্রনাথ অনেক দ্বন্দ্বের পর বেদান্তের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস পরিত্যাগ করেছিলেন। এর ফলে ব্রাহ্ম

ধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের নীতিগত পার্থক্য সূচিত হয়েছিল কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সমাজের অভ্যন্তরে নবীন ও প্রবীনদের দ্বন্দ্ব নিরসন করতে পারেন নি। তবে কেশবচন্দ্রের 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত মূল বা আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান অবদান হল (ক) খৃষ্টান ধর্মের প্রচার রোধ করা এবং (খ) পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণকারী ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের স্বদেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।[৭১] শুধু তাই নয়, মাতৃভাষা বাংলাকে তাঁরা নিজেদের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন যার গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্রাহ্ম আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়েছিল ১৮৫৭ সালে, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম সমাজে যোগদানের মাধ্যমে। ১৮৬২ সালে দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে সমাজের আচার্য হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন কিন্তু অচিরেই দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর নীতিগত বিরোধ শুরু হয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন। পৌত্তলিকতা বিরোধীতায় তাঁর মনে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনগুলি তিনি মনে করতেন হিন্দু আইন বা রীতিনীতি ধরে অগ্রসর হবে ক্রমান্বয়ে। কেশবচন্দ্র অগ্রসর হয়েছিলেন খৃষ্টান ধর্মের দৃষ্টিকোন থেকে। এ কারণে বিরোধ শুরু হয়েছিল জাতি বর্ণ উপবীত ত্যাগ করা ইত্যাদি নিয়ে। ফলে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুসারীরা ১৮৬৫ সালে স্থাপন করেছিলেন নতুন সমাজ—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ। দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত সমাজের নাম হল আদি ব্রাহ্ম সমাজ।

১৮৬১ সালে কেশবচন্দ্র ঘোষণা করেছিলেন, দেশে ব্রাহ্ম (সমাজ) একটি শক্তিতে পরিণত হতে এসেছে।[৭১] ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ নামকরণেই বোঝা যায়, সর্বভারতীয় একটি চিন্তাধারা তাঁর মনে কাজ করছিল। আর ১৮৩০ সালে ব্রাহ্ম সমাজের সংখ্যা ছিল মাত্র একটি, ১৮৭৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ১০৭ টিতে।[৭১]

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের একটি প্রধান কাজ ছিল সরকারকে চাপ দিয়ে ১৮৭২ সালে 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাকট' পাশ করানো। এই আইন পাশের ফলে ব্রাহ্মরা হিন্দু ধর্মের গণ্ডীর বাইরে চলে গিয়েছিলে।

কিন্তু কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তরুণ ব্রাহ্মদেরও বিরোধ শুরু হয়েছিল বিভিন্ন বিষয়ে এবং তা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছিল ১৮৭৮ সালে যখন কেশবচন্দ্র 'ভগবানের প্রত্যাদেশ'—এর দোহাই দিয়ে কুচবিহারের নাবালক

রাজকুমারের সঙ্গে তাঁর নাবালিকা কন্যার বিয়ের কথা ঘোষনা করেছিলেন। ফলে ১৮৭৮ সালের ১৫মে কলকাতা টাউন হলে এক সভা করে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখের নেতৃত্বে স্থাপিত হয়েছিল 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অবদান—গণতন্ত্রায়ন। গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৮০ এর দিকে কেশবচন্দ্র যখন শুধু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে 'নববিধান' নামে নতুন মত ঘোষনা করেছিলেন তখন শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের নেতৃত্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে বক্তব্য রাখছিল।

পৌত্তলিকতা বর্জনের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল ব্রাহ্ম আন্দোলনের। এই উদ্দেশ্য পরবর্তীকালে আরো সফলতা লাভ করেছিল। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ নিছক ধর্মীয় গণ্ডি ছেড়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৭৮ সালের ২১ মার্চ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নে' প্রকাশিত বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। সেখানে লেখা হয়েছিল, আমরা দেখাতে চেষ্টা করব যে, ব্রাহ্ম ধর্ম শুধু আধ্যাত্মিকভাবেই মানুষকে উন্নত করবে না বরং সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, শারীরিক এবং রাজনৈতিক ভাবেও উন্নত করবে।...ফলাফলের পরোয়া না করে আমরা নির্ভয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনে ব্রতী হবো।[৭৩]

এটা ঠিক যে, ১৮৭৮ সালে ব্রাহ্ম সমাজে ভাঙ্গনের পর ব্রাহ্ম সমাজের আর তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি, সভ্য সংখ্যাও কমেছে ক্রমান্বয়ে। তিনটি সমাজই অবস্থান করেছিল পাশাপাশি। নীতিগতভাবে যদিও তাদের কিছু পার্থক্য ছিল কিন্তু সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে তাদের কোন মতভেদ ছিল বলে মনে হয় না।

এ পটভূমিকায় আমি আলোচনা করবো পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিকাশ, অবদান, প্রতিক্রিয়া ও ক্ষয় সম্পর্কে।

ক. পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন

পূর্ববঙ্গে প্রথম ব্রহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল ঢাকায়। ১৮৪৬ সালে স্থাপিত ঢাকার সমাজ ছিল কলকাতার বাইরে স্থাপিত প্রথম সমাজ। ঢাকার সমাজ গড়ে উঠেছিল কলকাতার সমাজের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে। ঢাকা সমাজের প্রধান উদ্যোক্তা ব্রজসুন্দর মিত্রের সঙ্গে দেবেন্দ্র-

নাথের পূর্বে কখনও দেখা হয়নি বা তিনি কলকাতা সমাজের সভ্যও ছিলেন না। তবে শিবনাথ শাস্ত্রীর কথা ধরলে বলতে হয়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পড়েই ব্রজসুন্দর সমাজ গঠনে অগ্রসর হয়েছিলেন। খারাপ যাতায়াত ব্যবস্থা এবং প্রচারকের অভাবে ঐ সময় ব্রাহ্ম সমাজের বিকাশে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। ঢাকার সমাজ স্থাপনের পর অবশ্য কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল এবং পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম ধর্ম বিস্তারে কলকাতার সমাজ নানাভাবে সহায়তা করেছিল। শুধু তাই নয়, কলকাতার ব্রাহ্মদের জোরের কারণ ছিল ঢাকার এই সমাজ।[৭৪]

ঢাকার সমাজ স্থাপনের পর ১৮৭০ এর মধ্যে পূর্ববঙ্গের প্রায় প্রধান প্রধান শহরগুলিতে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হয়েছিল। ঢাকার সমাজকে সংহত করে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল প্রচারক। এ ব্যাপারে কলকাতা থেকে প্রেরিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কালীনারায়ণ গুপ্ত, কেশবচন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রচারকদের প্রচার ছাড়াও পূর্ব-বঙ্গের কোন ব্রাহ্ম নিজ কর্মস্হল ছেড়ে অন্য কর্মস্হলে গেলে একটি ব্রাহ্ম সমাজ বা স্কুল গড়ার চেষ্টা করতেন সেখানে।

ব্রজসুন্দর মিত্র ও অন্যান্যরা ঢাকায় প্রথম সমাজ স্হাপন করলেও দীননাথ সেন বা পরবর্তীকালে বঙ্গচন্দ্র রায়, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় বা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত তরুণ, ব্রাহ্ম সমাজে যোগ না দেওয়া পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন, আন্দোলন হয়ে ওঠেনি। কলকাতার মত পূর্ববাঙলা ব্রাহ্ম সমাজও ভেঙ্গেছে তিনবার কিন্তু সমাজের তরুন কর্মীরা ক্ষান্ত দেননি সমাজ সংস্কারে।

এটা ঠিক যে, পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম সংখ্যা বেশী ছিল না। অনেকে হয়ত ব্রাহ্ম সমাজে যেতেন, সহানুভূতিও দেখাতেন কিন্তু আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ১৮৭৭ সালের তালিকা অনুযায়ী পূর্ববঙ্গে স্হাপিত ব্রাহ্ম সমাজের সংখ্যা ছিল, কুড়িটি। ১৮৯২ সালে সে সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল, সবমিলিয়ে ৪২ টিতে।[৭৫] কিন্তু আমার আলোচ্য সময়ের শেষ দশক থেকে এখানে ব্রাহ্মদের প্রভাব কমতে থাকে। পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে, মাঝে মাঝে অজ পাঁড়াগায়ে সমাজ স্হাপিত হলেও প্রভাব-শালী সমাজ ছিল ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বরিশালে। আমি এখানে প্রভাবশালী সমাজ স্হাপন, আন্দোলনের বিকাশ ও পূর্ববঙ্গের সমাজে এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

খ. ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজ

ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হয়েছিল তৎকালীন ঢাকার আবগারী বিভাগের সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট ব্রজসুন্দর মিত্র (তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৬) ও তাঁর কয়েকজন বন্ধুর প্রচেষ্টায়। শাঁখারি বাজারের পূর্ব সীমায়, রাস্তার উত্তরদিকে, ব্রজসুন্দরের বাড়ীতে, তিনি ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু ১৮৪৬ সালের ৬ ডিসেম্বরে (২২ অগ্রাহায়ণ, ১২৫৩), ঢাকায় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ঐ সভায় ব্রজসুন্দর ছাড়া আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন, যাবদচন্দ্র বসু, রামকুমার বসু, গোবিন্দচন্দ্র বসু, বিশ্বম্ভর দাস ও নরোত্তম মল্লিক। এই দিনটিকেই ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠার দিন বলে গণ্য করা হয়।[৭৬]

১৮৪৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর ব্রজসুন্দরের বাসগৃহে, ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম উপাসনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ উপলক্ষে ব্রজসুন্দর অনেককে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এবং কৌতুহলবশতঃ এত লোকের সমাগম হয়েছিল যে 'স্থানাভাবে অনেক দণ্ডায়মান থাকিতে এবং অপর অনেকে দণ্ডায়মান থাকিবার স্থান না পাইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন।' প্রাথমিক ভাবে এই সমাজের উদ্দেশ্য ছিল "লোকের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার।" কিন্তু তা'সত্বেও রক্ষণশীল হিন্দুরা এর বিরোধীতা শুরু করেছিলেন।[৭৭]

রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরোধীতার কারণে প্রথম তিনমাস যাদবচন্দ্র বসুর বাসায় রাতে গোপনে তাঁরা উপাসনা করতেন। এরপর ১৮৪৭ সালের ৭ মার্চ, ব্রজসুন্দর মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র বসু, রামকুমার বসু ও বিশ্বম্ভর দাস যাদবচন্দ্রের গৃহে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ডালবাজারের রাইমোহনরায়ও একই দিনে উপরোক্তদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।[৭৮]

১৮৪৭ সালের ১৩ মার্চ উদয়চন্দ্র আঢ্যের প্রভাবে বাংলাবোজারে শ্রীশচন্দ্র দাসের 'ত্রিপলী' নামে একটি পুরানো বাড়ীতে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্ম সমাজের কাজ শুরু হয়েছিল। সভার কাজ চালাবার জন্যে তখন নিয়মাবলী, চাঁদা এবং ব্রাহ্মসঙ্গীত করার জন্যে ঠিক করা হয়েছিল গায়ক। পণ্ডিত রামকুমার বেদপঞ্চানন এবং যাদবচন্দ্র বসু ছিলেন যথাক্রমে সমাজের প্রথম উপাচার্য্য এবং সম্পাদক।[৭৯]

ঐ সময়ে (আনুমানিক ১৮৫০-৫১) ব্রজসুন্দর ঢাকা থেকে কুমিল্লায় বদলী হয়ে গেলে সমাজের কাজ হয়ে পড়েছিল স্তিমিত এবং তখন

কয়েক বছর এর প্রায় 'অস্তিত্বই ছিল না।' বঙ্গচন্দ্র রায় লিখেছিলেন, 'যে রূপে ব্রাহ্ম সমাজে কাজ চলিতেছিল, তাহা নিতান্তই নিরুৎসাহ-জনক। পুস্তক পাঠ করিয়া উপাসনা ও উপদেশ হইত ; রাত্র নয় ঘটিকার সময় 'অয়ি সুখময়ী' উষে, কে তোমারে নিরমিল' ইত্যাদি গান হইত। 'আজ আমদের কি আনন্দের দিন, আজ আমাদের বেহালা সমাজের সাম্বৎসরিক' এইরূপ উপদেশ পাঠ হইত।'[৮০]

১৮৫৫ এর দিকে ব্রজসুন্দর ফিরে এসেছিলেন ঢাকায় এবং নতুন-ভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সমাজের কাজে। বর্তমানে যেখানে মিটফোর্ড হাসপাতাল সেখানে নিজ গৃহে ব্রজসুন্দর স্হানান্তরিত করেছিলেন সমাজের কার্যাবলী।[৮১] ইতিমধ্যে অনেকেই ত্যাগ করেছিলেন সমাজ, অর্থসংকটও ছিল চরম কিন্তু তা সত্বেও পরবর্তী সাতবছর ব্রজসুন্দর নিজ ব্যয়ে অব্যাহত রেখেছিলেন সমাজের কাজ।[৮২] ইতিমধ্যে (১৮৫৬-৬২) গুরুপ্রসাদ সেন, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, দীনবন্ধু মৌলিক, দীননাথ সেন প্রমুখ ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়ে এর কার্যক্রম আরো জোরদার করে তুলছিলেন।

১৮৫৭ সালে ব্রজসুন্দর আরমানিটোলায় নিজের জন্যে বাড়ী কিনে তার একাংশ ছেড়ে দিয়েছিলেন সমাজের কাজের জন্যে। ঐ সময় দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজ পরিদর্শনে এসেছিলেন ঢাকায়। কলকাতায় ফেরার সময় তিনি দয়াল শিরোমনিকে নিয়োগ করে গিয়েছিলেন ঢাকার উপাচার্য পদে। দয়াল শিরোমনি এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন চারবছর।[৮৩]

১৮৬১ সালের ১৬ জুন, দীননাথ সেন, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এবং গোবিন্দ প্রসাদ রায়, প্রধানতঃ ছাত্রদের জন্যে স্থাপন করেছিলেন শাখা ব্রাহ্মসমাজ। এ পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁরা জানিয়েছিলেন, 'কাহারও মনে সংশয় জন্মিলে তাহার মীমাংসার চেষ্টা' করবেন। প্রতি রোববার অনুষ্ঠিত হত সভার অধিবেশন।[৮৪] দীননাথ এখানেই থেমে থাকেন নি। ব্রাহ্ম ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্যে ১৮৬৩ সালে স্থাপন করে-ছিলেন তিনি ব্রাহ্ম স্কুল। ব্রজসুন্দর এ জন্যে তাঁর বাড়ীর নীচের তলা ছেড়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মাসিক ত্রিশ টাকা সাহায্যের।[৮৫]

১৮৬৩ সালে বরিশাল থেকে ব্রাহ্ম কর্মী দুর্গামোহন দাস ও কালী-মোহন দাস আসেন ঢাকায়। প্রধানত তাঁদের উদ্যোগে তখন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল 'ভ্রাতৃসমাজ' যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাতিভেদ দূর করা।

ঢাকার বেশ কিছু শিক্ষিত তরুণ, (যেমন, প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার, শিবচন্দ্র নাগ) এই সভার সভ্য হয়ে জাতিভেদ ত্যাগ করেছিলেন ফলে তখন ঢাকায় তুমুল হৈচৈ শুরু হয়েছিল।[৮৬]

কিন্তু এতোসব আয়োজন সত্বেও ব্রাহ্মরা সমাজে তখনও কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেননি। কারণ অনেক ব্রাহ্ম তখনও হিন্দু ধর্মের আচার আচরণে বিশ্বাসী ছিলেন। যাহোক, ঢাকার সমাজে প্রাণ সঞ্চার হয়েছিল সাধু অঘোরনাথ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আগমনে। ব্রাহ্মস্কুল পরিচালনার জন্যে অঘোরনাথকে কলকাতা থেকে ঢাকা পাঠানো হয়েছিল।

ব্রজসুন্দরকে লেখা বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথের দু'টি চিঠি থেকে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের ঐ সময়ের অবস্থা খানিকটা অনুধাবন করা যায়। ১৮৬৫ সালে বিজয়কৃষ্ণ লিখেছিলেন।'...এক্ষণ ঢাকাতে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাব এত ম্লান যে কেবল নাম মাত্র শ্রবণ করিতেছি। এখনও ব্রাহ্ম ধর্ম এখানকার নিদ্রিত জনসাধারণের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় নাই। বস্তুত ঢাকাতে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাব নাই বলিলেই হয়।'[৮৭] আর অঘোরনাথ লিখেছিলেন, ঢাকার লোকদের নৈতিকমান খুবই নীচু। শিক্ষিতরা মদ্যপান ও লাম্পট্যে মত্ত।[৮৮]

বিজয়কৃষ্ণ ঢাকাতেই শুধু তাঁর প্রচার সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তাঁর বক্তৃতা শুনে ঢাকায় প্রকাশ্যে অনেকে হিন্দুধর্মের বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন এবং তা নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজে সূত্রপাত হয়েছিল বিরোধের। কারণ, তখনও অনেকে চান নি আনুষ্ঠানিক দীক্ষার দ্বারা ব্রাহ্মরা হিন্দু সমাজ থেকে একেবারে পৃথক হয়ে যাক। ফলে ব্রাহ্ম সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল দ্বন্দ্বের।[৮৯]

বলা যেতে পারে, তখন থেকেই ঢাকার সমাজ সৃষ্টি করেছিল প্রতিক্রিয়ার। এরপর ১৮৬৫ ও ১৮৬৯ সালে কেশবচন্দ্রের পূর্ববঙ্গ সফর তা আরো তীব্র করে তুলেছিল। শুধু তাই নয়, কেশবচন্দ্রের সফর পূর্ববঙ্গের তরুণ ব্রাহ্মদের উৎসাহ যুগিয়েছিল সংস্কার ছিন্ন করার।

১৮৬৫ সালে কেশবচন্দ্র সেন ঢাকায় এলে কলকাতার অনুকরণে এখানেও স্থাপিত হয়েছিল 'সংগত সভা।' সভার উদ্দেশ্য ছিল 'চরিত্রের উন্নতি সাধন ও বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ' করতে লোকদের শিক্ষাদান।[৯০]

ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের প্রায় সব নামী কর্মীরা (যেমন, বঙ্গচন্দ্র রায়, ভুবনমোহন সেন, কালীনারায়ণ গুপ্ত, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ) ছিলেন সংগত সভার সভ্য। এর অধিবেশন হত প্রতি শনিবার সন্ধ্যায়।

প্রত্যেক সভ্যের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে ছিল দৈনিক উপাসনা। 'সপ্তাহান্তে সংগতের অধিবেশনে ডায়েরী পাঠ, নিজেদের দোষ ত্রুটির আলোচনা, এবং সংগে সংগে ব্যাকুল প্রার্থনা ও সঙ্গীত' হত।[৯১]

ঐ একই সময় (১৮৬৫) ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের কর্মী জজ অভয়-কুমার দত্ত, বরিশাল থেকে বাইশ বছরের যুবক কালী প্রসন্ন ঘোষকে নিজের অফিসে হেড ক্লার্ক হিসেবে নিয়ে এসেছিলেন। কালী প্রসন্ন ভালো বক্তৃতা করতে পারতেন এবং অচিরেই ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার নিয়ে ঢাকায় তাঁর সংগে খৃষ্টান প্রচারকদের বাক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল।[৯২]

জালাল উদ্দিন মিয়া ছিলেন এক দরিদ্র মুসলমান ছাত্র, ব্রাহ্ম ছাত্রদের সংগে মেসে থেকে ব্রাহ্ম স্কুলে পড়তেন। বোধহয় এ কারণেই তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়েছিলেন। একবার, সংগত সভার সদস্য প্রসন্নকুমার সেন বিয়ে করে ফিরে এসে মেসের বন্ধুদের জন্যে একটি ভোজের আয়োজন করেছিলেন। বঙ্গচন্দ্র রায়, ভুবন মোহন সেন, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত প্রমুখ জালালের বন্ধুরা তাঁর সংগে একত্রে আহার করেছিলেন। এ কথা জানাজানি হয়ে গেলে রক্ষণশীল 'হিন্দু সমাজের আন্দোলন বহ্নি চতুর্দিকে প্রবলভাবে ব্যাপ্ত' হয়েছিল।[৯৩] বলা যেতে পারে, উনিশ শতকের ষাটদশকের মধ্যভাগে, ঢাকায় ব্রাহ্ম সমাজ জমে উঠেছিল। ঐ সময়ের একটি চিত্র পাওয়া যাবে, ব্রজসুন্দরকে লেখা অঘোরনাথের একটি চিঠি থেকে (১৭, ৭, ১৮৬৫)—। '...আজকাল ব্রাহ্ম ধর্মের জয় সর্ব্বত্র। এখন কিঞ্চিৎ জীবন্তভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের মধ্যে উৎসাহানল প্রজ্জলিত হইয়াছে। সম্প্রতি উপাসক সংখ্যা অধিক হওয়ায় সমাজে আর স্থান বা আসনের সমাবেশ হয় না। তাড়িত ব্রাহ্মদিগের নিমিত্ত যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল তাহার আর প্রয়োজন হইতেছে না। ইহাতেই ব্রাহ্ম ধর্মের জয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। প্রাচীনদিগের কাল্পনিক বল আর কতদিন থাকিবে।'[৯৪] তবে এরা সবাই যে ব্রাহ্ম ছিলেন তা'নয়। অনেকে নিছক কৌতুহল মেটাবার বা বক্তৃতা শোনার জন্যে আসতেন।

লালবাগ, বাংলাবাজার ও আরমানিটোলা—এই তিনজায়গায় ছিল তখন উপাসনালয়। কিন্তু ইতিমধ্যে সমাজের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উপাসনার জন্যে একটি স্বতন্ত্র মন্দির নির্মাণের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এবং প্রায় পনের হাজার টাকা ব্যয়ে[৯৫] তৎকালীন দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার

সবচেয়ে সুন্দর ব্রাহ্ম মন্দির নির্মিত হয়েছিল বর্তমান জগন্নাথ কলেজের পাশে।[৯৬] ১৮৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর মন্দিরের উদ্বোধন করা হয়েছিল। এর প্রায় তিনমাস আগে ঢাকার ৩২ জন ব্রাহ্মের এক সভায় স্থির করা হয়েছিল 'পূর্ববাংলা ব্রাহ্ম সমাজ, যাহা কিছু দিন পূর্বে সংস্থাপিত' হয়েছিল তার সংগে ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজ 'একীভূত' হবে। মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত হয়ে তৃতীয় বারের মত ঢাকায় এসেছিলেন কেশবচন্দ্র। ৭ ডিসেম্বর কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে প্রকাশ্যে একত্রিশ জন ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।[৯৭] ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজ এরপর থেকে পরিচিত হয়ে উয়েছিল পূর্ব বঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজ নামে।

১৮৬৯ থেকে ১৮৭৯ ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম ভাঙ্গনের পূর্ব পর্যন্ত 'পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজ'এর কাজ এগিয়ে চলেছিল অপ্রতিহত গতিতে। বিভিন্ন সংস্কার সাধনে তাঁদের প্রচেষ্টা পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে নতুন সমাজ স্থাপনে উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। এই সময় ঢাকার সমাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মী ছিলেন নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ভুবনমোহন সেন, বঙ্গচন্দ্র রায় প্রমুখ।

এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে যে অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়নি তা'নয়। তা সবসময়ই ছিল। যেমন, খোল কর্তাল নিয়ে কীর্তন করার ব্যাপারে একবার সৃষ্টি হয়েছিল সংঘাতের। তরুণরা একবার দাবী করেছিল যিনি উপবীত ও ও পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেননি তাঁকে মন্দিরের উপাচার্য্য হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না। ১৮৭২ সালের দিকে অবশ্য এ সব বিরোধ মিটে গিয়েছিল।[৯৮]

১৮৭৮ সালে কুচবিহার বিয়ে নিয়ে কলকাতায় বিরোধ শুরু হলে তার রেশ এসে পৌঁছেছিল ঢাকায়। দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল ঢাকার সমাজ। বঙ্গচন্দ্র রায় ছিলেন উপাচার্য্য। তিনি ছিলেন তখন মুঙ্গেরে। কেশবচন্দ্রের কন্যার বিয়েতে তিনি প্রতিবাদ না করায় 'সদলে পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজ গৃহ হইতে বহিস্কৃত হইতে হয়।'[৯৯] এই বিভক্তির ফলে অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্পর্কও বিনষ্ট হয়েছিল।[১০০] নববিধান সমাজ পরে আরমানিটোলায় নিজেদের জন্যে স্বতন্ত্র ছোট একটি উপাসনাগার তৈরী করেছিল। ঢাকার এই বিভক্ত সমাজ বিভক্ত থেকেই যারযার কাজ করে গেছে। কিন্তু ১৮৬০-৮০ সালে ব্রাহ্ম আন্দোলন

সামগ্রিকভাবে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সেরকমটি আর করতে পারেনি।

ময়মর্য়সিংহ ব্রাহ্ম সমাজ

ময়মনসিংহে ব্রাহ্ম সমাজের গোড়াপত্তন করেছিলেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র বসু। ১৮৫৩ সালে ময়মনসিংহে প্রথম ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি গিয়েছিলেন তার হেড মাষ্টার হয়ে। তাঁরই উদ্যোগে ১৮৫৪ সালে কালীকুমার মোক্তারের বাসায় সাপ্তাহিক উপাসনা শুরু হয়েছিল।[১০১] ভগবানচন্দ্র বসু, ইংরেজী স্কুলের আরেকজন শিক্ষক ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস, বাংলা স্কুলের শিক্ষক গোবিন্দচন্দ্র গুহ এবং ত্রিপুরাশংকর গুপ্ত ছিলেন সমাজে প্রথম সভ্য।[১০২]

প্রথম দশবছর বিভিন্ন সভ্যের বৈঠকখানায় উপাসনা হত। তখন ময়মনসিংহের সমাজ 'ব্রাহ্মজ্ঞান প্রচারের সভামাত্র ছিল। জীবনে মর্ম্মসাধন আরম্ভ হয় নাই, অনুষ্ঠানাদিরও সূত্রপাত হয় নাই।'[১০৩] ১৮৬৫ সালে মন্দিরের জন্যে একটি বাড়ী কিনে সাপ্তাহিক উপাসনার সূত্রপাত করা হয়েছিল।[১০৪]

ময়মনসিংহে প্রথম যারা ব্রাহ্ম সমাজ শুরু করেছিলেন কার্যোপলক্ষে, তাঁরা অনেকে ময়মনসিংহ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। সমাজের কাজকর্ম ঝিমিয়ে পড়েছিল তখন। ১৮৬৫ সালে কেশবচন্দ্র ময়মনসিংহে এসে-ছিলেন কিন্তু তেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেন নি যা করেছিলেন দু'বছর পর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। 'তাঁর বিজয়ভেরীতে নগর কম্পিত হইতে লাগিল।'[১০৫] বিজয়কৃষ্ণের বক্তৃতা শুনে ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস, জমিদার রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ওভারসিয়ার গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'বিজ্ঞাপনী' সম্পাদক জগনাথ অগ্নিহোত্রী উপবীত পরিত্যাগ করে-ছিলেন। শুধু তাই নয় অনেক নতুন ব্রাহ্ম তাঁর সঙ্গে একত্রে আহারও করেছিলেন।[১০৬] ফলে হিন্দুসমাজে যেন ঘৃতাহুতি পড়লো এবং ঢাকার মত এখানেও ব্রাহ্ম নিপীড়ণ শুরু হয়েছিল। এ সময় জেলা স্কুলের কয়েকজন ছাত্র (এরমধ্যে প্রধান ছিলেন শ্রীনাথ চন্দ ও কৃষ্ণকুমার মিত্র) মিলে গঠন করেছিলেন শাখা সমাজ।[১০৭] কালক্রমে শাখা-সমাজের অনেকেই ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রধান স্তম্ভ হয়ে উঠেছিলেন। ময়মনসিংহে ব্রাহ্ম আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে গেছেন সে-খানকার স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ।

১৮৬৮ সালে তৃতীয়বারের মত বিজয়কৃষ্ণ ময়মনসিংহ এসেছিলেন এবং ভক্তি আন্দোলনে ময়মনসিংহ যেন মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মদের সংকীর্তনে কলরবমুখর হয়ে উঠেছিল ময়মনসিংহ। এ সময়ই শেরপুরের জমিদার হরচন্দ্র রায়ের সাহায্যে নতুন মন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছিল এবং তা উদ্বোধন করা হয়েছিল ১৮৬৯ সালে।[১০৮]

ময়মনসিংহে ব্রাহ্ম আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সাধু অঘোরনাথ গুপ্তের অবদান কম নয়। ময়মনসিংহে এসেছিলেন তিনি ১৮৬৯ সালে এবং তাঁর উদ্যোগেই আনুষ্ঠানিক ভাবে অনেকে ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। ময়মনসিংহে প্রথম যারা আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হয়েছিলেন তাঁরা হলেন, কালীকুমার বসু, হরমোহন বসু, মুক্তাগাছা স্কুলের হেডমাষ্টার ললিতমোহন রায়, শরৎচন্দ্র রায়, জেলাস্কুলের ছাত্র বৈকুন্ঠনাথ ঘোষ, পোষ্ট অফিসের কেরানী কিশোরী মোহন চক্রবর্তী।[১০৯] এ ঘটনার পর ময়মনসিংহে ব্রাহ্ম নির্যাতন চরম আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত ময়মনসিংহের ব্রাহ্মরা, ব্রাহ্মদের জন্যে স্থাপন করেছিলেন স্বতন্ত্র আবাসস্থল, দোকান, স্কুল, এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সংবাদপত্রের।

এরপর এলো কুচবিহার বিয়ের প্রসঙ্গ। ময়মনসিংহ সমাজের ১৫ জন ছিলেন কেশব বিরোধী ও চারজন ছিলেন কেশবচন্দ্রের পক্ষে। কিন্তু বিরোধীদের অনেকে বাইরে থাকায় সেই চারজনই মন্দির দখল করে নিয়েছিলেন।[১১০] এ নিয়ে বেশ ঝামেলা হয়েছিল এবং ব্যাপারটি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। পরে অবশ্য দু'পক্ষই আপোষ-মিমাংসায় পৌঁছেছিল। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ নিজের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল ১৮৮২ সালে এবং সেই থেকে আলাদাভাবে তারা নিজেদের কাজ চালিয়ে গিয়েছিল।[১১১]

বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজ

১৮৬০ সালে রামতনু লাহিড়ী বরিশাল জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার হয়ে এলে বরিশালে ব্রাহ্ম আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। রামতনু অবশ্য বেশীদিন ছিলেন না বরিশালে কিন্তু তাঁর স্বল্পকালীন অবস্থান প্রভাব বিস্তার করেছিল তাঁর ছাত্রদের ওপর এবং বপন করেছিল তাদের মধ্যে নতুন চিন্তার বীজ। রামতনুরই ছাত্র রাখালদাস পরে বরিশাল

ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম কর্মী হিসেবে পরিগনিত হয়েছিলেন।

১৮৬১ সালে বরিশালে প্রথম ব্রাহ্মোপসনা শুরু হয়েছিল। ঢাকা নর্মাল স্কুল থেকে পাশ করে, পাঁচজন ছাত্র কার্যোপলক্ষে বরিশাল এসে মিলিত হয়েছিলেন ১৮৬০ সালের এপ্রিলে। এঁরা হলেন, নন্দকুমার সেন, হরিশচন্দ্র মজুমদার, গোপীনাথ রায়, বৈদ্যনাথ রায় এবং ললিতমোহন সেন। এদের প্রচেষ্টায়ই ব্রাহ্মোপসনা শুরু হয়েছিল ১৮৬১ সালে (২৩ জুন)।[১১২] এই পাঁচজনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন লাখুটিয়ার জমিদার নন্দন রাখালচন্দ্র রায়। রাখালচন্দ্রের বাসায়ই গোপনে তারা মিলিত হয়ে উপাসনা করতেন কিন্তু রাখালের বাবা তা জানতে পেরে বাধা দিয়েছিলেন। সুতরাং এরপর থেকে প্রতি বুধবার তাঁরা মিলিত হতেন গাছের ছায়ায় বা নদীর তীরে। এই সময় তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনসপেকটর শ্যামচন্দ্র বোস। তিনি তাঁর বাড়ীর একটি ঘর এদের উপাসনার জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন।[১১৩] একই সময় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বরিশাল এসে সমাজের কাজে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারা প্রসাদ তাঁর বাড়ীর একটি ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন ব্রাহ্মদের কাজের জন্যে এবং সে থেকে প্রকাশ্যে বরিশালে ব্রাহ্মরা কাজকর্ম শুরু করেছিলেন।[১১৪]

১৮৬৫ সালে সরকারী উকিল কাশীশ্বর দাসের ছেলে দুর্গামোহন দাস ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজে তাঁর যোগদান শুধু বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজেই নয়, সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্ম সমাজের জন্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের কাজে তাঁকে সবচেয়ে বেশী সহায়তা করেছিলেন ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগীর, গিরিশচন্দ্র মজুমদার[১১৫] এবং সর্বানন্দ দাস। এ চারজন নতুন প্রাণ দান করেছিলেন বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজকে।[১১৬]

ঐ বছরই স্থানীয় জমিদার চণ্ডীচরণ রায়ের দেওয়া একখণ্ড জমির ওপর ব্রাহ্ম মন্দিরের উদ্বোধন করা হয়েছিল। একই সময় বিজয়কৃষ্ণ বরিশাল এসে পৌঁছেছিলেন প্রচারের জন্যে। রাখালচন্দ্র তাঁকে নিজ বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানালে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। দুর্গামোহন, রাখালদাস—এঁরা এ সময় কোন ভ্রুক্ষেপ না করে বিভিন্ন সমাজ সংস্কার মূলক কাজ শুরু করেছিলেন।

১৮৭১ সালে দুর্গামোহন কলকাতায় চলে গেলে জেলাস্কুলের হেডমাষ্টার জগৎবন্ধু লাহা ব্রাহ্ম সমাজের ভার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আমলে স্থাপিত হয়েছিল সঙ্গত সভা, স্ত্রী উন্নতি সভা, বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদি।

১৮৭৮ সালে কুচবিহার বিয়ে নিয়ে বিতর্ক শুরু হলে বরিশালের অধিকাংশ ব্রাহ্ম, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করেছিলেন।

পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলনের সূত্রপাত ১৮৪৬ সালে হলেও তা বিকশিত হয়েছিল ১৮৬০ এর দিকে। ১৮৬০ থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত বলা যেতে পারে পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজের স্বর্ণযুগ। ঐ সময় পূর্ববঙ্গের প্রধান প্রধান অঞ্চলগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রাহ্ম সমাজ এবং ব্রাহ্মরাও বিভিন্ন সমাজ সংস্কার ও সেবামূলক কাজে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর দেওয়া তালিকা থেকে এ কথা পরিস্কার হয়ে ওঠে—

ক. ১৮৪০-৫০ পর্যন্ত ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হয়েছিল শুধু ঢাকা ও কুমারখালীতে।

খ. ১৮৫০-৬০ এর ভেতর সমাজ স্থাপিত হয়েছিল চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা, বগুড়া ও কুমিল্লায়।

গ. ১৮৬০ থেকে ১৮৮০ এর ভেতর ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হয়েছিল, যশোর, বরিশাল, দিনাজপুর, খুলনা, রংপুর, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, কুড়িগ্রাম, পিরোজপুর, সৈয়দপুর প্রভৃতি অঞ্চলে।[১১৭]

১৮৬০ এর আগে ঢাকা ও মফস্বলে স্হাপিত সমাজগুলোর শক্তিশালী কোন সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল না। সরকারী কার্যোপলক্ষে কোন ব্রাহ্ম কোথায়ও বদলি হয়ে গেলে তিনি হয়ত সেখানে একটি সমাজ স্থাপন করতেন। প্রধানত তাঁকে কেন্দ্র করেই তাঁর বন্ধু বান্ধব সহ সমাজ গড়ে উঠতো। যেমন, ব্রজসুন্দর ঢাকায় থাকাকালীন স্হাপন করেছিলেন ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ, পরে কুমিল্লায় বদলি হলে সেখানে স্হাপন করেছিলেন কুমিল্লা ব্রাহ্ম সমাজ। ভগবানচন্দ্র বসু ময়মনসিংহে কার্যোপলক্ষে গেলে সেখানে সমাজ স্হাপন করেছিলেন। দিনাজপুরে প্রায় একক প্রচেষ্টায় ব্রাহ্ম সমাজ স্হাপন করেছিলেন ভুবনমোহন।[১১৮] কার্যোপলক্ষে আবার তাঁরা বদলি হয়ে গেলে সমাজের কাজ ঝিমিয়ে পড়তো।

১৮৬০ এর পর দেখা যায়, স্কুল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকরা

আগ্রহী হয়ে উঠছে সমাজ সম্পর্কে। স্হানীয়ভাবে স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাও এর কারণ হতে পারে। এঁদের অধিকাংশ নিজ এলাকাতেই থাকতেন। এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনের পর পুরো সময়টা ব্যয় করতেন সমাজের কাজে। এভাবে এ সময় থেকে পূর্ববঙ্গের সমাজগুলি একটি সাংগঠনিক রূপ লাভ করে এবং তাদের কাজকর্ম সংহত করে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, এ বছরগুলিতে সবসময়ই কিছু তরুণ ছাত্র শিক্ষক কর্মী পাওয়া গিয়েছিল যারা প্রবীণদের সঙ্গে মতে না মিললেও নিজেদের কাজ করে যেতে কসুর করেন নি। সবচেয়ে বড় কথা, এ সময় সমাজগুলিতে একক প্রাধান্য লুপ্ত পেয়েছিল এবং বিস্তৃত হয়েছিল যৌথ প্রাধান্য। তবে মনে হয় ১৮৭৮ এর বিভক্তির পর ব্রাহ্ম সমাজের প্রাধান্য কমে আসতে থাকে এবং ১৮৯০ এর পর তা একেবারে ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। এবং ঐ সময় যে প্রাধান্যটুকু ছিল তা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের, নববিধানের নয়। কারণ ঢাকারতো বটেই, মফস্বলেও অধিকাংশ ব্রাহ্ম ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সমর্থক। তবে ঐ সময় ব্রাহ্মদের সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দুদের পার্থক্য করা মাঝে মাঝে মুশকিল হয়ে উঠতো, তাদের গোঁড়ামীর কারণে। ফলে এ সময় থেকে গুরুত্ব হারিয়েছিল ব্রাহ্ম আন্দোলন।

খ. ব্রাহ্ম আন্দোলনে কারা যোগ দিয়েছিলেন ?

ঔপনিবেশিক যুগে বা উনিশ শতক ও বিশ শতকের গোড়ায়, ভারতবর্ষের শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিতদের জন্যে খোলা ছিল প্রাদেশিক ক্যাডারের বিচার, রাজস্ব, যোগাযোগ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের ছোটখাট চাকরিগুলি। এসব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাবজজ, স্কুল ইনসপেকটার প্রায় বদলি হতেন এক মহকুমা থেকে আরেক মহকুমায় এবং যে মহকুমায় তারা যেতেন সেখানেই সামাজিক নেতৃত্ব মোটামুটিভাবে তারাই গ্রহণ করতেন।[১১৯] এই উঠতি মধ্যশ্রেণীর সভ্যরাই ব্রাহ্ম সমাজকে সবসময় সমর্থন জানিয়েছিলেন। ব্রাহ্ম আন্দোলনের আদিপর্বে দেখা যায়, তারা সমর্থন পেয়েছিলেন বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, ফিউডাল বুর্জোয়া জমিদারদের কাছ থেকে।[১২০] বিনয় ঘোষ লিখেছেন, ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্যণীয় বিষয় হল—'প্রচার কার্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সোৎসাহ অংশগ্রহণ।'[১২১] বলা যেতে পারে, ১৮৬০ পর্যন্ত ব্রাহ্ম সংস্কারকরা

প্রায় সবাই কোন না কোন সময় পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসেছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের যারা সদস্য ছিলেন তারা এসেছিলেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রথম তিনটি বর্ণ থেকে। এসব কারণে অনেকে আবার এ আন্দোলনকে 'এলিটিস্ট মুভমেন্ট' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১২২]

পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মদের সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন, প্রথমদিকের ব্রাহ্মরা সবাই ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং এ আন্দোলনটি ছিল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের আন্দোলন।[১২৩]

বিনয় ঘোষ লিখেছেন, 'ঢাকায় ছিল সরকারী কর্মচারীদের প্রাধান্য, ময়মনসিংহে ছিল শিক্ষক গোষ্ঠীর। এইভাবে বৃত্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, গত শতাব্দীর পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে প্রধানতঃ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, উকিল, ব্যারিস্টার ও শিক্ষকরাই ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ প্রচারে উৎসাহী হয়েছিলেন।'[১২৪]

তাঁর এ মন্তব্য আংশিক সত্য। এ কারণে যে, পূর্ববঙ্গের অবস্থা ছিল খানিকটা ভিন্ন। ১৮৬০ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে যারা ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সরকারী কর্মচারী যারা ছিলেন তাঁরা ছিলেন নিম্নস্তরের সরকারী কর্মচারী। এই নিম্নস্তরের সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক এবং ছাত্ররাই ছিলেন পূর্ববঙ্গে ১৮৬০ অব্দি ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রধান সংগঠক।

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, ঢাকায় যাঁরা প্রথম ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু আসলে তা নয়। তাঁরা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু আসলে তা নয়। তাঁরা যখন ব্রাহ্ম আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তখন তাঁরা কেউই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন না। পরে অবশ্য তাদের পদোন্নতি হয়েছিল।[১২৫]

ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম সমাজের প্রথমদিককার তেরজন সদস্যের মধ্যে শিক্ষক ছিলেন ছ'জন, ছাত্র ছ'জন এবং কেরানী একজন।[১২৬] বরিশাল সমাজের প্রথম দিককার সাতজন সভ্যের মধ্যে শিক্ষক ছিলেন চারজন কেরানী দু'জন এবং উকিল একজন। বগুড়া ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (১৮৫৮ সালে) সরকারী স্কুলের সেকেণ্ডমাস্টার কৃষ্ণকুমার সেন।[১২৭]

সুতরাং বিনয় ঘোষ যে লিখেছেন, 'বিদ্যা ও বিত্তের জোরে মধ্যবিত্তের সামাজিক প্রতিষ্ঠা না হলে, এই উৎসাহের প্রকাশ হত কিনা

সন্দেহ'[১২৮]—এ মন্তব্য বোধহয় পুরোপুরি সঠিক নয়। এটা ঠিক একেবারে মফস্বল শহর ময়মনসিংহ বা বরিশালে জেলাস্কুলের একজন শিক্ষক বা একজন কেরানী যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন নিজ অঞ্চলে কিন্তু বিত্ত তাদের তেমন কিছু ছিল না। থাকলে হয়ত, আদিপর্বে এখানে ব্রাহ্মদের এতোটা নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হতো না। পরে অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। বিত্ত ও বিদ্যার জোরে ব্রাহ্মরা নিজেদের খানিকটা প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিলেন। যেমন, ১৮৬৯ সালে ডিস্ট্রিক্ট টাউন এ্যাক্ট বা ছ'আইন প্রবর্তিত হলে, বরিশাল পৌরসভার জন্যে সরকার মনোনীত চৌদ্দজন সদস্যের মধ্যে আট জনই ছিলেন ব্রাহ্ম সমর্থক।[১২৯] এ ছাড়া বহিরাগত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই ব্রাহ্মদের সহানুভূতি দেখাতেন। ১৮৮২-৮৩ সালের পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মদের এক তালিকা অনুযায়ী দেখা যায়, পূর্ববঙ্গে মোট ব্রাহ্ম সংখ্যা ছিল ৮১ জন, বহিরাগত ১১ জন, মোট ৯৩ জন। এর মধ্যে প্রধান রাজকর্মচারী, উকিল ও জমিদার ছিলেন যথাক্রমে, ১০, ১৬ ও ১৬ জন। শিক্ষক, ডাক্তার, কেরানী ও অন্যান্যদের সংখ্যা ছিল, যথাক্রমে ১৬, ৩, ১২, এবং ২০ জন।[১৩০] সুতরাং প্রথম দিকে সামাজিক নিপীড়নের সময় ব্রাহ্মরা একেবারে অসহায় থাকলেও পরে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। এবং তাই বোধহয় পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মসংখ্যা একেবারে নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন।[১৩১]

গ. ব্রাহ্ম আন্দোলন প্রতিক্রিয়া

কৃষি নির্ভর পূর্ববঙ্গের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে। সুতরাং এ অঞ্চলে ব্রাহ্ম আন্দোলন যে সমাজের একটি অংশে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে তা স্বাভাবিক এবং এটাও অস্বাভাবিক নয়, বিদ্যমান সামাজিক শৃংখলা যে ভঙ্গ করতে উদ্যত, সমাজ তাকে নিরস্ত করতে চাইবেই।

পূর্ববঙ্গের সমাজে, ইতিমধ্যে কলকাতা কেন্দ্রিক সামাজিক সংস্কারের রেশ যে পৌঁছায়নি তা'নয় কিন্তু জনমানসে তা'কোন প্রভাব ফেলতে পারে নি। 'প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও রীতিনীতিতে তখনও লোক-জনের ছিল চরম নিষ্ঠা। ধর্ম বা বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে দূরে থাক, গ্রামের সাধারণ মানুষের ঢাকা বা কলকাতা সম্পর্কেও সম্যক কোন

ধারণা ছিল কিনা সন্দেহ।

জেমস ওয়াইজ (১৮৮৩) উল্লেখ করেছেন, একবার ঢাকার এক গ্রামে, ঈদের দিন তিনি দেখতে পেলেন, গ্রামের লোকজন নদীর তীরে জটলা করছে। কারণ? তারা ঈদের নামাজ পড়তে চায় কিন্তু কি ভাবে পড়বে তা তাদের জানা নেই।[১৩২]

নবীনচন্দ্র সেন তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন, বরিশাল ও নোয়াখালীর মধ্যে স্টিমার চলাচল শুরু হলে গ্রামবাসীরা স্টিমারকে পূজো করা শুরু করেছিল।[১৩৩] পাউরুটি বা মুরগী খাওয়া বা চামড়ার জুতো পড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্যে ছিল ধর্ম বিরুদ্ধ। এবং উনিশ শতকের মধ্যভাগে ঢাকা কলেজ বা স্কুলের তরুণ পড়ুয়ারা দেশের সংস্কার দূর করার পরীক্ষা হিসেবে মুরগীর মাংস বা চামড়ার চটির ওপর সন্দেশ রেখে তা তুলে খেতেন।[১৩৪]

সুতরাং এ পটভূমিকায় বিচার করলে দেখা যাবে, পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মরা যে আলোড়নের সৃষ্টি করবেন এটা যেমন স্বাভাবিক তেমনি তাঁরা যে নিপীড়ীতও হবেন সেটাও অস্বাভাবিক নয়। মনে হয়, পুরো ব্রাহ্ম আন্দোলনের সময়টায় এখানকার ব্রাহ্মরাই নির্যাতিত হয়েছিলেন বেশী।[১৩৫]

তবে প্রথম দিকে ব্রাহ্মদের সম্পর্কে সবার কৌতুহল ছিল প্রবল। বৈকুন্ঠনাথ লিখেছেন, তিনি যখন ব্রাহ্ম হয়েছিলেন তখন তাঁকে দেখার জন্যে বিভিন্ন স্হান থেকে লোকজন আসা শুরু করেছিল যেন তিনি এক 'বিস্তৃত কিমাকার জানোয়ারে' পরিণত হয়েছেন।[১৩৬]

১৮৭৬ সালে শ্রীনাথ চন্দ যখন বৈকুন্ঠনাথের বিধবা বোনকে বিয়ে করেছিলেন তখন তা ছিল ময়মনসিংহের প্রথম ব্রাহ্ম ও বিধবা বিবাহ। বিয়ের দিন দেখা গেল, 'সুপ্রশস্ত গৃহ অঙ্গন লোক পূর্ণ, চতুর্দিকের গাছে গাছে লোক, রাজপথের প্রায় সিকি মাইল ব্যাপিয়া মহাজনতা, জন কোলাহলে বিবাহ মন্ত্র শোনা গেল না।'[১৩৭]

ইংরেজী পড়া বা ব্রাহ্ম হয়ে যাওয়াকে লোকে খৃষ্টান হয়ে যাওয়ার সমার্থক মনে করতেন। গ্রামের লোকেরা অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মদের খৃষ্টান বলতেন।[১৩৮] এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৬৯ সালে, ঢাকায় পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজের নব নির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন কালে এক কাঙ্গালীভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। 'দানে উপকৃত হইয়া দরিদ্রগণ অজ্ঞাতাবশতঃ চীৎকার করিয়া বলিতেছিল

'খৃষ্টানদের জয় হউক।' ব্রাহ্মগণ যতই বলিতেছিলেন 'আমরা খৃষ্টান নই' তাহারা তাহাতে কান না দিয়া ততই বলিতেছিল 'খৃষ্টানদের জয় হউক।"[১৩৯]

ব্রাহ্মরা কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলেন তা বোঝা যাবে নির্যাতনের মাত্রা দেখে। পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা ব্রজসুন্দরকে তাঁর বাড়ীঅলা বের করে দিয়েছিলেন বাড়ী থেকে এবং উপাচার্য্য চন্দ্র কিশোরকে একদিন রাস্তায় একা পেয়ে প্রহার করা হয়েছিল।[১৪০] ব্রজ-সুন্দর রাস্তায় বের হলে তাঁকে দেখার জন্যে অনেকেই রাস্তায় বেরোতেন। পরস্পর পরস্পরকে বলতেন, 'দ্যাখ দ্যাখ খৃষ্টান ব্যাটা যায়।' বলে থুথু ফেলতেন, কারো বাসায় তিনি গেলে হুকোর জল ফেলে দেওয়া হত।[১৪১] যে সব তরুণরা ব্রাহ্ম আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের বহিস্কৃত হতে হয়েছিল নিজ গৃহ থেকে। এমনকি কখনও যদি তারা বাড়ী ফিরতেন তা'হলে তাদের ছোঁয়া খাবার পিতামাতারা গ্রহণ করতেন না।[১৪২] শ্রীনাথ দত্ত (১৮৫১-১৯২৯) ব্রাহ্ম হওয়ার পর স্ত্রী পুত্র নিয়ে গ্রামের বাড়ীতে গিয়েছিলেন (ঢাকায়), কিন্তু তাঁর পিতা তাঁকে বা নিজ দৌহিত্রকে রান্না/খাবার ঘরে যেতে দিতেন না। খেতে হত তাঁদের কলাপাতায়।[১৪৩] কালীনারায়ণ গুপ্তের পুত্র কৃষ্ণ গোবিন্দ (পরে স্যার উপাধি প্রাপ্ত) ঢাকায় জালাল উদ্দিনের সঙ্গে আহার করায়, গ্রামবাসীরা কালীনারায়ণকে চাপ দিয়েছিল পুত্রকে ত্যাগ করার জন্যে। কালীনারায়ণ এতে রাজী হননি। ফলে, 'তাঁহাকেও হিন্দুসমাজ বর্জন' করেছিল।[১৪৪]

ব্রাহ্ম প্রচারকদেরও অহরহ এ ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হত। ১৮৭০-৭১ সালের দিকে বৈকুন্ঠনাথ ও আরো কয়েকজন ঢাকার কাছে আমোদিয়া গ্রামে গিয়েছিলেন প্রচারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু গ্রামবাসীরা বদ্ধ পরিকর ছিল, গ্রামে তারা ব্রাহ্ম সংকীর্ত্তন হতে দেবে না। তারা যে দিকেই কীর্ত্তন করতে যেতে চাচ্ছিলেন সেদিকেই গ্রামবাসীরা বাঁশ পুতে পথ আটকাচ্ছিল। বাধ্য হয়ে তাঁরা ফিরে এসেছিলেন নৌকোয়। কিন্তু নৌকোর চারপাশে গ্রামের লোকজন বাচ্চাদের এনে 'মলমূত্র ত্যাগ করাইয়া স্থানটি বিষ্টাময়' করে তুলেছিল। নৌকো তখন অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং তখন একজন 'বিধবাভদ্রকন্যা' ও গ্রামের লোকেরা ইট কাদা ছুড়তে লাগলো। ফলে তাদের প্রচার বন্ধ করে ঢাকা ফিরে আসতে হয়েছিল।[১৪৫]

যশোরে গিরিশচন্দ্র এবং আরো কয়েকজন গিয়েছিলেন প্রচার করতে। কিন্তু জাত যাওয়ার ভয়ে কেউ তাঁদের আশ্রয় দেয় নি। তাঁদের দিনকয়েক কাটাতে হয়েছিল ছোট এক মুদী দোকানে। সে দোকানের চারপাশে আবার বেড়া ছিল না। বাঁশের মাচার ওপর রাতে তাঁরা ঘুমোতেন। নিজেরা বাজার করে, বাটনা বেটে রাখতেন।[১৪৬]

কেশবচন্দ্র যখন ময়মনসিংহ গিয়েছিলেন তখন তাঁর এতো খ্যাতি প্রতিপত্তি সত্ত্বেও কেউ তাঁকে ঘরে আশ্রয় দেয়নি। তাঁকে রাত্রি যাপন করতে হয়েছিল খোলামাঠে এক তাবুতে।[১৪৭] শুধু তাই নয়, সমাজচ্যুত ব্রাহ্মদের বাসায় কোন ভৃত্য চাকরি করতো না। ঘর ঠিক করার জন্যে ঘরামীদের, এমনকি নাপিতকেও ব্রাহ্মদের ক্ষৌরকর্মের জন্যে আসতে দেওয়া হত না।[১৪৮]

সন্তোষে, ব্রাহ্ম সমাজের নতুন উপাসনাগার তৈরী হলে ময়মনসিংহ থেকে একদল ব্রাহ্ম গিয়েছিলেন সেখানে। রাতের বেলায় উৎসব উপলক্ষে ঘরটিকে সাজানো হয়েছিল। কিন্তু সকালে দেখা গেল ঘর খালি। নবীন ব্রাহ্মরা না দমে গ্রামে গেলেন সংকীর্তন করতে। ফিরে এসে দেখলেন পুরো ঘর মলমূত্রে ভরা। একজন ভুইমালিকে 'যথেষ্ট পয়সা' দিয়ে তা পরিস্কার করানো হয়েছিল। কিন্তু গ্রামবাসীরা সেই ভুই-মালিকে সমাজচ্যুত করেছিল। শুধু তাই নয়, কয়েকদিন পর ঘরটিকে একেবারে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[১৪৯]

বরিশালে দুর্গামোহন ও তাঁর স্ত্রী দু'টি বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন। ফলে, দুর্গামোহনের মক্কেলরা তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন। রাস্তায় বেরুলে তাঁকে নিয়ে ছড়া কাটা হত, নিক্ষেপ করা হত ধূলোবালি। দুর্গা-মোহনের নাম উচ্চারণ করে 'হিন্দু ভদ্রলোকরা' থুথু ফেলতেন। অবশ্য এত করেও তাঁকে দমানো যায় নি।[১৫০]

চাঁটগায়, ব্রাহ্ম মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি ব্রাহ্মদের বাড়ীঘরেও আগুন দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। ব্যক্তিগত হুমকীর কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল।[১৫১]

নিপীড়ন ছাড়াও ছিল ভয়াবহ দারিদ্র। অনেক ক্ষেত্রে তাদের অনাহার অর্ধাহারে কাটাতো হত। পিতামাতার ত্যাজ্যপুত্র হওয়াতে সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হতেন অনেকে।

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর পিতা ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। নব-

কান্তর ছোট ভাই নিশিকান্ত এ পরিপ্রেক্ষিতে নবকান্তকে লিখেছিলেন, আপনি যখন গৃহহীন ভবঘুরের মত কাটাচ্ছেন তখন আমি জমিদারী ও দোতলা বাড়ীর মালিক অথচ আমরা একই পিতার সন্তান।[১৫২]

বৈকুন্ঠনাথ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন ঢাকার বিধানপল্লীতে। (দেখুন ফুটনোট ১৫৯) শিশুদের জন্যে দুধ বা নিজের অষুধ কেনার ক্ষমতাও ছিল না তাঁর। খাবার জুটতো না অনেকদিন।[১৫৩]

যশোরের বাগআঁচড়া গ্রামে ৪২টি পরিবারের প্রায় ১২৪ জন স্ত্রী পুরুষ ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, যদুনাথ চক্রবর্তী, মহেন্দ্রনাথ বসু ও ক্ষেত্রমোহন দত্ত তখন ছিলেন সেখানে। সোম প্রকাশে তাঁরা এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিলেন, বাগআঁচড়া ব্রাহ্মদের 'যে কতদূর দুরবস্থা তাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ব্যতীত উপলব্ধি করা কঠিন।' গ্রামের বালকরা 'ইচ্ছা সত্ত্বেও অর্থাভাবে' পড়ালেখা করতে পারছিল না। তাই তাঁরা চারজন 'ঐ দুঃখী ব্রাহ্ম পরিবারদিগের দুরবস্থা সাধারণ অবগত করিতেছি এবং তাঁহাদিগের নিকট ভিক্ষা করিতেছি, সকলে যথাসাধ্য প্রতিমাসে...'যেন কিছু দান করেন।[১৫৪]

কিন্তু এতো উৎপীড়ণ নিপীড়ন দারিদ্র সত্ত্বেও ব্রাহ্মরা দমে যাননি। কারণ কি? প্রথম কথা, উৎপীড়ন, দারিদ্র ইত্যাদিকে তাঁরা অনিবার্য এবং ধর্মের জন্যে তা মেনে নেওয়া কর্তব্য মনে করেছিলেন। যদিও ছিলেন তাঁরা মুষ্টিমেয়, কিন্তু তাঁদের আদর্শ, বিশ্বাস ও আন্তরিকতা ছিল বাতির অকম্প শিখার মত। অঘোরনাথ গুপ্ত যখন ঢাকা ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে এসেছিলেন তখন ব্রজসুন্দরকে লিখেছিলেন (২৬.১২.১৮৬৪), 'আমি সাধারণ শিক্ষকের মত অর্থ উপার্জ্জনের জন্য আসি নাই। আমি কোন অবস্থা অথবা কোন সমাজে আবদ্ধ নহি, কিন্তু আমি ঈশ্বরের সত্যে আবদ্ধ এবং তারই দাস, যিনি সমুদয় বিশ্বের অধিপতি। আমি তাঁহার জন্য ব্রাহ্ম স্কুলে শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি।...'[১৫৫]

এ পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম আন্দোলনের একজন প্রধান নেতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য—'এবার পূর্ব বাংলার ব্রাহ্মদিগের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। এ সংগ্রামে তাঁহাদের নিরস্ত্র থাকা উচিত নয়। প্রেম, ক্ষমা, সত্যপ্রিয়তা এই তিনটি অব্যর্থ অস্ত্র সংগ্রহের জন্যে সর্বদা চেষ্টা করা কর্তব্য। শত্রুকেও ভ্রাতৃভাবে অকৃত্রিম প্রেম

করিতে হইবে। অন্যে প্রহার করিলেও হৃদয়ের সহিত ক্ষমা করিতে হইবে। সহস্র সহস্র লোক খড়্গ-হস্ত হইলেও শরীর পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া সত্য-প্রিয়তাকে রক্ষা করতঃ ঈশ্বরকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে। তবেই সংগ্রামে জয়লাভ হইবে।'[১৫৬] মূল কথা ছিল ধর্মের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এবং মাঝে মাঝে তা চরম পর্যায়ে চলে যেত। যেমন, অঘোরনাথ ব্যাগ হাতে ধর্ম্ম প্রচারে যাওয়া বৈরাগ্য বিরুদ্ধ বলে মনে করতেন, এবং তাই পিঠে বোঁচকা বেধে খালি পায়ে দশ বারো ক্রোশ পথ হাঁটতেন।[১৫৭]

ব্রাহ্ম সমাজের প্রশংসা করে সরকারী কর্মচারী ক্লে লিখেছিলেন, পুরনো ভাবধারার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হলে একটি নতুন 'সেকট'-এর যে পরিমাণ এনার্জি ও আন্তরিকতা দরকার তা ব্রাহ্মদের আছে। বরিশালের ব্রাহ্মদের উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, বরিশালে ব্রাহ্ম আন্দোলনের এখনও কৈশোর, সভ্য সংখ্যাও স্বল্প। কিন্তু এদের আছে সেই কর্মক্ষমতা ও বিশ্বাস।[১৫৮]

এ ছাড়া ব্রাহ্মরা নিজেদের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্যে নিজেদের করে তুলেছিলেন স্বাবলম্বী। ঢাকার ব্রাহ্ম প্রচারকরা (ঢাকার) নিমতলির পুরনো নবাব বাড়ীটি সাত হাজার টাকায় কিনে নিয়ে সবাই জমি ভাগ করে নিয়েছিলেন। এর নাম দেওয়া হয়েছিল বিধান পল্লী।[১৫৯] ঢাকার ওয়ারী আবাসিক এলাকাও প্রাথমিকভাবে গড়ে তুলেছিলেন ব্রাহ্মরা।

ময়মনসিংহের ব্রাহ্মরা মাত্র পঁচিশ টাকায় একটুকরো জমি কিনে সেখানে দু'খানি ছোট কুটির তৈরী করেছিলেন। ১৮৭২-৮২ পর্যন্ত অনেক ব্রাহ্ম পরিবার সেখানে বসবাস করেছেন। ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর কেউ আশ্রয়চ্যুত হলে এখানে আশ্রয় পেতেন।[১৬০] নিজেদের জীবীকা অর্জনের চেষ্টায় সমবেত প্রচেষ্টায় ময়মনসিংহে আবার ব্রাহ্মরা নির্মাণ করেছিলেন 'ব্রাহ্ম দোকান'। ১৮৭২ সালে স্থাপিত হয়ে তা টিকে ছিল আঠারো বছর পর্যন্ত।[১৬১] ১৮৮৭ সালে শরৎচন্দ্র রায়ের প্রচেষ্টায় ময়মনসিংহে একটি 'ব্রাহ্ম পল্লীর' পত্তন করা হয়েছিল।[১৬২]

এই সব বাড়ী, দোকান, প্রভৃতি ছিল আশ্রয়চ্যুত ব্রাহ্মদের আবাস স্থল। পরামর্শ ও ভরসাস্থল। কালক্রমে, এগুলিই হয়ে দাঁড়াতো ব্রাহ্ম আন্দোলনের কেন্দ্র। পরস্পরকে শুধু সহায়তা প্রদানই নয়, ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়ে যারা নিরুপায় ও নিঃসহায় হয়ে পড়তেন তাঁদেরও যথাসাধ্য

সাহায্য করতে পিছপা হতেন না তাঁরা। এ কারণে অনেকে আজীবন দরিদ্র বা ঋণভারে জর্জরিত থাকলেও তা নিয়ে দুঃখ করতেন না। তাঁরা সবকিছুই করেছিলেন আদর্শের জন্যে।

ব্রাহ্ম আন্দোলন সবচেয়ে বেশী অভিঘাত হেনেছিল রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের ভেতর। অথচ রক্ষণশীল হিন্দুরাও যে পাশ্চাত্য শিক্ষিত ছিলেন না তা নয়। কিন্তু সামাজিক কোন প্রতিবাদের কারণ ঘটলে তারা এর জন্যে দায়ী করতেন আবার পাশ্চাত্য শিক্ষাকে।

ব্রাহ্ম আন্দোলন রক্ষণশীল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তার একটি কারণ হতে পারে এই যে, ব্রাহ্ম আন্দোলনকে তারা হয়ত দেখেছিলেন তাদের সামাজিক অধিকার, প্রতিপত্তি খর্ব করার আন্দোলন হিসেবে। ব্রাহ্ম আন্দোলন ছিল বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে অথচ এ প্রথা ছিল বর্ণহিন্দুদের সামাজিক শোষণ ও অধিকারের হাতিয়ার। তা'ছাড়া ঐতিহ্যগত ধ্যান ধারণার প্রভাবতো ছিলই। আর ধর্ম ঐতিহ্য বা সমাজ সম্পর্কে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বা মোল্লা মৌলবীরা অন্য কথায় ঐতিহ্যগত বুদ্ধিজীবীরা যা বলতেন তাই ছিল অনেকটা শিরোধার্য। হয়ত এ জন্যেই হিন্দুরা আন্দোলনকে রোধ করতে চেয়েছিলেন।

ব্রাহ্ম আন্দোলন মুসলমান সম্প্রদায়ে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। জালালউদ্দিন নামে একজন মুসলমান ব্রাহ্ম হয়েছিলেন বটে, কিন্তু কেন? সে কারণ অবশ্য জানা যায়নি।[১৬৩] কিন্তু এ কারণে মুসলমান সম্প্রদায়ের কেউ তাঁর ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল এমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। কারণ ব্রাহ্ম আন্দোলন মুসলমান উচ্চবিত্তদের অধিকার খর্ব করবে এমন ভাবার কোন কারণ ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে আশরাফ-আতরাফ ছিল কিন্তু তাই বলে বর্ণভেদের মত তা কঠোর ছিল না। ফলে ব্রাহ্ম আন্দোলনের পুরোটা সময় দেখি হিন্দু সম্প্রদায়ই আলোড়িত হচ্ছিল, মুসলমানরা নীরব।[১৬৪] বরং মুসলমান-দের সঙ্গে সম্পর্ক তাদের ভালোই ছিল। ব্রজসুন্দর মিত্রের সঙ্গে যখন ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন খারাপ ব্যবহার করছিলেন তখন ঢাকার জমিদার মৌলভী আমীর সঙ্গে তাঁর সহৃদয় সম্পর্ক ছিল।

রামপ্রসাদ সেনকে গ্রামের ব্রাহ্মণরা একঘরে করেছিল। কিন্তু গ্রামের মুসলমান ও নীচু বর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল 'মধুর'।[১৬৫] আবার ব্রাহ্মদের সমাজ সংস্কারমূলক বা সেবামূলক

কাজের ফলাফল ভোগ করেছিল উভয় সম্প্রদায়।

আগেই উল্লেখ করেছি, ব্রাহ্ম আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের তেমন কোন উৎসাহ ছিল না, কৌতূহল হয়ত খানিকটা ছিল। আন্দোলনের মূলকথা কখনও তারা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি। ব্রাহ্ম আন্দোলনের আদর্শ তাদের কাছে নির্বস্তুক ঠেকেছে। তাই সাধারণ মানুষ এতে আকৃষ্ট হন নি। সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মদের জেনেছিলেন খানিকটা অদ্ভুত মানুষ হিসেবে, যে না হিন্দু না খৃষ্টান। তারা দেখেছিলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা তাদের মতই দরিদ্র, নিজেদের নিয়ে মেতে থাকেন। কোন গ্রামে হিন্দু পরিবারে কেউ ব্রাহ্ম হলে মনে করা হত ধর্মনাশ হল। অন্যদিকে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যারা ব্রাহ্ম আন্দোলনের মূল কথা উপলব্ধি করেছিলেন তাঁরা চেয়েছিলেন ব্রাহ্মদের প্রতিরোধ করতে। ধর্মনাশের কথা তাঁরাই তুলেছিলেন নিজেদের অধিকার বজায় রাখতে।

ব্রাহ্ম নিপীড়ণ ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাররক্ষা ও আবেগজাত তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠতে লাগলে এদের প্রতিরোধের জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল সাংগঠনিক তৎপরতা। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়ার এটি হল আরেক দিক।

কলকাতার মত, ঢাকা বা পূর্ববঙ্গেও প্রথমদিকে যারা ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেছিলেন তাঁরা হিন্দু ধর্মের অঙ্গন থেকে বেরিয়ে আসতে চান নি। এটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান উদ্যোক্তা ব্রজসুন্দরের কথায়। তিনি লিখেছিলেন, ব্রাহ্মদের সংখ্যা অল্প সুতরাং হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তারা বিপাকে পড়বে। 'ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য সমগ্র হিন্দু সমাজকে উন্নতির পথে চালিত করা; ইহারা তরুণ অবস্থায়ই হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে হিন্দু সমাজের উন্নতি করা আর ব্রাহ্মদের সাধ্যায়ত্ব থাকিবে না। তাঁহারা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে পরিণত হইবেন।'[১৬৬]

বিজয়কৃষ্ণ যখন প্রথম ঢাকায় এসেছিলেন, তখন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, ঢাকার ব্রাহ্মদের সঙ্গে হিন্দু সমাজের তেমন কোন বিরোধ নেই। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একবার আর্মেনিয়ান কয়েকজন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে হাজির হলে তাদের ঘরের মধ্যে ঢুকতে না দিয়ে বাইরে আসন দেওয়া হয়েছিল।[১৬৭]

ফলে, প্রথমদিকে, ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দুদের সাংগঠনিক তৎপরতার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু ষাট-সত্তরের দশকে অপেক্ষাকৃত তরুণরা আন্দোলনে যোগ দিলে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। সাংগঠনিক পর্যায়ে শুরু হয়েছিল এবার তৎপরতা। বিভিন্ন জায়গায় গঠিত হয়েছিল হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষিণী সভা ইত্যাদি। বলা যেতে পারে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের শুরু হয়েছিল তখন থেকে।

ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিরুদ্ধে এধরনের প্রথম সভা হল, ঢাকার 'হিন্দু ধর্ম রক্ষিণী সভা'। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলে তাঁর পিতা, ঢাকার প্রভাবশালী নাগরিক কাশীকান্তর উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল এই সভা। বিজয়কৃষ্ণের ময়মনসিংহ সফরের পর সেখানকার প্রধান হিন্দুরা মিলে ঢাকার মত একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন।[১৬৮] বরিশালেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছিল।[১৬৯] দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও এমনি একটা সভা স্হাপন করেছিলেন সেখানে।[১৭০]

এভাবে পূর্ববঙ্গের যেখানেই ব্রাহ্ম সমাজ গড়ে উঠেছিল, প্রায় ক্ষেত্রেই সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সংগঠিত হয়েছিল হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষিণী সভা। (বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন ঃ পরবর্তী অধ্যায়) কিন্তু বাহ্মদের উদ্যম রোধ করা সম্ভব হয় নি। শুধু তাই নয়, পূর্ববঙ্গের অনেক ব্রাহ্ম কালে দেখা গেছে সম্পূর্ণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতা হয়ে উঠেছিলেন, যেমন, ময়মনসিংহের আনন্দমোহন বসু, বরিশালের দুর্গামোহন দাস, সিলেটের বিপিনচন্দ্র পাল ও সিতানাথ তত্বভূষণ, বিক্রমপুরের দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ।

ঘ. ব্রাহ্মদের কার্যাবলী

হিন্দুধর্মের কলুষ, জাঁকালো আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি বর্জন করে, ব্রাহ্মরা প্রাথমিকভাবে চেয়েছিলেন সরল, অনাড়ম্বর পৌত্তলিকতা বিরোধী ধর্ম। হিন্দু ধর্মকে কলুষমুক্ত করার জন্যে তারা চেয়েছিলেন কুলীন, ও যৌতুক প্রথা বর্জন, বিধবা বিবাহ প্রসার ইত্যাদি। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে বা শেষদিকে, পূর্ববঙ্গে স্কুল কলেজ স্থাপন, জলাজঙ্গল পরিস্কার ইত্যাদি প্রকল্পগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে মনে হয়—সামাজিক উন্নয়নের উদ্যোক্তা জমিদার বা সরকার ছিলেন না, ছিলেন মধ্য শ্রেণীভুক্ত উদারপন্থী ব্যক্তি বা সংস্হা, যেমন ব্রাহ্ম-

সমাজ।[১৭১] সেবামূলক কাজ ছাড়া ব্রাহ্মরা যার ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছিলেন তা'হল শিক্ষা। এদিক থেকে জেসুটদের সঙ্গে মিল ছিল তাদের। আমার আলোচ্য সময়ে দেখি, ব্রাহ্মরা যে অঞ্চলেই গেছেন সে অঞ্চলেই প্রথমে চেষ্টা করেছেন একটি স্কুল স্থাপনের এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষকতা।

ঢাকায়, ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হওয়ার পর দীননাথ সেন, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও গোবিন্দচন্দ্র রায়, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ব্রাহ্ম সমাজ সম্পর্কে বোঝাতেন। এবং এতে বেশ কিছু ছাত্র উৎসাহ বোধ করছিলেন জেনে তাদের অভিভাবকরা নির্যাতন শুরু করেছিলেন। সে কারণে ১৮৬৩ সালে ঢাকার ব্রাহ্মরা ঢাকায় আলাদা ভাবে একটি স্কুল খুলেছিলেন যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'ঢাকা ব্রাহ্ম স্কুল।'

ময়মনসিংহের কথা ধরা যাক। সেখানকার অধিকাংশ শিক্ষক, বিশেষ করে, নর্ম্মাল স্কুলের, ব্রাহ্ম সমাজে যেতেন এবং ছাত্রদের ধর্ম ও নীতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। নর্ম্মাল স্কুল বেশীদিন টেকেনি কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে শিক্ষকদের দ্বারা প্রভাবিত বেশ কিছু ছাত্র সমাজে যোগ দিয়েছিলেন। এ ছাড়া ১৮৭০-৭৩ এর মধ্যে ব্রাহ্মরা ময়মনসিংহে স্থাপন করেছিলেন একটি নৈশ বিদ্যালয়, শ্রমজীবীদের জন্যে ঐ স্কুলের একটি শাখা এবং (১৮৮৩ সালে) ময়মনসিংহ ইনিসটিটিউশন নামে একটি হাইস্কুল।[১৭২] বরিশালে ১৮৮১ সালে ব্রাহ্মরা স্থাপন করেছিলেন একটি বিদ্যালয়, ১৮৮৬ সালে ব্রাহ্মবিদ্যালয়।

বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়দত্ত উনিশ শতকের মধ্যভাগে সমাজ সংস্কার সম্পর্কে যা বলেছিলেন, ব্রাহ্ম বা উদারপন্থী বাঙ্গালী সংস্কারকরা মোটা-মুটি তাই মেনে চলতেন। কথাটি ছিল, বাংলায় সমাজ সংস্কার শুরু হতে হবে নারী মুক্তির মাধ্যমে কারণ আগামীদিনের নাগরিক তৈরী করবে মেয়েরাই। কিন্তু তা'সত্ত্বেও আমরা দেখি ১৮৭০ অব্দি ব্রাহ্ম প্রগতিবাদীরা এ ধরনের তেমন কিছু করতে পারেনি। অবশ্য কেশব-চন্দ্র এ পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু সে কাজ পরে আরো এগিয়ে নিয়েছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। আর পূর্ববঙ্গে এ ধরনের কাজের নায়করা ছিলেন, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বরদাচরণ হালদার, শ্রীনাথ চন্দ প্রমুখ। তাঁরা প্রথমেই নজর দিয়েছিলেন স্ত্রীশিক্ষা ও নারীদের অবস্থা উন্নয়নের দিকে।

কিন্তু এ অঞ্চলে, উনিশ শতকের সত্তর দশকেও স্ত্রী শিক্ষাকে সাধারণ মানুষ কি চোখে দেখতো তা স্পষ্ট হবে একটি উদাহরণ দিলে। ব্রজ-সুন্দর তাঁর মেয়ে মাতঙ্গীকে পড়িয়েছিলেন গৃহশিক্ষক রেখে। এ কারণে, মাতঙ্গীর চেহারার কোন পরিবর্তন হয়েছিল কিনা তা দেখার জন্যে অনেকে আসতো। একদিন জানা গেল ব্রজসুন্দরের দুইবন্ধু গ্রামের বাড়ীতে যাবেন মাতঙ্গীর পরীক্ষা নিতে। এ কথা শোনার পর ঐ এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল।[১৭৩]

সুতরাং এটা অনুমেয় যে ব্রাহ্মদের এ জন্যে কি কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মরা কি ধরনের স্ত্রী শিক্ষা পছন্দ করতেন? এ প্রসঙ্গে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রধান বুদ্ধিজীবী কালীপ্রসন্ন ঘোষের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি খানিকটা দীর্ঘ কিন্তু এতে প্রাথমিকভাবে স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে ব্রাহ্মদের চিন্তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—"(যা) বিবেককে অধিক সামর্থ্য সম্পন্ন, তাহাদিগের বিশ্বাসকে অধিক দৃঢ় এবং নির্ম্মল করিতে পারে, তাহাই নারীজাতির বিশেষ আলোচনীয়। ধর্ম্মতত্ত্বের জটিল তর্কজালেই জীবন অবসিত হইল, হৃদয় ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিল না, এমত শিক্ষার প্রয়োজন নাই। যে শিক্ষায় হৃদয় আকাশের ন্যায় প্রশস্ততা লাভ করে, পবিত্রতার স্বর্গীয় সমীরণ উহাতে অব্যাহত সঞ্চারিত হয়, ঈশ্বর প্রেমের বাক্য মনের অগোচর মধুর জ্যোৎস্নাতে হৃদয় দিবসে নিশিতে সকল সময়েই সুস্নিগ্ধ এবং মধুময় থাকিতে পারে, তাহাই নারী জাতির কল্যাণকর।'[১৭৪] অর্থাৎ স্ত্রী শিক্ষা প্রয়োজন তবে ঝোঁকটা ছিল খানিকটা নীতিশিক্ষার দিকে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাহ্মরা বিশেষভাবে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ও আত্মীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে জোর দিয়েছিলেন।[১৭৫] ঢাকায়, কলকাতার বামাবোধিনী সভার অনুকরণে, প্রধানতঃ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৮৭০ সালে স্থাপিত হয়েছিল 'অন্তপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা।' প্রায় বারো-তের বছর এ সভার কাজ চলেছিল।[১৭৬] ময়মনসিংহে ১৮৭২ সালে স্ত্রী শিক্ষার জন্যে স্থাপিত হয়েছিল 'হিতকরী সভা।' একটি 'ব্রাহ্মিকা সভা'ও স্থাপিত হয়েছিল সেখানে, ১৮৭৭ সালে। একই বছর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা।'

তবে ব্রাহ্ম মহিলারাও অনেকক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিলেন নিজেদের অবরোধ

চূর্ণ করতে। এখানে কয়েকজনের নাম করা যেতে পারে, যেমন বরিশালের মনোরমা মজুমদার (১৮৪৮-১৯৩৬ ; স্বামী গিরিশচন্দ্র মজুমদার), মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩ ; মাইকেল মধুসূদনের ভাতিজী), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩ ; পিতা, লেখক চণ্ডীচরণ সেন, বরিশাল), সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯ ; পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঢাকা) বা কবি জীবনানন্দ দাশের মাতা। এঁদের মধ্যে মনোরমা মজুমদারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ১৮৮১ সালে তিনি বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য ও ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম প্রচারক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ নিয়োগ ব্রাহ্ম সমাজেও বিতর্কের ঝড় তুলেছিল।[১৭৭]

নারীদের আরো স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে এগিয়ে গিয়েছিল ময়মনসিংহ সমাজ। তাঁরা ঠিক করেছিলেন, প্রতিদিন সকালে স্নানের পর স্ত্রী পুরুষ এক সঙ্গে ব্রহ্মোপসনা করবেন[১৭৮] এবং মন্দিরেও মহিলারা প্রকাশ্যে উপাসনা করবেন। লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায় আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্ম হওয়াতে তিনি হয়েছিলেন সম্পত্তিচ্যুত। পরে অনেক মামলা মোকদ্দমার পর অবশ্য তিনি তা উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এ উপলক্ষে রাখালচন্দ্র নিজ বাসায় জানিয়েছিলেন নিমন্ত্রণ উচ্চ পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের। এবং সেখানে সস্ত্রীক যোগ দিয়ে একত্রে আহার গ্রহণ করেছিলেন। এ ঘটনা শুধু বরিশালেই নয় বাংলায় বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।[১৭৯] এর প্রমাণ ঐ সময়কার সংবাদপত্রগুলো।

বিধবা বিবাহ প্রসার ও কুলীন বিবাহ রহিত কথাটিকে শুধু তত্ত্বকথায় না রেখে, তা কার্য্যে পরিণত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মরা।

বিধুমুখী ছিলেন নবকান্তর ভাগ্নী। যখন তাঁর বয়স ষোল তখন তাঁর বিয়ে ঠিক হয়েছিল এক কুলীনের সঙ্গে। একথা জানতে পেরে নবকান্ত ও তাঁর দুই মামাতোভাই বরদাকান্ত ও সারদাকান্ত রাতের অন্ধকারে নদী সাঁতরিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলেন বরিশালে। কলকাতা থেকে অবলাবান্ধবের সম্পাদক চলে এসেছিলেন কুষ্টিয়া, যদি সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এ নিয়ে কাগজে নানারকম কুৎসা গাওয়া হয়েছিল। বিধুমুখী পরে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়ে রজনীনাথ রায়কে বিয়ে করেছিলেন।[১৮০] নবকান্ত তাঁর আরেক বিধবা ভাগ্নী স্বর্ণময়ীকে

উদ্ধার করেও বিয়ে দিয়েছিলেন।[১৮১] এ প্রসঙ্গে লক্ষীমনির কথাও উল্লেখ করা যায়। ঢাকায়, লক্ষীমনির মা তাকে পতিতালয়ে বিক্রি করে দিতে চাইলে নবকান্ত ও অন্যান্য ব্রাহ্মরা তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন। এ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল দারুণ হৈচৈয়ের পরে লক্ষীমনির বিয়ে হয়েছিল ব্রাহ্ম মতে।[১৮২] ময়মনসিংহে বৈকুণ্ঠনাথ ও শ্রীনাথ চন্দ, গ্রামের বাড়ী থেকে বৈকুণ্ঠের ছোট বোনকে নিয়ে এসেছিলেন। শ্রীনাথ চন্দ তাঁকে পরে বিয়ে করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুর্গামোহন দাসের কথা। বরিশালে তিনি তাঁর বিধবা বিমাতাকে বিয়ে দিয়েছিলেন যা এর আগে কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। ফলে তাঁকে কি দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল তা আগেই উল্লেখ করেছি।

আরো উল্লেখ করা যেতে পারে, বরিশালের মোক্তার ঈশ্বরচন্দ্র সেনের কথা, ১৮৬৭ সালে যিনি বিয়ে করেছিলেন জনৈকা পতিতাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই ব্রাহ্ম সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে কাগজ পত্রে লেখালেখি শুরু করেছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তখন এ বিয়ে সমর্থন করে, বিরুদ্ধবাদীদের কুৎসার জবাব দিয়েছিলেন দৃঢ় ভাবে। ব্রাহ্ম সমাজেও এ বিয়ে সৃষ্টি করেছিল বিতর্কের।[১৮৩]

এককথায় বলা যেতে পারে, ব্রাহ্ম আন্দোলন বাংলার মহিলাদের বন্ধ দুয়ারটি খুলে দিয়েছিল। শুরু হয়েছিল আধুনিকায়ন পর্ব[১৮৪]

এ ছাড়াও ব্রাহ্মরা স্থাপন করেছিলেন কিছু সভা-সমিতি যাদের কাজ ছিল সমাজ সেবা। ঢাকার 'সঙ্গত সভার' কথা আগেই উল্লেখ করেছি। বরিশালেও এ ধরনের একটি সভা স্থাপিত হয় ১৮৯৮ সালে। ১৮৭১ সালে সেখানে স্থাপিত হয়েছিল 'ছাত্র সমাজ'। ১৮৭০ সালে ঢাকায় স্হাপিত হয়েছিল 'শুভসাধিনী সভা' যার উদ্দেশ্য ছিল 'সুরাপান নিবারণ স্ত্রীশিক্ষা দান, সুলভপত্রিকা প্রচার।' ১৮৭৩ সালে স্হাপিত হয়েছিল 'বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা'। অনেকে এর সভ্য ছিলেন এবং স্কুলের অনেক 'যুবক বা ছাত্র ১৮ বৎসর বয়ক্রমের পূর্বে বিবাহ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা' করেছিল।[১৮৫] বরিশালে ১৮৯২ সালে পরিণত বয়স্ক ব্রাহ্মদের জন্যে স্হাপিত হয়েছিল 'ব্রহ্মবন্ধু সভা।'

পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মদের উদ্যোগেই গড়ে ওঠেছিল মুদ্রণ শিল্প। শুরু হয়েছিল সাহিত্যের বিকাশ। ঢাকার প্রথম বাংলা পত্রিকা 'ঢাকা প্রকাশ'

ব্রাহ্মদেরই প্রকাশনা। ময়মনসিংহ থেকে তাঁরা বের করতেন, 'বাঙ্গালী' ও 'বিজ্ঞাপনী'। ঢাকা থেকে বের হয়েছিল 'বঙ্গবন্ধু' 'ইষ্ট' ইত্যাদি। ময়মনসিংহে প্রথম বইয়ের দোকান খুলেছিলেন কালীকৃষ্ণ ঘোষ 'ঘোষ লাইব্রেরী' নামে।[১৮৬] এসব পত্র-পত্রিকা ব্রাহ্ম আন্দোলনে সহায়তা করেছিল প্রচুর। ব্রাহ্মদের প্রতিরোধের জন্যে রক্ষণশীলরাও পত্রিকা প্রকাশ করতো। এ সব তর্ক বিতর্ক স্থবির সমাজ জীবনে ঢেউ তুলেছিল।

সবমিলিয়ে বলা চলে, ব্রাহ্মরা পূর্ববঙ্গের সমাজে এক নতুন জোয়ার এনেছিলেন তাদের জীবন যাপন, কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।[১৮৭]

ঙ. ব্রাহ্ম আন্দোলন ঃ ক্ষয়

ব্রাহ্ম আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সমাজ প্রগতির জন্যে কিন্তু উনিশ শতকের শেষের দিকে আন্দোলনের সে চরিত্র আর থাকেনি। শুরু হয়েছিল ক্ষয়ের পথ। এর একটি কারণ ধর্ম নিয়ে ব্রাহ্মদের অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস যা তাঁদের আদর্শ বা বিশ্বাসকে ক্রমেই করে তুলেছিল সংকীর্ণ। যে ব্রাহ্ম ধর্ম একসময় জোর দিয়েছিল ইহজাগতিকতার ওপর পরে তা রূপান্তরিত হয়েছিল আধ্যাত্মবাদে। ব্রাহ্মদের জীবনচর্চায়ও তা প্রতিফলিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে দু' একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

প্রকাশ চন্দ্র রায় ও অঘোরকামিনী (পশ্চিমবঙ্গের এককালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা-মাতা)—এ দম্পতি ছিলেন ব্রাহ্ম। কয়েকটি সন্তান জন্ম নেয়ার পর ত্রিশের কোঠায় পৌঁছে দু'জনেই আলাদা থাকতে শুরু করেছিলেন। এমনকি পরস্পরকে চিঠিও লিখতেন না তাঁরা। এবং এসব কিছুই ছিল ধর্মের জন্যে।[১৮৮]

শ্রীনাথ চন্দ লিখেছেন, সপ্তাহে দুই দিন তাঁরা নির্দিষ্ট রেখেছিলেন ধর্ম্মালোচনা ও একদিন সংকীর্তনের জন্যে। সন্ধ্যার পর সংকীর্তন বা আলোচনা শুরু হলে তারা মজে যেতেন। আর যদি কোন প্রচারক থাকতেন সে সময় তা'হলে তো কথাই নেই। অনেক সময় রান্না করতে করতে ভোর হয়ে যেত। কিন্তু কেউই কোনরকম ক্লেশ অনুভব করতেন না।[১৮৯]

উনিশ শতকের শেষার্ধে বা বিশ শতকের গোড়ায় ব্রাহ্ম সমাজের অবস্থা কি হয়েছিল[১৯০] বা শিক্ষিত তরুণরা তাদের কি চোখে দেখা শুরু করেছিল তার খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে গোপাল হালদারের

উপন্যাস 'ভাঙ্গনীকূলে'।

অমর একদিন তর্ক করতে গিয়ে তার কাকাকে বলেছিল—'বিলাতের সপ্তদশ শতাব্দীর পিউরিটানিক এথিকস এবং ভিক্টোরিয়ান উম্যান ওয়ারশিপ ও মর‍্যালিটির খাদ মিশিয়ে ব্রাহ্ম সমাজ এতদিন চলছিল—কিন্তু তা পচে গেছে। বিলাতেই তা শেষ হয়েছে, তাকে ঘষেঘষে সাহেবদের মুরুব্বি করে, এখানে চালাবেন কতদিন ?'[১৯১]

এ উপন্যাসের আরেকটি খণ্ডে, অমর ব্রাহ্মদের সংজ্ঞা দিয়েছিল এভাবে—'খেলতে মানা, চলতে মানা, নাটকে মানা, গানে মানা, হাসতে মানা, কাশতে মানা,—এরই নাম ব্রেহ্মপনা।'[১৯২]

ব্রাহ্মদের একাংশ কখনও হিন্দু ধর্মকে পুরোপুরি বর্জন করতে পারেন নি। বামাসুন্দরী (বাংলাসন ১২৪৩-১২৯৮) ছিলেন বিধবা, কিন্তু ব্রাহ্ম মতে বিশ্বাসী। তিনি 'বাহ্মদিগের প্রতি এবং বাহ্ম ধর্মের প্রচারকগণের উপরে এরূপে শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের উপদেশে বা উপরোধে তিনি হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত বিধবার আচার নিষ্ঠায় কখনও অবহেলা করেন নাই।'[১৯৩] ব্রাহ্ম সমাজের এক প্রধান স্তম্ভ বিজয়কৃষ্ণ আবার ফিরে গিয়েছিলেন হিন্দু ধর্মের কোলে।[১৯৪] এ ধরনের উদাহরণ আছে অনেক। বলা যেতে পারে প্রগতিমুখী চিন্তার পাশাপাশি রক্ষণশীল চিন্তাও ঠাঁই করে নিয়েছিল। 'সামাজিক উচ্ছৃংখলতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে তারা একেবারে বিপরীত প্রান্তে গিয়ে কঠোর নীতিবাগিশ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।'[১৯৫] উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ঢাকায় যখন নাট্য আন্দোলন বিকশিত হচ্ছিল তখন ব্রাহ্মরা এর বিরোধিতা করেছিলেন।[১৯৬]

এককথায় বলা যেতে পারে ব্রাহ্মদের চিন্তার জগতে সবসময় বৈপরীত্য কাজ করেছিল। ঢাকার নবকান্ত প্রমুখ তরুণরা যখন বিধুমুখীকে উদ্ধার করে এনে বিয়ে দিয়েছিলেন তখন ঢাকার সমাজের অভয়চন্দ্র, দীননাথ, কালীপ্রসন্ন—এককথায় তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজের অগ্রনীরা তা সমর্থন করেন নি।[১৯৭]

ব্রাহ্মদের চিন্তার জগতের এ দ্বন্দ্ব, বৈপরীত্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে কালীপ্রসন্নের এক চিঠিতে। ১২৭৬ (বাংলা সন)-এ, গ্রামের বাড়ী থেকে কালীপ্রসন্ন নবকান্তকে লিখেছিলেন যে, তাঁকে গ্রামের ব্রাহ্মরা নির্যাতনের চেষ্টা করছে কিন্তু 'তাঁহাদিগের নিন্দাই আমার স্তুতি।...'

বাড়ীতে পুজো হল, কিন্তু লোকে পৌত্তলিক বলবে দেখে 'লোকের সমক্ষে প্রনাম করি নাই, কিন্তু একাকী অনেক সময় প্রণত হইতে ইচ্ছা হইয়াছে।'[১৯৮] ব্রাহ্ম সমাজের একাংশের বিশ্বাস ও ঐতিহ্য নিয়ে টানা-পোড়েন আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল, অনেক সময় হিন্দু সম্প্রদায় বা ধর্ম থেকে তাদের আলাদা করাও মুশকিল হয়ে উঠেছিল।

ত্রুটি বিচ্যুতি, ব্যার্থতা সত্বেও এ কথা স্বীকার্য যে, ব্রাহ্ম আন্দোলন বাঙ্গালী সমাজে সৃষ্টি করেছিল গতিশীলতার,[১৯৯] সমাজকে দিয়েছিল নতুন আদর্শ, জীবনযাপনের এক নতুন শৃংখলাপূর্ণ পদ্ধতি,[২০০] চেষ্টা করেছিল আধ্যাত্মিক বাধন থেকে মানুষের মনের মুক্তির। বাংলার ক্ষেত্রে এ কথা যেমন প্রযোজ্য, পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য, বরং একটু বেশী।

৩. সহবাস সম্মতি আইন

১৮৯০ এর দিকে ভারতজুড়ে দু'টি বিতর্ক, রক্ষণশালীরা যে শক্তি-শালী তা স্পষ্ট করে তুলেছিল। বিতর্ক দু'টির একটি ছিল সহবাস সম্মতি আইন।[২০১] সংক্ষেপে, এই আইনের মূলকথা ছিল, বারো বছরের নীচে বিবাহিত অথবা অবিবাহিত কোন বালিকার সঙ্গে তার অনুমতি অথবা বিনা অনুমতিতে সহবাস করলে তা ধর্ষণযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।[২০২] ১৮৯১ সালের ৯ জানুয়ারী ভারতীয় পিনাল কোডের ৩৭৫ ধারা সংশোধনের উদ্দেশ্যে স্যার এন্ড্রু স্কোবল বিল আকারে এই আইন উত্থাপন করেছিলেন। এর আগে ১৮৬০ সালে সহবাসের সর্বনিম্ন বয়স ধার্য করা হয়েছিল দশ বছর। এখন দু'বছর বৃদ্ধি করে তা উন্নীত করা হলো বারোতে। পূর্ববঙ্গে, হিন্দু পুনরুজ্জীবন-বাদ তুঙ্গে উঠেছিল সহবাস সম্মতি আইনকে ঘিরে। সতীদাহ প্রথা বিলোপের পর আর কোন বিষয় নিয়ে বোধহয় এতো তুমুল তর্ক বিতর্ক, আন্দোলন হয়নি। এক হিসেবে এ বিলটি ছিল ১৮৭২ সালের 'ব্রাহ্ম নেটিভ ম্যারেজ এ্যাক্ট' এর বিস্তৃতি। কারণ, এ আইন হিন্দু সমাজে বিয়ের উপযুক্ত বয়স বৃদ্ধি করেছিল, অন্যদিকে, ১৮৭২ সালের আইন ছিল শুধুমাত্র ব্রাহ্মদের জন্যে।

সহবাস সম্মতির সঙ্গে জড়িত ছিল বাল্যবিবাহের বিষয়টি। কারণ বাল্য বিবাহ রোধ হ'লে সহবাস সম্মতি আইনের প্রয়োজন পড়ে না।

কিন্তু তখন বিধবা বিবাহের প্রচলন হলেও বাল্য বিবাহ নিয়ে বেশ তর্ক বিতর্ক চলছিল। ঐ সময় কলকাতায় জনৈক হরমোহন মাইতির এগারো বছরের স্ত্রী ফুলমনি বাঈ সহবাস জনিত কারণে মারা গেলে ভারত ও ইংল্যাণ্ডে বাল্যবিবাহের বিপক্ষে আবার জনমত সোচ্চার হয়ে উঠেছিল এবং সেই সুযোগ ব্রিটিশ সরকার বিলটি উত্থাপন করেছিলেন লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে।

সহবাস সম্মতি আইন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার আগে, বাংলার সমাজ সংস্কার আন্দোলন, ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলে, সমগ্র বিষয় বা বিতর্কটি আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বাংলায় সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কার শুরু করেছিলেন বৃটিশ শাসনকর্তারা বা হেইলিবেরি কলেজ থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, ভারতে আগত বৃটিশ আমলারা। কিন্তু সংস্কারগুলির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সমসাময়িক ভিক্টোরিয় ইংল্যাণ্ডকে সামনে রেখে। ইংল্যাণ্ডের প্রাধান্যবিস্তারী চিন্তা বা আদর্শ একদিকে অনুপ্রাণিত করতো ভারত শাসনে আগত কর্মকর্তাদের। ঐ আদর্শে বা চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতেন বা করতেন না। অন্যদিকে, ভিক্টোরিয় ইংল্যাণ্ডের ঐ চিন্তা ধারা আবার প্রভাব বিস্তার করেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের। ফলে, একই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে একই বিষয়ে তারা বিপরীতমুখী অবস্থান নিতেন।

বাংলায় ১৮২৮ সালে বেন্টিংকের আগমন, সমাজ সংস্কারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। পরবর্তী ত্রিশবছর আমরা লক্ষ্য করি, ভিক্টোরিয় ইংল্যাণ্ডের উদারনৈতিক ও সংস্কারবাদী চিন্তাধারা ভারতে বৃটিশ কর্মকর্তাদেরও প্রভাবিত করেছিল এবং তাঁরা চেয়েছিলেন সংস্কারের মাধ্যমে, ইউরোপের আদলে ভারতকে রূপান্তরিত করতে।[২০৩] এরিক স্টোক্স তাঁর বই—'দি ইংলিশ ইউটিলিটারিয়ান্স এণ্ড ইণ্ডিয়া'তে উল্লেখ করেছেন, সংস্কারের পেছনে সমর্থন ও উৎসাহ যুগিয়েছিলেন উপযোগবাদীরা। এই গ্রন্থে তিনি বিস্তৃত ভাবে তা আলোচনা করে দেখিয়েছেন, উপযোগবাদীদের গুরু ছিলেন বেন্থাম। জেমস মিল ও তাঁর পুত্র জন ষ্টুয়ার্ট মিল ছিলেন উপযোগবাদের প্রধান সমর্থক। তাঁরা দু'জনেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বড় চাকুরে ছিলেন, ফলে দীর্ঘদিন ধরে উপযোগবাদীদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, ভারতের শাসননীতি প্রভাবান্বিত

করা। বেন্টিংক, ডালহৌসী প্রমুখদের সঙ্গে উপযোগবাদীদের যোগাযোগ ছিল এবং ভারতে কর্মকাণ্ডে তাঁরা উপযোগবাদীদের নীতিই প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন।[২০৪] অন্যদিকে, রামমোহনও ছিলেন বেন্থামপন্থী। ফলে, রামমোহন সামাজিক ক্ষেত্রে উপযোগবাদী সংস্কার পন্থী ছিলেন।

উপযোগবাদ ছাড়াও, সমসাময়িক ইংল্যাণ্ডের Evangelicalism ইংরেজ কর্মকর্তাদের প্রভাবান্বিত করেছিল। দু'টির নীতি ছিল ভিন্ন কিন্তু সংস্কারের বিষয়ে দু'দলই একমত ছিলেন।[২০৫] evangelicalism গুরুত্ব আরোপ করেছিল শিক্ষা ও নৈতিক উন্নয়নে। উপযোগবাদীরা জোর দিয়েছিলেন আইন এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর। জেমস মিল, তাঁর 'হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছিলেন—'the most effectual step which can be taken by any government to diminish the vices of the people is to take away from the laws every imperfection.'[২০৬]

এবং আমরা লক্ষ্য করি (দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ দ্রষ্টব্য) শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যশ্রেণীও দারুণভাবে ভক্ত এবং নির্ভরশীল ছিল আইনের শাসনের ওপর। তবে এর অন্যদিকও আছে, যেমন, লর্ড এলেনবোরো (১৮৪২-৪৪) আবার ছিলেন রক্ষণশীল এবং শিক্ষাকে ভারতীয়দের মধ্যে তিনি বিস্তৃত করতে চাননি। তবে ১৮৫৭ এর পূর্বে ভারতে আগত আমলাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বেন্থামপন্থী, ফলে[২০৭] ঐ সময় পর্যন্ত বেশ উৎসাহের সঙ্গেই তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনে অগ্রসর হয়েছিলেন।

অন্যদিকে, সংস্কারের বিরুদ্ধে যে বাধা এসেছিল এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের একাংশও যে এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন তার কারণ ভারতীয় সমাজের জড়তা নয় বরং বলা যায় তা'ছিল এক প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দর্শন বার্ক ছিলেন যার প্রবক্তা। স্টোকসের ভাষায়, ভারতে উদারনীতি বিরোধিতা করেছিলেন থমাস মুনরো, যাঁর মধ্যে ছিল—'...all Burkes horror at the wanton uprooting on speculative principles of an immemorial systems of society, and shared all his emotional kinship with the spirit of feudalism and the heritage of the past.'[২০৮]

১৮৫৭-এর বিদ্রোহের পর পরিস্থিতি গিয়েছিল পাল্টে, ভারতীয় আচার অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ—বিদ্রোহের একটি কারণ—এ মতবাদ প্রভাবিত

করেছিল বৃটিশ কর্মকর্তাদের। বৃটিশ জনমতও এর বিপরীত ছিল না। এ ছাড়া উপযোগবাদ এবং evangelicalism দু'টিই উনিশ শতকের মধ্যভাগে প্রভাব হারিয়ে ফেলেছিল। এ সময় সরকারী নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল সতর্ক ও সমঝোতাপূর্ণ।[২০৯] কিন্তু তাই বলে সংস্কারের উৎসাহ চলে গিয়েছিল তা'ঠিক নয়। এই নীতির প্রতিফলন দেখি আমরা ব্রাহ্ম আন্দোলনের সময়। তাঁদের সংস্কারের ঝোঁকের সঙ্গে মিলেছিল সরকারী সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ। এই নীতি আবার ভারতীয়-দেরও প্রভাবিত করেছিল।[২১০] যেমন, সহবাস সম্মতি আইন আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগর পর্যন্ত ধর্মীয় রীতিনীতিতে সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছিলেন।

এই পটভূমিকায় আমরা দেখি, বাংলায়, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতরা ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন চিন্তাধারা বা জনমত অনুসারে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বমত্ত ছিলেন। রামমোহন থেকে অক্ষয়কুমার দত্ত পর্যন্ত অনেকেই সমাজে কিছু না কিছু পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের এই পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টায় তাঁদের সবসময় সম্মুখীন হতে হয়েছিল বিপরীতমুখী চিন্তাধারার প্রবল বাধার। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের চিন্তাধারার মধ্যেও যে অসঙ্গতি ছিল তাও ঐ সময় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এবং সহবাস সম্মতি বিলের সময়ও তাঁদের চিন্তার অসঙ্গতি কেমন ছিল, তা বোঝা যাবে, তৎকালীন ভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এ ও হিউমের 'স্টেটসম্যান' ও 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়াতে' ১৮৯১ সালের ২৫ জানুয়ারীর একটি চিঠিতে। হিউম লিখেছিলেন, কলকাতার অনেক শিক্ষিত লোকজন এই বিলের পক্ষে। অনেকেই এই প্রথা ঘৃণা করে এবং নিজের বাড়ীতেও এ ধরনের কাণ্ড সহ্য করবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এখন তারাও প্রকাশ্যে বিলের বিরোধিতা করছে, কারণ তাদের মতে, দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতিতে আইন পরিষদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।[২১১] শুধু তাই নয় আরেক দল আছে যারা নিজেদের হিন্দুধর্মের ধারক ও বাহক হিসেবে তুলে ধরে এ থেকে ফায়দা লুটতে চাচ্ছে।[২১২]

এ পরিপ্রেক্ষিতে, উদাহরণস্বরূপ, বালগঙ্গাধর তিলকের (১৮৫৭-১৯২০) কথা ধরা যেতে পারে। সহবাস সম্মতি বিলকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর আবির্ভাব। এই বিলের বিপক্ষে তিলক প্রচুর

লিখেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে রাজনীতি টেনে এনেছেন—এক কথায় ধর্মকে কেন্দ্র করে ইংরেজী বিরোধী একটি জনমত তিনি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। কারণ দেখা গেছে, তিলক যতটা না বিলের ধারা সমূহের সমালোচনা করেছিলেন তার চেয়ে বেশী সমালোচনা করেছিলেন একটি বিদেশী সরকারের, যারা হিন্দু গৃহস্থালীর ওপরও নিজেদের মনোভাব চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল।[২১৩]

বিয়ের বয়সের প্রশ্নটি আবার তুলে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলেন গুজরাটের পার্সী কবি বেহরামজি মেরওয়ানজি মালাবারি। আগস্ট ১৮৮৪ সালে বিয়ের বয়স বৃদ্ধির জন্যে তিনি লর্ড রিপনের কাছে 'নোটস অন ইনফ্যান্ট ম্যারেজ এণ্ড এনফোর্সড উইডোহুড', নামে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন। তাঁর এই আবেদন ইংল্যাণ্ড ও ভারতে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল।[২১৪] মালাবারি কিন্তু এ বিষয়ে, ঐতিহ্যবাদীদের সরাসরি আক্রমন করেন নি। তিনি লিখেছিলেন, কবি ও শাস্ত্রজ্ঞকে হাতে হাত ধরে চলতে হবে। সংস্কারবাদীদের উচিত হবে প্রতিপক্ষের কাছে বন্ধু হিসেবে যাওয়া। সরকার কিন্তু তখন এড়িয়ে গিয়েছিলেন মালাবারিকে।[২১৫]

১৮৮৭ সালের মধ্যে বাংলার রক্ষণশীলরা বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং কার্য ক্ষেত্রে নামার তোড়জোর শুরু করেছিল। এর বিপরীতে সংস্কারবাদীরা তখনও নিজেদের তেমন জোরালো করে তুলতে পারে নি। অন্যপক্ষে সরকার সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হলেও মনে করেছিলেন, আইন আর হিন্দুধর্মের জন্যে কোন হুমকি নয়, বরং তা সমর্থন করবে ভারতীয় সমাজের সমস্ত শিক্ষিত ও প্রভাবশালী শ্রেণী।[২১৬] ১৮৮৯ সালে হরিমাইতির ঘটনা সরকারী ও সংস্কারবাদীদের সুযোগ এনে দিয়েছিল পুনরুত্থানবাদীদের বিরুদ্ধে কথা বলার। ১৮৯০ সালে ভারত সরকার, ভারত সচিবের কাছে এ পরিপ্রেক্ষিতে, সাধারণ সহবাসের বয়স ১২তে উন্নীত করার আবেদন জানিয়েছিলেন এবং সে অনুযায়ী স্কোবল ৯.১.১৮৯১ সালে তা ভাইসরয় কাউন্সিলে উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু সরকারী হিসেবে কিছুটা ভুল হয়েছিল কারণ আমরা দেখি, বিলটি উত্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনমত সুস্পষ্ট দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সংস্কার বিরোধী জনমতই ছিল উঁচু স্বরে বাঁধা।

স্কোবল তাঁর বিলের পক্ষে বলেছিলেন যে, এ আইন বালিকাদের 'ইম্যাচিয়ুর প্রসটিটিউশন' এবং 'প্রিম্যাচিয়ুর কোহহেবিটেশন' থেকে রক্ষা করবে। শুধু তাই নয়, এই আইনের অপপ্রয়োগ রোধে, অপরাধীকে ওয়ারেন্ট ব্যতিরকে গ্রেফতার করা যাবে না এবং জামিনের বন্দোবস্ত থাকবে। দু'সপ্তাহ পর খসড়া বিল সিলেক্ট কমিটিতে পেশ করা হয়েছিল, যার সদস্য ছিলেন, এই, ডবিলউ বেলস, কে, কে, নালকর, পি, পি হাচিনস এবং রমেশচন্দ্র মিত্র। এবং এ বিল পেশের এক সপ্তাহের মধ্যে সারা বাংলা জুড়ে হৈচৈ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

হিউমের পূর্বোল্লিখিত চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় নিম্নবঙ্গেই এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল বেশী। তবে পূর্ববঙ্গে বিলের বিরুদ্ধে যেমন প্রবল আন্দোলন হয়েছিল তেমনি বিলের পক্ষেও যে কিছু হয়নি এমন নয়। পূর্ববঙ্গে এই জনপ্রতিক্রিয়ার একটি চিত্র আমরা পাই তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও পুস্তিকায়।

তিলক সহবাস সম্মতির বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি প্রদান করেছিলেন, বিরুদ্ধবাদীদের প্রধান যুক্তি হয়ে উঠেছিল সেগুলিই। তাঁর প্রধান যুক্তিগুলি ছিল—ফুলমনির মৃত্যুর জন্য হরিমোহনকে দোষারোপ করা যায় না, কারণ, এটি আকস্মিক ঘটনা, সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে এ ধরনের আইন পাশের কোন যৌক্তিকতা নেই। এই বিল আইনে পরিণত হলে, ধর্মের ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ করা হবে যা রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিজ্ঞাভঙ্গের সামিল। শুধু তাই নয় এই আইন কার্যকর হলে, একে অন্যকে বিপদে ফেলবে, সুনাম নষ্ট হবে হিন্দু পরিবারের, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ অপব্যবহার করবে আইনের। তিনি আরো বলেছিলেন, এই আইন পাশ হলে তা ঐতিহ্য ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধে যাবে এবং এটিই হচ্ছে মূল কথা যা সরকারের কাছে তুলে ধরতে হবে।[২১৭] ভারত বা বাংলায়তো বটেই পূর্ববঙ্গেও বিরোধীপক্ষ মোটামুটি তিলকের যুক্তির ওপর ভিত্তি করেই তাঁদের বক্তব্য প্রচার করেছিলেন।

কলকাতায় 'বঙ্গবাসী' যেমন ছিল হিন্দু রক্ষণশীলদের প্রধান মুখপত্র, তেমনি পূর্ববঙ্গ বা ঢাকায় এই আন্দোলনের সময়, রক্ষণশীলদের প্রধান প্রবক্তা ছিল 'ঢাকা প্রকাশ'। ঐ সময় হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের

প্রভাব পূর্ববঙ্গে কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ব্রাহ্মদের প্রভাব কি ভাবে কমে গিয়েছিল তার প্রমান 'ঢাকা প্রকাশ'-এর প্রচার সংখ্যা। ১৮৯০ সালে 'ঢাকা প্রকাশ'-এর প্রচার সংখ্যা ছিল ১২০০ কপি।[২১৮] ১৮৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ২২০০তে[২১৯] এবং ১৮৯৩ সালে পাঁচ হাজারে।

ঢাকা বা পূর্ববঙ্গে এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপাল কুঞ্জলাল নাগ। যারা বিলের পক্ষে ছিলেন তাঁদের তিনি অভিহিত করেছিলেন 'বিকৃত মস্তিস্ক' হিসেবে কারণ তাঁরা ছিলেন 'ইংরেজী শিক্ষিত'। 'ঢাকা প্রকাশ' এর এক সম্পাদকীয়তে লেখা হল, সরকারের সম্মতি আইন পাশ করাবার মূল কারণ 'বিজাতীয় লোকের কুসংস্কার।'[২২০] শুধু তাই নয় পাঠ্যপুস্তক থেকে ধর্ম (হিন্দু) ও শাস্ত্র বিরোধী সব ধরনের রচনা বাদ দিতে হবে এবং আর্যধর্মে নিষ্ঠাবান লোকদের শিক্ষকতা কার্যে নিয়োগ করতে হবে। এ ছাড়া 'যে সকল সামাজিক ও সংবাদপত্রাদিতে বিধবা বিবাহ সমর্থন, যুবতী বিবাহ প্রবর্তন, অথবা বালিকা বিবাহ নিবর্তন চতুবর্নন্যোচ্ছেদ বা জাতিভেদ না মানা, মূত্তিপূজা পরিবর্তন প্রভৃতি ধর্মবিরুদ্ধ মত সকল প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ সাময়িক ও সংবাদপত্রাদি পাঠে লোকের কুশিক্ষা হয় এবং পাপ হইয়া থাকে এমন ধর্মবিরুদ্ধ সংবাদপত্রাদি পরিচালককে অর্থদ্বারা কি কোন প্রকারে সাহায্য করিলেও গুরুতর পাপ' হবে।[২২১] শুধু তাই নয়, আন্দোলন চলাকালীন একদিন নাকি 'সহস্র সহস্র হিন্দু' সারাদিনরাত ঢাকার রাস্তায় হরি সংকীর্তন করেছিল।[২২২]

সহবাস সম্মতি বিল কাউন্সিল উত্থাপিত হওয়া মাত্র 'জনরব মিথ্যা নহে' এ শিরোনামে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করে 'ঢাকা প্রকাশ' উপসংহারে লিখেছিল, ঢের যুক্তি তর্ক হয়েছে, আরো হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু সময় খুব কম। সুতরাং পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সরকারকে এ আইন বিধিবদ্ধ করা থেকে নিরস্ত রাখার। আন্দোলন কি ভাবে করতে হয়, ইলবার্ট বিলের সময় ইউরোপীয়ানরা তা দেখিয়েছে। তবে বাঙ্গালীরা ইংরেজদের মত লাফ ঝাপ দেবেনা। তারা বিনীত অথচ দৃঢ় গুরুগম্ভীর ভাবে প্রতিবাদ' করবে।[২২৩]

পত্রিকাটি আরো লিখেছিল, অনেকে হয়ত হিন্দুসমাজের ধর্মভিত্তিক যুক্তি দেখে উপহাস করবেন কিন্তু এই আইন পাশ হলে হিন্দু ধর্মে

আঘাত হানবে। তা'ছাড়া এই বিলের অজুহাতে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের হাতে হিন্দু পরিবারের লাঞ্ছিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কারণ শত্রুতা করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি দরখাস্ত করতে পয়সা খরচ হয় না। শুধু তাই নয়, 'এই বিল বিধিবদ্ধ হইলে হিন্দু পরিবারের শান্তিময় ছায়াময়...নির্জ্জন বক্ষে এক দারুন কালসর্প প্রবেশ করিবে। কয়েকটা উষ্ণশোণিত সংস্কারকের কথায় এবং আচারানাভিজ্ঞ ইংরেজ সম্প্রদায়ের উত্তেজনায় গভর্ণমেন্ট কি ভাবে নিরীহ, চিরানুগত হিন্দু প্রজার বক্ষে অকারণে নিরপরাধে শেলবিদ্ধ করিবেন?'[২২৪] একই ভাবে 'শ্রীহট্ট দর্পণ'[২২৫] ও 'শক্তি'[২২৬] নামে দু'টি পত্রিকাও লিখেছিল, এই আইন হিন্দু মুসলমান উভয়ের ধর্মেই আঘাত হানবে।

এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে, ঢাকায় প্রথম সভা হয়েছিল ১৪ মাঘ ১২৯৭ সালে (১৮৯১)। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপাল কুঞ্জলাল নাগ। দীর্ঘ দেড় ঘন্টা বক্তৃতা দিয়েছিলেন কুঞ্জলাল নাগ। 'হিন্দু সন্তানদের' তিনি 'বিলাপধ্বনিতে' ভারতেশ্বরীর সিংহাসন 'কম্পিত' করার আবেদন জানিয়েছিলেন। মুসলমানদেরও তিনি অনুরোধ করেছিলেন যাতে তারা হিন্দুর বিপদে সহায়তা করে। কারণ তাঁর মতে, উভয় ধর্মের প্রতিই আঘাত হানা হয়েছে। সভা কয়েকটি প্রস্তাব পাশ করেছিলেন এবং এই আইন পাশ না করার আবেদন জানিয়েছিলেন। এ জন্যে একটি স্থায়ী কমিটিও নিয়োগ করা হয়েছিল যার বিশজন সদস্যের সবাই ছিলেন হিন্দু।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায়[২২৭] লেখা হয়েছিল—'হিন্দু জাগ। মুসলমান জাগ। তোমাদের ধর্ম যায়, কর্ম যায়, জাতি যায়, কুল যায়। আর শুইয়া থাকার সময় নাই, সকলে সমস্বরে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন কর।'[২১৮]

মুসলমান সম্প্রদায়ের অংশ গ্রহণ নজরে পড়ে ঢাকার দ্বিতীয় জনসভায় যেখানে উপস্থিত ছিলেন 'সাতসহস্র' লোক। এই সভায় হিন্দুমুসলমান অনেকেই বক্তৃতা করেছিলেন। মুসলমান বক্তরা তাঁদের অভিযোগ ব্যক্ত করেছিলেন, নির্দিষ্টভাবে। যেমন জমিদার ও উকিল সৈয়দ গোলাম মোস্তাফা বলেছিলেন, যারা মুসলমান ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না তারা কেন হস্তক্ষেপ করতে আসে মুসলমান ধর্মে। আর এ আইন পাশ হলেতো ডাক্তার, পুলিশ—এরা মুসলমান মহিলাদের

ইজ্জত নষ্ট করবে। হিন্দুরা এ অপমান যদি সহ্য করতে পারে করুক, কিন্তু মুসলমান তা সহ্য করবে না বরং বলবে—'হামকো বেইজ্জৎ করনেকো তোম কোন হ্যায় সালা, নিকাল যাও হিয়াসে, তরওয়াল সে সের কাট ডালেঙ্গে।'[২২৯]

ধর্মীয় ব্যাপার ছাড়াও বিরোধীদের প্রধান অভিযোগ ছিল ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে। বিরোধীদের মতে, যারা বিলের পক্ষাবলম্বন করছে তারা স্রেফ দু'পাতা ইংরেজী পড়ে তুড়ি দিয়ে সব উড়িয়ে দিতে চাইছে। জনৈক লেখিকা মত প্রকাশ করে লিখেছিলেন, 'ইংরেজী শিক্ষায়, ইংরেজী দীক্ষায়, আমাদের দেশটা মাটি কল্লো।'[২৩০]

১৮৯১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ৭ মার্চের মধ্যে শুধুমাত্র ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিলের বিরোধীরা আটটি সভা করেছিল। এমনি এক সভায় জমিদার মৌলবী মকবুল আলী বলেছিলেন, এই বিল শুধু হিন্দুরই নয়, মুসলমানদের ধর্মমতেও আঘাত হেনেছে। তাকে সমর্থন করেছিলেন তালুকদার মুন্সী বজলুর রহমান ও কুঞ্জলাল নাগ। সভা থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছিল, রমেশ চন্দ্র মিত্র, মৌলবী শামসুল হক, আবদুস সোবহান চৌধুরী ও বেঙ্গল টাইমসের সম্পাদক কেম্পকে কারণ তাঁরা ছিলেন আন্দোলনের পক্ষে। মুন্সী মহিউল্লাহ্ আরেকটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেছিলেন, 'আইস ভাই আমরা হিন্দুদিগের কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বজ্র গম্ভীর স্বরে এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি।[২৩১] কবি কায়কোবাদও এ সময় বিলের বিরুদ্ধে বিরাট এক কবিতা রচনা করেছিলেন।[২৩২] (দেখুন, পরিশিষ্ট)

ঢাকা ছাড়াও মফস্বলে, যেমন ময়মনসিংহ, রংপুর, যশোর, কুমিল্লা, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, সিলেট, রাজশাহী, নোয়াখালীতে এক হিসাব মতে মোট ৪১টি সভা হয়েছিল সরকারী প্রস্তাবের বিরোধিতা করে।[২৩৩] ঢাকার পরই বিরোধীপক্ষের বেশী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ময়মনসিংহে। এ সব সভার উদ্যোক্তা ছিল, যেমন, বরিশাল ধর্মরক্ষিণী সভা, রংপুর সুনীতি সঞ্চারিণী সভা, যশোর হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভা ইত্যাদি।[২৩৪]

তবে সরকার বা বিলের পক্ষে জনমত কতোটা শক্তিশালী ছিল তা নির্ণয় করা খানিকটা কঠিন। কারণ, পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত ঐ সময়ের সাময়িকপত্র, পুস্তিকা প্রভৃতি এখন দুস্প্রাপ্য। তবে বিরোধীদের মুখপাত্র ও অন্যান্য সূত্র থেকে সরকার পক্ষীয় জনমতের একটি

চিত্র দাঁড় করানো যেতে পারে।

ঢাকার, 'ঢাকা গেজেট', সরকার পক্ষ সমর্থন করেছিল।[২৩৫] ময়মনসিংহ থেকে জনৈক পাঠক, পত্রিকায় চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন 'ময়মনসিংহের উন্নত স্থান সেরপুরের কৃতবিদ্য ক্ষমতাশালী ভূম্যাধিকারীগণও সহবাস সম্মতিদানের আইনের জন্যে রাজদ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়াছেন। বড়ই লজ্জার কথা।'[২৩৬] আবার আন্দোলন চলাকালীন বিলের পক্ষাবলম্বী কিছু লোক নাকি কুঞ্জলাল নাগের কথা বলে বিলের পক্ষে সাত আটশো লোকের স্বাক্ষর নিয়ে সরকারের কাছে আবেদন পাঠিয়েছিল। একটি পত্রিকার মতে—'নীচতার চূড়ান্ত হইয়াছে।'[২৩৭]

মুসলমানদের একটি অংশ নবাব আহসান উল্লাহর নেতৃত্বে সমর্থন করেছিল সরকার পক্ষ। আহসানউল্লাহ কাউন্সিলে বলেছিলেন, তিনি ঢাকার মুসলমান সম্প্রদায়ের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাঁর বিশ্বাস পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের বৃহত্তর অংশ বিলের পক্ষে।[২৩৮] নবাবের এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে, ঢাকার ইংরেজী পত্রিকা 'বেঙ্গল টাইমস' লিখেছিল, নবাব এখানকার মুসলমানদের নিয়মকানুন সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই তিনি অমন মন্তব্য করেছেন। এই বিল মুসলমানদের ধর্মে আঘাত হানছে।[২৩৯] তবে মনে হয়, মুসলমানদের বৃহত্তর অংশ ছিল এবিলের পক্ষে কারণ তা'না হলে, প্রায় প্রতিটি জনসভা থেকে, হিন্দু নেতৃবর্গ মুসলমানদের বিলের বিপক্ষে যোগ দেওয়ার জন্যে আহবান জানাতেন না।

পূর্ববঙ্গে মুষ্টিমেয় যে সব ব্রাহ্ম ছিলেন, তারাও মনে হয় সরকার-পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। নোয়াখালী থেকে জনৈক পাঠক পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'ইহারা (সরকারী কর্মচারী) কেবল নিম্ন কর্মচারী, বিলাতফেরত ও ব্রাহ্ম অথবা ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের মত গ্রহণ করিতেছেন, পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মত গৃহীত হইতেছে না।[২৪০]

আর একটি পুস্তিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল এ বলে যে, 'যারা ব্রাহ্ম—সমাজের ধার ধারে না, সমাজ চিনে না, জানে না, সেই সকল বেওয়ারিশ বেতমিজ ভণ্ডদের কুমন্ত্রে ভুলিয়া সাহেবরা এ কুকাজ করেছেন।'[২৪১]

এতোসব বাদ প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিলটি বিধিবদ্ধ হয়েছিল ১৯ মার্চ ১৮৯১ সালে। হিন্দু সমাজ যেন হঠাৎ করে অনুধাবন করেছিল তারা

দাস জাতি কিন্তু 'মৃতবৎ হইলেও মরে নাই।'[২৪২] এখন কর্তব্য রাণীর কাছে বিনত হয়ে মিনতি কারণ, 'মায়ের নিকট না কাঁদিলে শিশু কাঁদিবে কার নিকট?'[২৪৩]

বলা যেতে পারে প্রায় তিরিশবছর ধরে তর্কবিতর্ক চলার পর সহবাস সম্মতি আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু আসলে তা'ছিল সরকার কর্তৃক সৃষ্ট, ১৮৬০ সালের বিলের আইনগত একটি ত্রুটি দূর করা মাত্র। প্রগতিবাদী সংস্কারকে যে সরকার সমর্থন করেছিল এমন নয়।[২৪৪]

সহবাস সম্মতি আইনের ফলে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল স্থিতিবস্থা বজায় রাখার আন্দোলন বা এক কথায় রক্ষণশীল আন্দোলন। এ আন্দোলন স্পষ্ট করে তুলেছিল যে, উনিশ শতকের শেষের দিকে গোঁড়া ঐতিহ্যবাদীরা আবার শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এর বিবিধ কারণ ছিল যা আমার বর্তমান আলোচনার পরিধির বাইরে।

মূলতঃ এ আন্দোলন ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের কারণ আইনটি হিন্দু বিয়ের সংস্কারের উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন জাগে তা সত্ত্বেও এ অঞ্চলের মুসলমানদের একাংশ এতে কেন যোগ দিয়েছিলেন? তারা ও কি ভেবেছিলেন এই বিল তাদের ধর্মের ওপর আঘাত হানবে? নাকি সাম্প্রদায়িক প্রীতি? নাকি কৌশলগত কারণে, অর্থাৎ আন্দোলনটি শুধু একক কোন সম্প্রদায়ের নয় তা প্রমাণের জন্যেই হিন্দু নেতৃবর্গ মুসলমানদের সঙ্গে এক ধরনের আঁতাত করতে চেয়েছিলেন? নাকি ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনের জন্যেই এই সম্প্রীতি, সাম্প্রদায়িক কিছু নয়? মনে হয়, মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান এতে যোগ দিয়েছিলেন যারা ঐতিহ্যগত চিন্তাধারায় ছিলেন বিশ্বাসী এবং হয়ত মনে করেছিলেন এই আইনের সুযোগ তাদেরও নাজেহাল করা হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানের সঙ্গে এর যোগ ছিল নিস্ক্রিয়।

এই আন্দোলনের জন প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে একটি জিনিষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটা ঠিক যে, কলকাতার অনুসরণেই এখানে আবার শহরকেন্দ্রিক হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু রক্ষণশীল এ আন্দোলন কতোটা প্রভাবিত করতে পেরেছিল পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষকে? বিরোধীপক্ষের সভাগুলির কেন্দ্র ছিল ঢাকা শহর এবং মফস্বল বা জেলাশহর। এর বাইরে এর রেশ পৌঁছেছিল কিনা সন্দেহ। পৌঁছলে সংবাদপত্রে নিশ্চয় তার খানিকটা প্রতিফলিত হত।

ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনে, আগেই উল্লেখ করেছি, বুদ্ধিজীবীরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও তাদের যুক্তিবাদ গড়ে ওঠে ধর্মকে কেন্দ্র করে এবং তাদের চিন্তার জগতে প্রবল বৈপরীত্য দেখা দেয়। সহবাস সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের উদাহরণ এ কথা আরো স্পষ্ট করে তোলে। যেমন, কুঞ্জলাল নাগ। তিনি নিজে ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, এবং তৎকালীন ঢাকার বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপাল। কিন্তু সব সময় তিনি ন্যাক্কারজনক ভাষায় গালাগাল করেছেন ইংরেজী শিক্ষিতদের এবং তাঁর ভাষায় সামাজিক সব অশান্তির মূল হল এই ইংরেজ শিক্ষিতরা। পূর্ববঙ্গের প্রভাবশালী ইংরেজী পত্রিকা 'বেঙ্গল টাইমস' (বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন চতুর্থ অধ্যায়) এর সম্পাদক কেম্প-এর কথাও ধরা যেতে পারে। বিরোধীপক্ষের আন্দোলনে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু মনে হয় তিনি ছিলেন মুসলমান ভক্ত অন্তত স্যার সৈয়দের কাছে লেখা তাঁর চিঠি এর প্রমাণ।[২১৫] স্বাভাবিকভাবে সরকার ভক্তও ছিলেন তিনি। কিন্তু তিনিই আবার বিপরীত শিবিরে অবস্থান করেছিলেন। হয়ত নিছক কিছু ফায়দা লাভের জন্যেই এ আচরণ করেছিলেন তিনি, যেমন অনেকেই করে বিভিন্ন আন্দোলনে যোগ দিয়ে।

তবে এই আন্দোলনের অন্য কয়েকটি দিকও বিচার্য। এই প্রথম বোধ হয়, পূর্ববঙ্গে জনমতের মেরুকরণ সম্ভব হয়েছিল। তা'ছাড়া এই আন্দোলনের একটি রাজনৈতিক দিকও ছিল। বা বলা যেতে পারে ধর্মকে ইস্যু করে সরকারবিরোধী একটি মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। এবং এই আন্দোলন কিছু রাজনৈতিক এলিট সৃষ্টি করেছিল যেমন কুঞ্জলাল নাগ, পরবর্তীকালে বঙ্গবঙ্গ আন্দোলনের সময় যাঁরা আবার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তবে এখানেও লক্ষণীয় যে ইলবার্ট বিলের সময় থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষিতরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি এবং তারা এটাও দেখেছিল যে, সরকার কি ভাবে নতি স্বীকার করেছিল মুষ্টিমেয় ইংরেজ অধিবাসীর কাছে। কিন্তু তা'সত্ত্বেও এ আন্দোলনের সময় আমরা দেখি, বারবার তারা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, এ প্রতিবাদ জানাচ্ছে তারা বিনীতভাবে। আবেদন নিবেদনের এই যে রাজনীতি, তার জের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ও আমরা দেখি চলছে। অবশ্য, ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনে সাধারণত তাই হয়।

৪. বঙ্গ ভঙ্গ

বঙ্গ ভঙ্গ বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কারণ এর ফলাফল যে এতো সুদূরপ্রসারী হবে তা'হয়ত ঔপনিবেশিক সরকারও কল্পনা করেনি। বঙ্গ ভঙ্গ বাংলার সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেতো বটেই, রাজনীতিতেও পরিবর্তন এনেছিল। এবং বঙ্গ ভঙ্গই হয়ত প্রথম আন্দোলন যার পক্ষে এবং বিপক্ষে জনমত ছিল প্রবলভাবে সোচ্চার। শুধু তাই নয় এ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জনসাধারণের সংখ্যাও ছিল বেশী।

এ পর্যন্ত বঙ্গ বঙ্গ নিয়ে প্রচুর প্রবন্ধ, পুস্তিকা, বই লেখা হয়েছে। পুংখানুপুংখভাবে বঙ্গ ভঙ্গের কারণ, ফলাফল ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আমি সে সব বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করবো না। তবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বঙ্গভঙ্গের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকরা যেসব আলোচনা করেছেন তাতে দু'টি বিষয়ই প্রধান হয়ে উঠেছে। একদল ঐতিহাসিকের মতে, প্রশাসনিক কারণেই ঔপনিবেশিক সরকার বাংলা বিভক্ত করেছিল (যে যুক্তি ঐ সময় ব্রিটিশ সিভিলিয়ানরা বিভিন্নভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন)। অন্যেরা বলছেন, ঔপনিবেশিক সরকারের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। বাংলা বিভক্ত করে রাজনৈতিক ফায়দা লাভের উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে ভাগ করেছিলেন।[২৪৬] বাদপ্রতিবাদের মধ্যে না গিয়ে আমরা বলতে পারি, একেবারে প্রথমদিকে হয়ত ঔপনিবেশিক সরকারের উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক কিন্তু অচিরেই ইংরেজ সিভিলিয়ানরা বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক সুবিধাগুলি অনুধাবণ করেছিলেন এবং তারপর সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করে সম্পন্ন করেছিলেন বঙ্গভঙ্গ। ঔপনিবেশিক সরকারের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের কথাতেই তা প্রমাণিত হয়। বঙ্গভঙ্গের প্রধান স্থপতি রিজলী লিখেছিলেন, ঐক্যবদ্ধ বাংলা একটি শক্তি। বিভক্ত বাংলা যা নয়...আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য একে বিভক্ত করা এবং এ ভাবে আমাদের শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিরোধীদের দুর্বল করে তোলা।[২৪৭] বাংলার লেঃ গভর্ণর ফ্রেজার এবং ভাইসরয় কার্জন মোটামুটি এ মত সমর্থন করেছিলেন।[২৪৮]

আমি এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা না করে, বঙ্গ ভঙ্গের বিভিন্ন পর্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে, পূর্ববঙ্গে এ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল তার ওপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।

১৮৭৪ সালে বাংলা প্রদেশ থেকে আসামকে বিচ্ছিন্ন করে একটি চিফ কমিশনারশিপের মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছিল। পরে সিলেটকে যুক্ত করা হয়েছিল আসামের সঙ্গে। ১৮৯২ (জুন) সালে লর্ড ল্যান্স-ডাউন ঘোষণা করেছিলেন বাংলা প্রদেশের আওতা থেকে লুসাই এবং চিন উপজাতির এলাকা আসামের আওতায় বদলি করা হবে। পরে চট্টগ্রামকেও যুক্ত করা হয়েছিল এর সঙ্গে। ১৮৯৮ সালে দক্ষিণ লুসাই পার্বত্য এলাকা যুক্ত করা হয়েছিল আসামের সঙ্গে। ১৯০৩ সালের ১০ জুলাই লর্ড কার্জন এলাকা পুণর্গঠন পরিকল্পনা অনুমোদন করে-ছিলেন। একই বছর নভেম্বর মাসে রিজলী এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি খসড়া পেশ করেছিলেন এবং এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর লর্ড কার্জন খসড়া পরিকল্পনা পুণর্বিন্যাস করেছিলেন কিন্তু খসড়ায় ঔপনিবেশিক সরকারের রাজনৈতিক সুবিধাগুলি উল্লেখ করা থেকে বিরত ছিলেন। ডিসেম্বরের ১২ তারিখ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল রিজলীর খসড়া প্রস্তাব এবং ১৯০৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারী ভাইসরয় কাউন্সিল তা অনুমোদন করেছিলেন।

সরকারী গেজেটে রিজলীর খসড়া প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা দেখি পূর্ববঙ্গে জন প্রতিক্রিয়া দানা বাঁধছে। কিন্তু প্রতিক্রিয়া যে এত ব্যাপক হবে তা বোধহয় ঔপনিবেশিক সরকার কল্পনা করেনি। সেই থেকে অধিকাংশ পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয়, জনসভা, স্মারকলিপি এবং প্রচার পুস্তিকায় একথাই বারবার তুলে ধরা হয়েছিল যে, ব্রিটিশ সরকার নীতিবহির্ভূত কাজ করেছেন। প্রথমদিকে পত্র-পত্রিকায় এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিনীতভাবে প্রতিবাদের আহ্বান জানানো হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে এ সুর পাল্টে গিয়েছিল এবং ব্রিটিশ সরকার সরাসরি আক্রমণের শিকার হয়ে পড়েছিলেন।

পূর্ববঙ্গে, বঙ্গ ভঙ্গের পক্ষে এবং বিপক্ষে জোরালো আন্দোলন হয়েছিল। প্রথমদিকে আন্দোলনের ধারা ছিল বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে কিন্তু পরে বঙ্গ ভঙ্গের পক্ষেও জনমত গড়ে উঠেছিল।

ঢাকা যেহেতু ছিল পূর্ববঙ্গের প্রধান নগর সেহেতু ঢাকাতে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছিল তীব্র। রিজলীর খসড়া প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের প্রধান বাঙলা পত্রিকা 'ঢাকা প্রকাশ' লিখছিল প্রাচীন কাল থেকেই 'বঙ্গদেশ' অবিচ্ছিন্ন এবং মুসলমান

সম্রাটরাও কখনো এর সীমানা সংকোচন করেন নি। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এখন এই প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করতে চান কারণ তারা 'ডিভাইড এণ্ড রুল' নীতির সমর্থক। বাঙ্গালীদের কাছে পত্রিকাটি এই বলে আবেদন জানিয়েছিল "...ভাই বঙ্গবাসী, এই বিষম বিপ্লবকর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে, বাঙ্গালী জাতির কি সর্বনাশ সংঘটিত হইবে একবার তাহা নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? ...অতএব স্বদেশের জন্যে, স্বদেশীদের জন্যে, যে কোন বঙ্গ সন্তানের শ্রদ্ধা আছে তাহাদের প্রত্যেকের কর্তব্য, এই প্রলয়ংকর প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জাতীয় অসন্তোষ চিহ্ন ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট স্থাপন করেন।"[২৪৯] শুধু তাই নয়, সাধারণ লোকদের অনুপ্রানিত করে তোলার উদ্দেশ্যে পরের সপ্তাহেই পত্রিকাটি লিখেছিল,—'রাজপুরুষের কুটিল কটাক্ষ দেখিয়া ভীত হইও না। পুরুষ পরম্পরাগত পৈত্রিক সম্পত্তি 'বাঙ্গালী' আখ্যা রক্ষার নিমিত্ত যদি আত্মোৎসর্গে বিমুখ হও, তবে ধরা পৃষ্ঠ হইতে যত শীঘ্র তোমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায় ততই মঙ্গল।'[২৫০]

ঢাকার প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ধানকোরার জমিদার বাড়ীতে। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধানত জমিদার, তালুকদার ও উকিলরা এবং প্রতিবাদ, বিক্ষোভ জানাবার ও সংগঠিত করার জন্যে এ সভা একটি কমিটিও গঠন করেছিল। সভাশেষে কমিটির পক্ষ থেকে চীফ সেক্রেটারীর কাছে 'দৃঢ় কিন্তু শ্রদ্ধাবনত প্রতিবাদ' জানানো হয়েছিল।[২৫১]

পরবর্তীকালে প্রধানতঃ এদের উদ্যোগেই দেশের বিভিন্ন অংশে জন-সভা করে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ঢাকায় একটি 'জনসাধারণ সভা' গঠন করা হয়েছিল।[২৫২] এ সভার পক্ষ থেকে ভারত সরকারের কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে সরকারের প্রস্তাব কার্যকর না করার আবেদন জানানো হয়েছিল। শুধু তাই নয় এ প্রসঙ্গে 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করেছিল সমগ্র ভারতের রাজধানী হিসেবেও যদি ঢাকাকে উন্নীত করে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহলেও পূর্ববঙ্গবাসী তা মেনে নেবে না। কারণ আবহমান কাল থেকে তারা বাঙ্গালী। বাঙ্গালী আখ্যা তাদের 'পৈত্রিক সম্পত্তি। পিতৃ প্রদত্ত অধিকার প্রানান্তেও পরিত্যাগ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। অধিবাসীবৃন্দের ন্যায্য আবেদন উপেক্ষিত হইলে, ইংরেজ রাজ্যের সমদর্শিতায় কলঙ্ক অর্জিত হইবে।'[২৫৩]

বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করার জন্যে এরপর জনসাধারণ

সভা ২০ পৌষ ১৩১০ (১৯০৩) এ বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে বাকল্যাণ্ড বাঁধের ওপর আয়োজন করেছিল এক বিরাট জনসভার। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ও জমিদার মৌলবী খলিলুর রহমান আবু জাইগম সাবির। চারটি মূল প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল এ সভায়। প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, যেহেতু এই অঞ্চলের সঙ্গে আসামের লোকদের শিক্ষা সংস্কৃতি সবকিছুতেই পার্থক্য আছে বা অন্যকথায় তারা অনগ্রসর সেহেতু আসামকে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যোগ করা অন্যায়। দীনেশচন্দ্র রায় প্রস্তাবটি উত্থাপন করলে সমর্থন করেছিলেন রাজিউদ্দিন আহমদ।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, সরকারী প্রস্তাবের প্রতিবাদে মফস্বলে যে সব প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হবে সেখানে তা সংহত করে তোলার উদ্দেশ্যে এইখানে যে কমিটি নিয়োগ করা হবে সে কমিটি থেকে সদস্য প্রেরণ করা হবে। কাজিমুদ্দিন আহম্মদ সিদ্দিকী এই প্রস্তাব করেছিলেন এবং তা সমর্থন করেছিলেন রাধাবল্লভ দাস।

তৃতীয় প্রস্তাবে 'গভর্ণমেন্টের উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ কার্য্যের ব্যয় নির্বাহার্থ অর্থসংগ্রহ এবং উক্ত বিষয়ে অন্যান্য 'আবশ্যক কার্য সম্পাদানার্থ' গঠন করা হয়েছিল একটি কমিটি। সবশেষে বাংলা বিভাগ প্রস্তাব কার্যকর করতে বাংলা সরকার যেন তাড়াহুড়া না করেন তার জন্যে আবেদন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাব দু'টি উত্থাপন করেছিলেন যথাক্রমে রাও সাহেব রতনমনি গুপ্ত এবং ডাঃ রাজকুমার চক্রবর্তী। সমর্থন করেছিলেন যথাক্রমে ডি মানুক এবং গোবিন্দ লাল বসাক।

১৯০৪ সালের গোড়ার দিকে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ প্রবেশ করলেন দৃশ্যে। ১১ জানুয়ারী (১৯০৪) বাংলা বিভাগ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার জন্যে স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে এক বৈঠকে আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। আলোচনাকালে নবাব এবং অন্যান্য সবাই সরকারী প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তারপর নবাব নতুন একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্রস্তাবটি ছিল—"আসাম, ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার ব্যতীত রাজশাহী বিভাগের অবশিষ্টাংশ এবং সম্ভবত যশোহর ও খুলনা লইয়া আসাম ভিন্ন অপর কোন উপযুক্ত নামকরণে, অপর কোন নূতন প্রদেশ সৃষ্টি করিতে

পারা যায় কিনা, যদি প্রস্তাবিত নূতন প্রদেশ কলিকাতা হাইকোর্টের এলাকার অধীন থাকে। এই নূতন প্রদেশের জন্যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল সহ একজন ছোটলাট শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং ঢাকাতে রাজধানী স্থাপিত হয়...” তা'হলে তারা সম্মত আছেন কিনা? উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ মতামত জ্ঞাপনের জন্যে দশদিন সময় নিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

পরবর্তীকালে নবাব যদিও বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেছিলেন কিন্তু আমরা দেখছি, প্রস্তাবটি যখন সরকারীভাবে কার্যকর হয়নি, অর্থাৎ প্রথমদিকে, এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। তাঁর নেওয়া নতুন প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ ধরনের একটি সিদ্ধান্তে হয়ত পৌঁছতে পারি যে, তিনি ঢাকাকে নতুন একটি প্রদেশের রাজধানী রূপে দেখতে চেয়েছিলেন। হয়ত ভেবেছিলেন, ঢাকার গৌরব বাড়লে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি আরো বৃদ্ধি পাবে। এবং নতুন প্রদেশের জনমতও হয়ত তিনি বেশ কিছুটা নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন।

নবাবের উপরোক্ত প্রস্তাব আলোচনার জন্য এক সভা আহ্বান করা হয়েছিল ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিক প্রভাবশালী আইনজীবী আনন্দচন্দ্র রায়ের বাসায়। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন হয় জমিদার, তালুকদার নয় সরকারী কর্মচারী অথবা উকিল। দু'একজন মুসলমানও উপস্থিত ছিলেন এ সভায়। এবং তাঁরা সবাই নবাবের প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়েছিলেন।

ঢাকায় আরেকজন প্রভাবশালী নাগরিক বলিয়াদীর জমিদার কাজেম উদ্দিন আহমদ সিদ্দিকীর বাসায় ‘মহম্মদীয়ান ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন এসোসিয়েশনের’ এক সভা আহ্বান করা হয়েছিল ১৯০৪ সালের ২৫ জানুয়ারী। সভায় প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়েছিল। তাদের একটি প্রধান যুক্তি ছিল—‘মহসীন ফণ্ডের উপকারীতা হইতে বঞ্চীত হইলে মুসলমান সম্প্রদায়ের অনিষ্ট হইবে।’[২৫৪]

পরের দিন নর্থব্রুক হলে একটি সভায় ‘মফস্বলবাসী জমিদার প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর ভূম্যধিকারীবর্গ, বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত’ বাংলা বিভাগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। এই সভায় ন'টি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাঁচটি প্রস্তাব ছিল—এক: এই বিভাজন বাংলা সাহিত্যের মান নীচু করবে এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে যে সামাজিক ঐক্য বিদ্যমান তা'ছিন্ন করবে। দুই: এই অঞ্চলের

জনগণ বঞ্চিত হবে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সুবিধা থেকে এবং আঞ্চলিক বাজেট আলোচনার লোকাল কাউন্সিলের একজন সদস্য নির্বাচনের সুযোগ হারাবে। তিন ঃ বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার জটিল আইনসমূহ, নতুন প্রদেশের নতুন কর্মচারীদের হাতে পড়ে আরো জটিল হয়ে উঠবে। চার ঃ উপযুক্ত বিদ্যায়তনের অভাবে এ অঞ্চলের উচ্চমানের অবনতি ঘটবে এবং পাঁচ ঃ বাংলা বিভাগ প্রস্তাবের ফলে কলকাতায় থাকছে হাই কোর্ট অন্যদিকে প্রশাসনিক ব্যবস্থার কেন্দ্র থাকবে অন্য অঞ্চলে, ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারদের কর্মচারী নিয়োগ করার ব্যাপারে অসুবিধা হবে।[২৫৫] মনে হয় শেষোক্ত কারণেই বিশেষ করে জমিদাররা বঙ্গভঙ্গ মেনে নিতে পারছিলেন না। সরকারী এক চিঠিতে জানা যায় ঢাকা বিভাগের জমিদাররা স্বার্থগত কারণে এই বিভাগের বিরোধিতা করছিলেন।[২৫৬]

এরপর দিন ঢাকার গ্রাজুয়েটরা, নর্থব্রুক হলে বাংলা বিভাগের বিরোধিতা করে চারটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। যার মধ্যে একটি প্রস্তাব ছিল আগের দেওয়া প্রস্তাবগুলি থেকে একটু ভিন্নতর। ঐ প্রস্তাবের মাধ্যমে গ্রাজুয়েটরা আশংকা প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, বাংলা বিভাগের ফলে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের চাকরি পাবার বেলায় প্রতিকূলতার সৃষ্টি হতে পারে।[২৫৭]

ঐ একই দিন, বিকেলে, একই 'জায়গায় ঢাকা জিলাস্থিত বিভিন্ন গ্রামের শতাধিক প্রতিবাদ সভা হইতে নির্বাচিত অন্যূন এক সহস্র প্রতিনিধি' এবং 'ঢাকার বিরাট সভা, জমিদার সভা, গ্রাজুয়েট সভা এবং মুসলমান প্রতিনিধি সভায় নির্বাচিত' ডেলিগেটরা এক সভার আয়োজন করে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিল। ঐ সভা মোট বারোটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল যা ছিল পূর্বোল্লিখিত প্রস্তাবগুলিরই রকমফের। এই সভা কলকাতার প্রতিবাদ সভায় প্রেরণের জন্যে ৪৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব-কমিটি গঠন করেছিল যার মধ্যে ৪৩ জন ছিলেন হিন্দু সদস্য, ৫ জন মুসলমান এবং একজন ইংরেজ।[২৫৮]

একই সময়ে ঢাকার ইমামগঞ্জের 'প্রসিদ্ধ বক্তা' মাষ্টার হেদায়েত বক্সের উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকার মুসলমান সর্দারদের নিয়ে। হেদায়েত বক্স উর্দু ও বাংলায় পুরো বিষয়টি বুঝিয়ে দিলে সবাই এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। হেদায়েত বক্স যে বিষয়টির ওপর বিশেষ

জোর দিয়েছিলেন তা'হল, আসামে বিশুদ্ধ মুসলমানের একান্তই অভাব। ঢাকা ময়মনসিংহ যদি আসামের সংগে যুক্ত হয় তবে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের সংগে বাধ্য হয়ে বিবাহ বন্ধনে মিলিত হতে হবে যার ফলে 'শোনিত দোষে'র সৃষ্টি হবে মুসলমান সমাজে।[২৫৯]

পূর্ববঙ্গে সরকারী বক্তব্যের সমর্থনে জনমত গড়ে তোলার জন্যে লর্ড কার্জনের আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে অভিনন্দন পত্র দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু তা নিয়েও ঝড় উঠেছিল বিতর্কের। 'অভিনন্দনে বঙ্গ বিভাগ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়া অবশেষে নাকী লিখা হইয়াছে যে, যদি একান্তই বিভাগ করিতে হয় তবে বঙ্গের অপর কিয়দংশ লইয়া লেজিসলেটিভ কাউন্সিল সহ একজন লেপ্টেন্যান্ট গভর্ণর নিযুক্ত এবং ঢাকাতে রাজধানী স্থাপিত করা হউক।' কিন্তু শেষোক্ত এই প্রস্তাব নিয়েও দু'দিন জোর বিতর্ক চলে এবং নির্বাচিত সদস্যরা এর প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু সরকার কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা বেশী হওয়ায় ঐ প্রস্তাব পাশ হয়ে গিয়েছিল। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডেও ঘটেছিল ঠিক একই ব্যাপার। 'জনসাধারণের অনভিপ্রেত মন্তব্য অভিনন্দনে সন্নিবেশিত' হওয়ায় বোর্ডের আটজন সদস্য পদত্যাগ করেন।[২৬০]

ফেব্রুয়ারীর ৭ তারিখ (১৯০৪) জগন্নাথ কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছিল মুসলমানদের এক সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন 'ভারতের মোগল সম্রাটবর্গের পুরোহিত বংশদ্ভূত শতাধিক বর্ষীয় বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত সৈয়দ গোলাম মুস্তফা আল হোসেনি।' সভায় ঠিক করা হয়েছিল আসন্ন 'বিপদ বহ্নি' থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সবাই মসজিদে প্রার্থনা করবেন এবং এ প্রস্তাবের পক্ষে কেউ বললে 'এই সভার উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী অতি দৃঢ়তার সহিত সসম্মানে তাহার প্রতিবাদ করিবেন।'[২৬১]

কিন্তু একই সময় দেখা যাচ্ছে খানিকটা ফাটল ধরেছিল মুসলমান জনমতে। নবাব সলিমুল্লাহ প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন সরকার পক্ষ সমর্থনের যদিও তিনি তখনও যাননি পুরোপুরি সরকার পক্ষে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অভিনন্দনপত্রে নতুন প্রস্তাব সংযোজিত হওয়ায় 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করেছিল—'নবাব বাহাদুর পরিচালিত মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিনন্দনেও এই নতুন প্রস্তাবের অনুমোদন প্রকাশিত হইবে সুতরাং বঙ্গের প্রাচীন রাজধানীর পরিনাম কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।' বড় লাটকে দেওয়া মুসলমান সভার অভিনন্দন পত্রে বলা হয়ে-

ছিল যে, বর্তমানে যে সব প্রতিবাদ আন্দোলন হচ্ছে তাতে তারা অংশ নিচ্ছেন না বটে কিন্তু বিরোধিতা করছেন বাংলা বিভাগের।[২৬২]

মার্চ মাসে (১৯০৪) জনসাধারণ সভার সভাপতি ও ঢাকা ল্যাণ্ড হোল্ডারস এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী, জমিদার ও উকিল আনন্দচন্দ্র রায় বাংলার লেঃ গভর্ণরকে এক দীর্ঘ স্মারকলিপি প্রেরণ করেছিলেন। এতে তিনি অবতারণা করেছিলেন ষাটটি যুক্তির।[২৬৩]

ঢাকা ব্যতীত পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে জনমত গড়ে তুলতে প্রধানতঃ সাহায্য করেছিলেন ঢাকার জনসাধারণ সভার নেতৃবৃন্দ। এ ছাড়া মফস্বলের জমিদার, তালুকদার ও পেশাদার বা মধ্যশ্রেণী এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। 'ঢাকা প্রকাশ'-এ মফস্বলে অনুষ্ঠিত যে সব সভার বিবরণ পাওয়া গেছে তার সংখ্যা মোট ১৯৬। এইসব সভায় সভাপতিত্ব করে-ছিলেন জমিদার বা তালুকদার, প্রত্যন্ত গ্রামে স্কুলমাষ্টার বা ঐ অঞ্চলের কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি। প্রতিবাদ সভাগুলিতে সবাই একবাক্যে 'বঙ্গ বিভাগ' প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

মফস্বলে, ঢাকার পর বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ময়মনসিংহে। 'এই অধিবেশনে নগরে অন্যূন ৫০ হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল। ৩০/৩৫ হাজার লোক অধিবেশনে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। এই মহাসভায় একশোজন বক্তৃতা দিয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য বক্তারা ছিলেন, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি বাবু জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, সূর্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, আনন্দমোহন বসু, এবং সুসঙ্গের মহারাজ কুমুদ চন্দ্র সিংহ।'[২৬৪] এ সংবাদ যে অতিরঞ্জিত সন্দেহ নেই তবে শহরের লোক বোধহয় খানিকটা আলোড়িত হয়েছিল। শুধু তাই নয় শহরের ২৩টি মসজিদে নাকি মুসলমানরা জমায়েত হয়ে খোদার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যাতে এ প্রস্তাব কার্যকর না হয়।[২৬৫]

মফস্বলে অনেকগুলি সভাতেই সভাপতিত্ব করেছিলেন ঐসব অঞ্চলের সুপরিচিত মুসলমান ব্যক্তিবর্গ। যেমন জানুয়ারী মাসে (১৯০৪) চট্টগ্রামে এক জনসভা হয়েছিল। সেখানে সভাপতিত্ব করেছিলেন আনোয়ার আলী খাঁ। সভার প্রস্তাবাবলী পাঠানো হয়েছিল লর্ড কার্জনকে। বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রধান কয়েকটি যুক্তি ছিল—[২৬৬]

ক. যদি প্রশাসনিক কারণেই বঙ্গভঙ্গ হয় তা'হলে উড়িষ্যাকে আলাদা করে নিলেইতো হয়

খ. চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতিই যদি সরকারের কাম্য তা'হলে এর উন্নতি না হওয়ার কোন কারণ নেই। বরং বন্দরের উন্নতির জন্যে বাংলার নিজস্ব সম্পদই যথেষ্ট। সুতরাং আসামের মত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ প্রদেশের অন্তর্গত হয়ে কি লাভ ?

গ. শুধু তাই নয়, আসাম সরকারের এতো অর্থ নেই যে তাদের শিক্ষায়তনগুলির জন্যে ভালো শিক্ষক নিয়োগ করবেন। সেক্ষেত্রে আসাম প্রদেশের শিক্ষার মান নেমে যাবে।

সিলেট থেকে, সিলেট পৌরসভার চেয়ারম্যান সরকারকে এক নোটে এই সময় জানিয়েছিলেন যে, ঢাকা এবং ময়মনসিংহের লোকেরা শিক্ষিত এবং নতুন প্রদেশ হলে সব তাদের একচেটিয়া থাকবে। শুধু তাই নয়, এসব অঞ্চলের লোকেরা মেঘনার পূর্বদিকের লোকদের আদিম বলে মনে করে ফলে এদের সহবস্থান হতে পারে না। সুতরাং চট্টগ্রামকে আসামের সঙ্গে যোগ করা হোক (বন্দরের সুবিধার জন্যে)। ঢাকা ও ময়মনসিংহকে বাদ দিয়ে, আসাম ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল নিয়ে লেঃ গভর্ণরের অধীনে একটি নতুন প্রদেশ হতে পারে।[২৬৭] ফেনীর জনগণের পক্ষ থেকে আবদুল মজিদ ও অন্যান্য বাংলা বিভাগের প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারকে স্মারকলিপি প্রেরণ করেছিলেন।[২৬৮] বরিশালে প্রবীন ও নবীনরা আন্দোলন চালাবার জন্যে গঠন করেছিল দু'টি দল—প্রবীণদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'নেতৃসংঘ' এবং যুবকদের নিয়ে 'কর্মী সংঘ'। কর্মীসংঘের উদ্যোক্তা ছিলেন অশ্বিনীকুমার রায়। এ দলের সদস্যেরা বরিশাল শহরের পথে পথে বক্তৃতা দিয়ে জনমত সংগঠিত করতেন।[২৬৯]

সরকারী পক্ষের যুক্তি উপস্থাপনের জন্যে, ১৯০৪-এর ফেব্রুয়ারীতে লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ সফর করেছিলেন। কার্জনের প্রধান যুক্তি ছিল প্রশাসনিক কারণে এ বিভাগ প্রয়োজন। এছাড়া তাঁর মতে, দরিদ্র রায়ত, দোকানদার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকজন এখনো প্রস্তাবটি বুঝতে পারে নি এবং এই সুযোগে শিক্ষিত শ্রেণী তাদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে। একটি সংবাদপত্রে এ পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হয়েছিল, 'বলিতে ঘৃণা ও লজ্জায় মরমে মরিয়া যাইতে হয়, পূর্ববঙ্গে রাজপ্রতিনিধির বাক্যজাল বিস্তার, সত্য সত্যই, এমনই হলাহল উদগীরণ করিয়া সভ্যতার শিরে দূরপনেয় কলঙ্ক অর্জন করিয়াছে।'[২৭০]

উপরোক্ত ঘটনাবলী বিচার করে দেখলে মনে হয় বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নে প্রথম দিকে আবেগই ছিল প্রধান। আন্দোলনকারীরা নিজ পক্ষে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তার হয়ত কিছু ঠিক, তবে এ কথাও স্বীকার্য যে, এ আন্দোলনের পিছে আবার কাজ করেছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং শ্রেণীস্বার্থ। অনেক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্বার্থও। তবে প্রতিবাদ মিছিল বা জনসভা ইত্যাদি প্রধানত ছিল শহর কেন্দ্রিক এবং নেতৃত্বও দিয়েছিলেন শহরের মধ্যশ্রেণীর নাগরিকরা। পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বা সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই আন্দোলনের তেমন কোন সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না। হয়ত গ্রামাঞ্চলে এর রেশ পৌঁছেছিল কিন্তু সাধারণ কৃষক এতে আবেগ তাড়িত হয় নি বা তাকে এই আন্দোলন স্পর্শ করেনি।

প্রথমদিকে, শহরাঞ্চলীয় মুসলমান সম্প্রদায়ও বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিল কিন্তু কার্জনের পূর্ববঙ্গ সফরের পর মুসলমান নেতাদের সুর বদলে গিয়েছিল এবং নবাব সলিমুল্লাহ সরকারী বক্তব্যের প্রধান সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন।[২৭১] কিন্তু প্রথম দিকে মুসলমানদের অনেকেই বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন—এর কারণ কি পারস্পরিক অস্বস্তিকর আঁতাত? তবে এটা ঠিক যে, পূর্ববঙ্গের প্রধান হিন্দু জমিদার ও ভদ্রলোক নেতারাই এখানকার প্রতিবাদ সভাগুলি আয়োজন করেছিলেন এবং কৌশলগত কারণে অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের সভাপতি করেছিলেন। এই কৌশল পরে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও ব্যবহৃত হয়েছিল এবং সংবাদপত্রসমূহও এতে সমর্থন যুগিয়েছিল।[২৭২]

বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নে মুসলমান বুদ্ধিজীবীরাও দ্বিমত পোষণ করতেন। যেমন ইসমাইল হোসেন সিরাজী ছিলেন বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে। আবার মুনশী মেহেরুল্লাহ ছিলেন বঙ্গভঙ্গের পক্ষে।[২৭৩] তবে মনে হয়, মুসলমানদের অনেকে যে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেননি তার প্রধান কারণ তাঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাস। পূর্ববঙ্গের দুই প্রধান সম্প্রদায় যখন দু'রকম কথা বলছিল তখন ঢাকায় মুসলমান সমিতির একটি অধিবেশন হয়েছিল যাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ। ঐ অধিবেশনে সিরাজী তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, '...ভারতের হিন্দু মুসলমান এক বৃন্তে দু'টি ফুল বা একই দেহের অঙ্গান্তর মাত্র। এক দেহের উভয় অঙ্গ মধ্যে সম্প্রীতি সংস্থাপিত হইবে না, বিদ্বেষ প্রনোদিত না হইলে কেমন করিয়া একথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। ভারতের জীবনী শক্তি এবং বর্তমান

ও ভবিষ্যৎ সুখ সম্পদ এই জাতির একপ্রাণতার উপরই নির্ভর করে।[২৭৪] সিরাজী ছিলেন কংগ্রেসে এবং পূর্ববঙ্গে সে সময় (তখন আন্দোলন তুঙ্গে এবং মুসলমানরা এর বিরোধিতা করছিল) এ ধরনের ঘটনা ব্যতিক্রম মাত্র। এ ক্ষেত্রে সলিমুল্লাহর ভাই আতিকুল্লাহর কথাও উল্লেখ করা যায় যিনি পারিবারিক কলহের কারণে সলিমুল্লাহ বিরোধী বক্তব্য রেখেছিলেন।

পূর্ববঙ্গে খুব সম্ভব সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিনাশ ঘটেছিল ১৯০৪ এর নভেম্বরে ঢাকার দাঙ্গায়। দাঙ্গার কারণ সেই পুরনো—নবাবপুরের এক মসজিদের সামনে দিয়ে পূজোর মিছিল যাচ্ছিল। কার্জনের আগমনের পর দুই সম্প্রদায়ে যে ফাটল ধরেছিল দাঙ্গা এবং অন্যান্য কারণে তা আরো দৃঢ় হয়েছিল এবং সেই ফাটল কখনও আর জোড়া লাগেনি। এর কিছুদিন পরই কার্যকর হয়েছিল বাংলা বিভাগ।

কিন্তু এই আন্দোলনের সময় জনমতের আরেকটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। অনুচ্চ এই স্বর, প্রতিবাদের ডামাডোলে ভেসে গিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে, এরা নিজেদের হিন্দু বা মুসলমান হিসেবে না দেখে দেখেছিলেন পূর্ববঙ্গবাসী হিসেবে। এমনি একজন হলেন গিরীশচন্দ্র সেন (ভাই গিরীশচন্দ্র)। তিনি লিখেছিলেন, বঙ্গভঙ্গ তিনি সমর্থন করেন কারণ এর ফলে পশ্চাৎপদ পূর্ববঙ্গের উন্নতি হবে। এবং একথা ভেবে তাঁর 'আহলাদ হইয়াছে।' 'পশ্চিমবঙ্গের কথা ছাড়িয়াদি, বাঙ্গালদিগের উন্নতি দর্শন অনেকের চক্ষুশুল হইতে পারে। কলিকাতা অঞ্চলে পূর্ব-বঙ্গ নিবাসী কৃতবিদ্য লোকেরা কোন অফিসে তাঁহাদের কর্তৃক বাধা পাইয়া সহজে প্রবেশ করিতে পারেন না। এখানকার কেরানীগিরী প্রভৃতি কাজ এক প্রকার এখানকার লোকেরই একচেটিয়া হইয়া রহিয়াছে।'[২৭৫] গিরিশচন্দ্র বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে 'বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখদের' প্রচারকে 'দুঃখব্রত' বলেছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন বাংলা বিভাগ অর্থ-নৈতিক দিক থেকে পূর্ববঙ্গের জন্যে কল্যানকর। গিরীশচন্দ্র আরো লিখেছিলেন, 'আমার জন্মস্থান ঢাকা জিলায়, সে স্থানে আমার বাসগৃহ, আমি ঢাকা নিবাসী। ঢাকা রাজধানী হইল, ঢাকা অঞ্চলের অনেক বিষয়ে উন্নতি হইতে চলিল ইহাতে আমার দুঃখ না হইয়া বরং আনন্দ হওয়াই স্বাভাবিক।'[২৭৬]

'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' শুরু হয়েছিল রিজলীর খসড়া প্রস্তাব প্রকাশের

সংগে সংগে। কিন্তু শতপ্রতিবাদ প্রতি সত্বেও সরকার নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকলে, আন্দোলনের গতি পরিবর্তিত হয়েছিল যা আমার আলোচ্য বিষয় নয়। তবে পূর্ববঙ্গে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিপক্ষেই আন্দোলন হয়েছিল বেশী, পক্ষে যে কিছু হয়নি তা'নয় তবে তা ভেসে গিয়েছিল প্রতিবাদের স্রোতে।

উপরোক্ত বিবরণের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, এ আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল মূলত শহুরে ভদ্রলোকদের মধ্যে। আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল ঢাকায়, এবং তারপর ময়মনসিংহে যা ঢাকারই কাছাকাছি। অন্যান্য অঞ্চলেও যে বাদ প্রতিবাদ হয়নি তা'নয় তবে তা এ দুটি শহরের তুলনায় কিছুই নয়। আর যারা আন্দোলনের পক্ষে বা বিপক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা সবাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিলেন শিক্ষিত উচ্চবিত্ত বা মধ্য শ্রেণীর ভদ্রলোক। নানাবিধ কারণে আলোড়িত হয়েছিলেন ভদ্রলোকরা। এর মধ্যে প্রধান কারণ আবেগজাত। তাঁরা বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে নিয়েছিলেন মাতৃভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করার ষড়যন্ত্র হিসেবে। স্বার্থগত কারণ যে ছিল না তা'নয়। নানাবিধ স্বার্থ কাজ করেছিল যা বিভিন্ন সভার নেওয়া প্রস্তাব গুলিতে ফুটে উঠেছে। কারণ তাদের স্বার্থে আঘাত না লাগলে শুধুমাত্র আবেগজাত কারণে তারা এতো বিক্ষুব্ধ হতেন কিনা সন্দেহ।

মফস্বল বা গ্রামে যে জনসভা কিছু হয় নি তা'নয়। কিন্তু তাই বলে যদি আমরা ধরে নিই, সাধারণ মানুষকেও এ আন্দোলন আলোড়িত করেছিল তবে ভুল হবে। কিন্তু সংগে সংগে স্বীকার্য যে, আমার আলোচ্য আন্দোলনগুলির মধ্যে বঙ্গভঙ্গই একমাত্র আন্দোলন যার ব্যাপকতা ছিল, আন্দোলনের পক্ষে-বিপক্ষে অংশগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যাও ছিল বেশী।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী যা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। কারণ পরবর্তীকালে আরো ব্যাপক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা স্বদেশী বা স্বরাজ আন্দোলনের ভিত্তি ছিল বঙ্গভঙ্গের আবেগজাত উপাদানাবলী যা ঔপনিবেশিক সরকার বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের ফলে কিন্তু আবার আবির্ভাব হয়েছিল এক নতুন শ্রেণীর নেতাদের যারা আবার চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের সংগে।[২৭৭] অন্যদিকে মুসলমানরাও সম্প্রদায় হিসেবে আরো

সচেতন হয়ে উঠেছিল এ আন্দোলনের ফলে, যার পরিণতি ঘটছিল মুসলিম লীগ গঠন ও অন্যান্য ঘটনাবলীতে। শহুরে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পর্ক অনেকাংশে ফাটল ধরিয়েছিল বঙ্গভঙ্গ।

এটা ঠিক বঙ্গভঙ্গ নতুন শ্রেণীর নেতৃবর্গের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ১৯০৪-৫ পর্যন্তও নেতৃবর্গের রাজনীতি ছিল আবেদন নিবেদনের।

এ অধ্যায়ে আমি চারটি সামাজিক আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছি। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ও ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গের সংগে জড়িত ছিল আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক প্রশ্ন। অন্যদিকে ব্রাহ্ম ও সহবাস সম্মতি আন্দোলনের সংগে প্রাথমিক ভাবে জড়িত ছিল ধর্মীয় প্রশ্নাবলী। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, এগুলি ছিল হিন্দু ধর্মের সংগে সরাসরি জড়িত। ফলে প্রথম এবং শেষোক্ত আন্দোলন যেরকম (অপেক্ষাকৃত) ব্যাপক ভাবে সাড়া জাগাতে পেরেছিল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আন্দোলন দুটি তা পারেনি।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের আঁচ পূর্ববঙ্গে এসে পৌঁছলেও তা ছিল সামান্য। একে পূর্ববঙ্গ ছিল বিদ্রোহের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে, প্রায় এক প্রান্তে, অন্যদিকে সিপাহীরাও ছিল বহিরাগত, অবাঙ্গালী। শহরাঞ্চলের কিছু মানুষ ইংরেজদের সহায়তা করেছিল, আতংকিত হয়েছিল, কিন্তু গ্রামের মানুষ ছিল এর নীরব দর্শক মাত্র। তবে এটাও ঠিক ১৮৫৭-এর বিদ্রোহ সাধারণ মানুষের কাছে কিছু প্রতীকী মূল্যবোধের সৃষ্টি করেছিল। সৃষ্টি করেছিল তাদের মনে কিছু বীরের যারা সংগ্রামী চেতনাকে করেছিল উজ্জীবিত।

ব্রাহ্ম আন্দোলন পূর্ববঙ্গের সমাজ জীবনের বদ্ধ জলাশয়ে খানিকটা আলোড়ন তুলেছিল ঠিকই কিন্তু সে আলোড়ন জেলা বা মহকুমা শহর ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। তারা যা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পেরেছিল তা শহুরে উচ্চবর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই। তবে তাদের আন্দোলনের ফলে যে বাদ প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়েছিল সেটাই ছিল সামগ্রিকভাবে সমাজের লাভ—এ আন্দোলন শহুরে মানুষের মনের অচলায়তন খুলতে সহায়তা করেছিল। এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ করলে বোধ-হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তা'হল, পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন তাদের সাক্ষাৎ বংশধররা পরবর্তীকালে বাংলার সমাজে নানা ক্ষেত্রে যশস্বী হয়েছিলেন। বলা যেতে পারে, ব্রাহ্ম আন্দোলন

উদার (লিবারেল) একটি জেনারেশনের ভিত্তি গড়তে সহায়তা করেছিল।[২২৮]

ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলে রক্ষণশীল হিন্দুদের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা তুঙ্গে উঠেছিল সহবাস সম্মতি আন্দোলনের সময়। তবে এ আন্দোলনও শহরে বসবাসরত শুধু হিন্দু সম্প্রদায়কেই আলোড়িত করেছিল। এর বাইরে এ তেমন প্রভাব ফেলতে পারে নি।

একমাত্র বঙ্গভঙ্গই বোধহয় সামগ্রিকভাবে এখানে আলোড়ন তুলেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ আন্দোলন (শেষ পর্যায়ে) মুসলমান ও হিন্দু যে দু'টি আলাদা সম্প্রদায় তা গভীরভাবে চিহ্নিত করেছিল। একই দেশে যুগ যুগান্ত ধরে বসবাসের পর তারা হঠাৎ আবিষ্কার করেছিল যে তারা কেউ কারো মিত্র নয় এবং হতেও পারে না। কিন্তু এ আন্দোলনও প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল শহরে। কিন্তু ১৯০৫ এর আন্দোলন শহুরে মানুষের মনে যে বিষবৃক্ষ রোপন করেছিল পরবর্তীকালে আমরা দেখি তা পরিণত হয়েছে মহিরূহে। বিভক্ত করে তুলেছিল পূর্ববঙ্গের জনগণকে দু'টি বিবাদমান শিবিরে।

উপরোক্ত আন্দোলনগুলি আলোচনাকালে আমরা লক্ষ্য করেছি, বিশেষ করে ব্রাহ্ম ও সহবাস সম্মতি আইন আন্দোলনের সময়, সংস্কার বিরোধী কণ্ঠস্বর ছিল বেশ শক্তিশালী। এর কারণও আমি উল্লেখ করেছি। ইংল্যাণ্ডের চেয়ে ভারতে এ ধরনের রক্ষণশীলতার স্থান ছিল বেশ দৃঢ় কারণ ইংল্যাণ্ড শিল্প ভিত্তিক সমাজের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। অন্যদিকে ভারতে অবিভাবকবাদ, সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধের সৃষ্টি করেছিল এবং বিরোধীদের বিভক্ত করে দিয়েছিল।[২২৯] ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনে, এই ধার করা আদর্শ ও অভিভাবকবাদ এই দু'য়ের ফলে, আমরা দেখি, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও মধ্যশ্রেণী বুদ্ধিজীবীরা পরস্পর বিরোধী আচরণ করেছিল।

কিন্তু সামাজিক সংস্কার বিষয়ক আন্দোলনগুলির বিপরীতে কৃষক আন্দোলন বা বিদ্রোহগুলি (যেমন, ফরায়েযী বিদ্রোহ ১৮৩৮-৪৮, নীল-বিদ্রোহ ১৮৫৯-৬১, সন্দ্বীপের বিদ্রোহ ১৮৭০, সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ ১৮৭২-৭৩, যশোরের নীলবিদ্রোহ ১৮৮৯ প্রভৃতি) যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তা'হলে দেখবো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত বিভেদ ভুলে,

ঐক্যবদ্ধভাবে তারা শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। এটা ঠিক যে, তাদের বিদ্রোহগুলি ছিল তাৎক্ষণিক বা তারা আসল শত্রু নির্ণয় করতে পারেনি, সংগঠনও ছিল না তাদের এবং ব্যর্থ হয়েছিল তারা বারবার। কিন্তু শহুরে ভদ্রলোকদের আবেদন নিবেদনের রাজনীতির (আমার আলোচ্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে) বিপরীতে তাদের ভূমিকাই ছিল সংগ্রামী।

ফরায়েযী আন্দোলনের কথা ধরা যাক।[২৮০] পূর্ববঙ্গের এক বিশাল এলাকা জুড়ে হয়েছিল এ আন্দোলন। প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় আন্দোলন হলেও পরে তা পুরোপুরি পরিণত হয়েছিল কৃষক আন্দোলনে। অনেকে অভিযোগ করেছেন যে, এ আন্দোলন ছিল সাম্প্রদায়িক। কারণ হিন্দুরা অনেকে এ আন্দোলনের সময় গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত এর পক্ষে কোন তথ্য কেউ দিতে পারে নি।[২৮১]

বা ধরা যাক নীলবিদ্রোহের কথা। পূর্ববঙ্গের বেশ ক'টি অঞ্চল জুড়ে হয়েছিল এ বিদ্রোহ এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে কৃষকরা এতে যোগ দিয়েছিল। জনৈক ইংরেজ লেখকই এ পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করে-ছিলেন, 'বাঙালার কৃষকরা তাদের অধিকার বিনা সংগ্রামে ছেড়ে দেয় নি।'[২৮২]

এ থেকে একটি কথা বোধ হয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমার আলোচ্য আন্দোলনগুলি প্রধানত শহরের একটি শ্রেণীকেই আন্দোলিত করেছিল যার সংগে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষ অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না বা তাদের তা স্পর্শ করেনি। এর একটি কারণ হতে পারে এই যে, সেগুলির সংগে কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তির কোন প্রশ্ন জড়িত ছিল না। তা'ছাড়া মধ্যশ্রেণী যারা সমাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং কৃষকদের পথ—দু'টি চলেছিল সমান্তরালভাবে, মিলিত হয়নি কখনও।

তথ্য নির্দেশ

১. M.S.A. Rao, 'Conceptual Problems in the Study of Social Movements', M.S.A. Rao (ed), *Social Movements in India*, vol. I, New Delhi, 1978. p. I.

২. Rudolf Heberle, 'Types and Functions of Social Movements', *IESS*, Vol. XIII & XIV, p. 439.

৩. ঐ।
৪. M.S.A. Rao, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।
৫. Rudolf Heberle, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪০।
৬. M.S.A. Rao, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।
৭. Rudolf Heberle, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪৪।
৮. M. S. A. Rao, 'প্রাগুক্ত গ্রন্থের' ভূমিকা, পৃঃ ১০।
৯. ঐ, পৃঃ ১২। রাও সামাজিক আন্দোলনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন এ ভাবে —যে আন্দোলন, সমাজের একটি সংগঠিত অংশের লক্ষ্য ও আদর্শের ওপর ভিত্তি করে, মোবিলাইজেশনের সাহায্যে সমাজে আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনে তাই সামাজিক আন্দোলন। 'প্রাগুক্ত প্রবন্ধ' পৃঃ ২।
১০. Walter Lacquer, 'Revolution', *IESS*, vol. XIII and XIV, pp. 501-507.
১১. Kalyan Kumar Sengupta, *Recent Writings on the Revolt of 1857 : A Survey*, New Delhi, 1975, p. 8.
১২. Thomas R. Metcalf, *The Aftermath of Revolt : India, 1857-1870*, New Jersey, 1964, p. 57-58.
১৩. কল্যান কুমার সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।
১৪. Surendra Nath Sen, *Eighteen Fifty Seven*, New Delhi, 1957, R. C. Majumdar, *The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857*, Calcutta, 1957 ; P. C. Joshi (ed), *The Rebellion, 1857*, New Delhi, 1957.
১৫. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে সেনের গ্রন্থ দেখুন।
১৬. দেখুন রমেশচন্দ্রের 'প্রাগুক্ত গ্রন্থ'।
১৭. S. B. Chowdhury, *Civil Rebellion in the Indian Mutinies*, Calcutta, 1957, এবং *Theories of the Indian Mutiny*, Calcutta 1965, এ ছাড়া দেখুন লেখকের অপর আরেকটি গ্রন্থ. *English Historical Writings on the Indian Mutiny 1857-59*, Calcutta, 1971.
১৮. পি, সি, যোশী সম্পাদিত গ্রন্থ দেখুন।
১৯. সুকুমার মিত্র, '১৮৫৭ ও বাংলাদেশ', কলকাতা, ১৯৬০, পৃঃ ১।
২০. মেটকাফ, 'প্রাগুক্ত গ্রন্থ', পৃঃ ১১।
২১. Susobhan Sarkar, 'View on 1857', *On the Bengal Renaissance*, Calcutta, 1979, p. 116. প্রমোদ সেনগুপ্ত লিখেছেন, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ছিল 'প্রথম জাতীয় গণ অভ্যুত্থান এবং অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 'প্রথম অপক্ক অভিব্যক্তি।' দেখুন, প্রমোদ সেনগুপ্ত, "ভারতীয় মহাবিদ্রোহ", কলকাতা, ১৮৫৭, পৃঃ ৯। লর্ড ক্যানিং লিখেছিলেন, '. . . যে সংগ্রামের মুখোমুখি আমরা হয়েছিলাম তাকে

আঞ্চলিক অভ্যুত্থান না বলে জাতীয় অভ্যুত্থান বলাই শ্রেয়।' উদ্ধৃত, S. Gopal, *British Policy in India 1858-1905*, Cambridge, 1965. p. 1.

২২. ঐ।

২৩. F. J. Halliday, *Minute by Lt. Governor of Bengal on the Mutineers as they effected the Lower Provinces Under the Government of Bengal*, Calcutta, 1858, p. 71.

২৪. রতনলাল চক্রবর্তী, "সিপাহীযুদ্ধ ও বাংলাদেশ", ঢাকা, ১৯৮৪, পৃঃ ৫৬।

২৫. হ্যালিডে, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫।

২৬. ঐ, পৃঃ ৭৭।

২৭. *Dacca News*, 21-3-1857.

২৮. Hridaynath Majumdar, *Reminiscences of Dacca*, Calcutta, 1926, p. 18.

২৯. Brennand, 'Echoes of the Indian Mutiny at Dacca', *The Dacca Review*, vol v and vi, No. vii and viii, 1915, p. 244.

৩০. *Dacca News*, 2-5-1857.

৩১. ব্রেনাণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৪।

৩২. *Dacca News*, 13.6.1857.

৩৩. ঐ ২০.৬.১৮৫৭।

৩৪. ঐ, ২৭.৬.১৮৫৭।

৩৫. ঐ, ১.৮. ১৮৫৭।

৩৬. হ্যালিডে. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫।

৩৭. ব্রেনাণ্ড, প্রাগুক্ত, ২৬, ১১. ১৮৫৭। পৃঃ ২৪৭।

৩৮. ঐ।

৩৯. ঐ।

৪০. হৃদয়নাথ মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

৪১. ঐ, পৃঃ।

৪২. ঐ, পৃঃ।

৪৩. রেবতী মোহন দাস, "আত্মকথা", কলকাতা, ১৩৪১ (বাংলা), পৃঃ ৬।

৪৪. হ্যালিডে, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫।

৪৫. ব্রেনাণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৮।

৪৬. 'ইংলিশম্যান', ৩.১২.১৮৫৭, উদ্ধৃত, প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, "নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ", কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ৫২।

৪৭. রতনলাল চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬-৮৮।

৪৮. কৃষ্ণকুমার মিত্র, "আত্মচরিত", কলকাতা, ১৩৮১ (বাংলা সাল), পৃঃ ১৭-১৮।

৪৯. কেদারনাথ মজুমদার, "ময়মনসিংহের ইতিহাস", কলকাতা, ১৯০৬, পৃঃ ১৮১।

৫০. Walter Scott Seton-Karr, *A Short Account of Events during the Sepoy Mutiny of 1857-58 in the District of Bengal and of Jessore* (Private Circulation), London, 1894.

৫১. কেদারনাথ মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭।

৫২. *Dacca News*, 25. 4. 1857.

৫৩. হ্যালিডে, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪।

৫৪. ঐ, পৃঃ ৫০।

৫৫. C. E. Buckland, *Bengal under the Lieutenant Governors*, vol. 1, New Delhi, 1976, p.

৫৬. হ্যালিডে, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮১।

৫৭. বাকল্যাণ্ড, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০২৯।

৫৮. সুশোভন সরকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২২।

৫৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্তের প্রাগুক্ত গ্রন্থ। তিনি লিখেছেন, বাঙালীদের অসহযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে 'মাদ্রাজ এথেনিয়াম' লিখেছিল "এখানে সেখানে দু' একজন বাঙালী নেটিভকে দেখা যায় আমাদের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি জানাচ্ছে, কিন্তু আমাদের এই ভয়ানক বিপদের সময় তাদের কেউ কি ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা তাদের অর্থ দিয়ে আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছে? . . .তারা বিপদের ধারে কাছে দিয়েও যায়নি. . ." এ পরিপ্রেক্ষিতে 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' লিখেছিল—'মিঃ নর্টন (এথেনিয়ামের লেখক) যদি ইমপ্রেসমেন্ট আইনের জোরে বাঙলার কোনো গ্রামে যেতেন, তাহলে নিশ্চয়ই দু' একটা ভাঙ্গা গাড়ি ও কানা বলদ যোগাড় করতে পারতেন, কিন্তু কাজে লাগাতে পারে এমন একটাও গাড়ি কিংবা বলদ পেতেন না। এইরূপ অবস্থা বুঝতে পেরে সরকার তার ইমপ্রেসমেন্ট আইন ব্যবহার করেন নি।'. . . পৃঃ ১৫৩।

৬০. ফোর্ট উইলিয়ামের বক্সীর নিকট রংপুরের কালেক্টরের পত্র, ১২. ১২. ১৮৫৭, বাংলাদেশ সচিবালয় রেকর্ডস, রংপুর জেলা, প্রেরিত পত্র, ভল্যুম ৬৬০, পত্র সংখ্যা ৩৯৭, পৃঃ ২১২-২১৩, উদ্ধৃত, রতনলাল চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৯।

৬১. Kalikinkar Datta, *Reflection on the 'Mutiny'*, Calcutta, 1967, p. 74. বাংলা ভাষায় বিখ্যাত সাহিত্যিকরা বিদ্রোহ নিয়ে উপন্যাস না লিখলেও, গৌণ সাহিত্যিকরা লিখেছিলেন বেশ কটি উপন্যাস। এ সব উপন্যাস লেখা হয়েছিল বেশ সতর্কতার সঙ্গে, যাতে সরকার অসন্তুষ্ট না হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কোন কোন গ্রন্থে, বিদ্রোহী নায়কদের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, উপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, তাঁর 'নানাসাহেব' উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৮৩) লিখেছিলেন, '. . .আমার হৃদয়ের সাধ যে আজ ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে, গ্রামে গ্রামে এমনকি শয়নে স্বপনে আলোচিত হইতেছে,

ইহাই আমার আনন্দের বিষয়।' রমেন্দ্র বর্মন, "মহাবিদ্রোহ নিদ্রোহ ও বাংলা উপন্যাস", কলকাতা, ১৩৮৭, পৃঃ ১৩।

৬২. সতীশচন্দ্র মিত্র, "যশোর খুলনার ইতিহাস", দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ৭৮৯।

৬৩. প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, "নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ", কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ১৫৪।

৬৪. Anil Seal, *The Emergence of Indian Nationalism*, Cambridge, 1968, p. 249.

৬৫. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, "আত্মীয় সভার কথা", কলকাতা, ১৩৮১ (বাংলা সন)।

৬৬. বিনয় ঘোষ, "সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র", দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২।

৬৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, "বাংলার ইতিহাস", তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ১৬৮।

৬৮. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আত্মজীবনী", (সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত), কলকাতা, ১৯৬২, পৃঃ ৪৬।

৬৯. ঐ।

৭০. Jogananda Das, 'The Brahmo Samaj', A. C. Gupta (ed), *Studies in the Bengal Renaissance*, Calcutta 1957, p. 487.

৭১. কাজী আবদুল ওদুদ, "বাংলার জাগরণ", কলকাতা, ১৯৫০, পৃঃ ৯০।

৭২. Sivnath Sastri, *History of the Brahmo Samaj*, Calcutta, 1911, pp. 548-550.

৭৩. যোগানন্দ দাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮১।

৭৪. শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৯।

৭৫. ঐ, পৃঃ ৫৪৮-৫৫। ১৮৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মের সংখ্যা ছিল—

জেলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
যশোর	৯	৩	১২
রংপুর	৩	২	৫
ঢাকা	২৬	৮	৩৪
ফরিদপুর	৩	০	৩
বাখরগঞ্জ	৩০	২৬	৫৬
চট্টগ্রাম	২	২	৪
মোট	৭৩	৪১	১১৪

Census 1881, pp, 121-122.

৭৬. বঙ্কবিহারী কর, "পূর্ব বাঙলা ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত", কলকাতা, (প্রকাশ কাল নেই। তবে লেখকের ভূমিকায় তারিখ দেওয়া হয়েছে ১৯৫১), পৃঃ ৪।

হেমলতা সরকার, "স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে পূর্ববঙ্গে শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম্মান্দোলনের আংশিক চিত্র", কলকাতা, ১৯১৫, পৃঃ ২০০।

৭৭. বঙ্কবিহারী কর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।
৭৮. ঐ, পৃঃ ৮-৯।
৭৯. আদিনাথ সেন, "স্বর্গীয় দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ", প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৪৮, পৃঃ ১৩০-১৩২।
৮০. উদ্ধৃত ঐ, পৃঃ ১৩৪-১৩৫।
৮১. ঐ।
৮২. শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৫।
৮৩. বঙ্কবিহারী কর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯-২০।
৮৪. ঐ, পৃঃ ২৫।
৮৫. আদিনাথ সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৮। ব্রাহ্ম স্কুল কালে রূপান্তরিত হয়েছিল বর্তমান জুবিলী স্কুল ও জগন্নাথ কলেজে।
৮৬. বঙ্কবিহারী কর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩-৩৪।
৮৭. হেমলতা সরকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৫। এ ছাড়া বিজয়কৃষ্ণের জীবন ও কার্যাবলীর জন্যে দেখুন, জগবন্ধু মিত্র, "প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী", কলকাতা, ১৯১৪। অমৃতলাল সেনগুপ্ত, "আচার্য্য প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী", কলকাতা, ১৯২৫। অবশ্য এ গ্রন্থটির অধিকাংশই গালগল্পে ভরা। এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, "ব্রাহ্ম সমাজের বর্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্ম সমাজের পরীক্ষিত বিষয়", কলকাতা ৫৬ ব্রাহ্ম সংবর্ত।
৮৮. হেমলতা সরকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭০। অঘোরনাথের জীবনীর জন্যে দেখুন, (লেখকের নাম নেই) "সাধু অঘোরনাথের জীবন চরিত", (প্রকাশকাল ও প্রকাশ স্থানের নাম নেই)।
৮৯. আদিনাথ সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪০।
৯০. ঐ, পৃঃ ১৪৪।
৯১. বঙ্কবিহারী কর, প্রাগুক্ত, ৪৬-৪৭।
৯২. ঐ, পৃঃ ৫৩-৫৪।
৯৩. ঐ, পৃঃ ৫৩-৫৪।
৯৪. হেমলতা সরকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৯। ব্রাহ্মপন্থী ঢাকা প্রকাশের একটি সংখ্যায় লেখা হয়েছিল 'ঈশ্বর ইচ্ছায় ক্রমে ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজে লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে। প্রথম কয়েক মাস গৃহাভ্যন্তরে কণ্টসৃষ্টে লোকের সমাবেশ হইত, কিন্তু এখন গৃহ মধ্যস্থিত বেঞ্চ ও চৌকিতে ও বারাণ্ডার উপবেশন যোগ্য স্থানে স্থান না পাইয়া অনেককে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইতেছে।' সংবাদটি হয়ত খানিকটা অতিরঞ্জিত, কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজ যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি শুরু করেছিল ষাটের দশকের মধ্যভাগে এ তার প্রমাণ।

'ঢাকা প্রকাশ', ৮. ৪. ১৮৬৬ ।

৯৫. মন্দির নির্মাণকালে সমাজের সব সভ্যই সক্রিয়ভাবে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। এ জন্যে তাঁরা বিভিন্ন জায়গা থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেছিলেন, অনেক ক্ষেত্রে দান করেছিলেন নিজেদের একমাসের বেতন। চারশো ও চারশো টাকার ওপর সাহায্য করেছিলেন, ব্রজসুন্দর মিত্র (৬০০), অভয়কুমার দত্ত (৬০০) রামশংকর সেন (৪০০), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৫০০) ও ভগবানচন্দ্র বসু (৪০০)। আদিনাথ সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৮। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন বঙ্কবিহারী কর, 'প্রাগুক্ত গ্রন্থ'।

৯৬. David Kopf, 'The Brahmo Awakening in East Bengal and the Orthodox Hindu Reaction 1866-1872', *Bangladesh Historical Studies*, Vol. II, 1977, p. 148.

৯৭. বঙ্কবিহারী কর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪-৭৫ ।

৯৮. শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৫-২৬ ।

৯৯. গিরিশচন্দ্র সেন, "আত্মজীবনী", কলকাতা, ১৯০৬, পৃঃ ১০৭। বঙ্গচন্দ্রের দলে ছিলেন, কৈলাশচন্দ্র নন্দী, রামপ্রসাদ সেন, গোপীকৃষ্ণ সেন, বৈকুণ্ঠ ঘোষ, দুর্গানাথ রায়, প্রমুখ। মানসী মুখোপাধ্যায়, "অতলচন্দ্র", কলকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ৯-১০। আর অন্য দলে ছিলেন, বিজয়কৃষ্ণ, গোস্বামী, কালীনারায়ণ গুপ্ত, রজনীকান্ত ঘোষ, প্রসন্নকুমার মজুমদার, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ঐ, এ ছাড়া দেখুন, বঙ্কবিহারী করের 'প্রাগুক্ত গ্রন্থ'।

১০০. গিরিশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭-১০৮ ।

১০১. শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৭ ।

১০২. শ্রীনাথ চন্দ, "ব্রাহ্ম সমাজে চল্লিশ বৎসর", ময়মনসিংহ, ১৯১৩, পৃঃ ২৪ ।

১০৩. ঐ, পৃঃ ২৫ ।

১০৪. শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৫ ।

১০৫. শ্রীনাথ চন্দ, পৃঃ ৩২ ।

১০৬. ঐ।

১০৭. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'প্রাগুক্ত গ্রন্থ' ।

১০৮. শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৯ ।

১০৯. শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫০ ।

১১০. শ্রীনাথ চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৭ ।

১১১. শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৭ ।

১১২. (লেখকের নাম নেই) "বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস", (প্রকাশস্থলের নাম নেই), ১৩৩৪, পৃঃ ৪ ।

১১৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬০-৬১ ।

১১৪. ঐ।

১১৫ বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজ ও গিরিশচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে দেখুন, ভবরঞ্জন

মজুমদার, 'আচার্য্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার', কলকাতা, ১৯১৩।

১১৬. শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, ৩৬৪।

১১৭. এখানে প্রধান প্রধান সমাজগুলির কথা উল্লেখ করা হল মাত্র। এ ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে ছোটখাটো সমাজ গড়ে উঠেছিল যার বিস্তৃত তালিকা প্রণয়ন করা হয়নি। শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ৫৪৮-৫৬০।

১১৮. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, প্রমোদ কিশোর সরকার, 'মহর্ষি ভুবন-মোহন', ঢাকা, ১৯২৩। উত্তরাঞ্চলে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের বিবরণের জন্যে দেখুন, বঙ্কবিহারী কর, 'ব্রহ্মপিতচিত্ত স্বর্গীয় নবদ্বীপ চন্দ্র দাসের জীবন বৃত্তান্ত', ঢাকা, ১৯৩৩।

১১৯. 'বরুণ দে' পূর্বোক্ত', পৃঃ XXI.

১২০. যোগানন্দ দাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮২।

১২১. বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১।

১২২. ডেভিড কফ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১।

১২৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯২।

১২৪. বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২।

১২৫. হেমলতা সরকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৯।

১২৬. শিবনাথ শাস্ত্রীর 'পূর্বোক্ত', গ্রন্থ থেকে তালিকা।

১২৭. J. N. Gupta, *Bogra* (District Gazetteers of Eastern Bengal and Assam), Allahabad, 1910, p. 32.

১২৮. বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২।

১২৯. "বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস", (প্রকাশকাল ও স্থানের তারিখ নেই)।

১৩০. "পূর্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজের ১২৮৯ সালের বার্ষিক কার্য বিবরণ", ঢাকা, ১২৯০।

১৩১. ১৮৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম সংখ্যা ছিল মোট ১১৪ জন, এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৩ জন।

১৩২. Jame Wise, *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengali*, London 1883, p. 36.

১৩৩. 'যখন স্টীমার একটা ক্ষুদ্র খাল দিয়া যাইত, তখন বহুদূর হইতে সমবেত নরনারী হুলুধ্বনি করিয়া শঙ্খ, কাংসাঘন্টা বাজাইত, এবং স্টীমারকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিয়া ভূতলে প্রণত হইয়া থাকিত।. . .পূর্বে স্টীমার দর্শক যাত্রীর ও তাহাদের পূজকের ভয়ানক ভীড় হইত, এবং অনেকে তাহাকে টাকা দিয়া স্টীমারখানি থামাইতে, কি ধীরে চালাইতে অনুনয় বিনয় করিত।' নবীনচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৩।

১৩৪. আদিনাথ সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৫।

১৩৫. ডেভিড কফ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১।

১৩৬. বৈকুন্ঠনাথ ঘোষ, "আমার জীবন কথা", কলকাতা, ১৩৩০, পৃঃ ১২।
১৩৭. ঐ, পৃঃ ৩৬।
১৩৮. ঐ, পৃঃ ৩।
১৩৯. বঙ্কবিহারী কর, 'পূর্ব বাঙলো ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত', পৃঃ ৭৩।
১৪০. আদিনাথ সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩।
১৪১. হেমলতা সরকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৭।
১৪২. সুদক্ষিণা সেন, "জীবনস্মৃতি", (প্রকাশকাল নেই), কলকাতা, পৃঃ ২৬-২৭।
১৪৩. হরসুন্দরী দত্ত, "স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের জীবন কথা", কলকাতা, ১৯২২, পৃঃ ১৪৫।
১৪৪. বঙ্কবিহারী কর, "পূর্ব বাঙলা ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত", পৃঃ ৫৭। কালীনারায়ণের জীবনীর জন্যে দেখুন একই লেখকের; "ভক্ত কালীনারায়ণগুপ্তের জীবন বৃত্তান্ত", কলকাতা, ১৯২০।
১৪৫. বৈকুন্ঠনাথ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯-১০।
১৪৬. গিরীশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮।
১৪৭. শ্রীনাথ চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।
১৪৮. বৈকুন্ঠনাথ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।
১৪৯. ঐ।
১৫০. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, দুর্গামোহন দাস, "জীবনালেখ্য", (প্রকাশকাল ও স্থানের নাম নেই)।
১৫১. সংশোধিনী, ১৮. ৪. ১৮৮৪, *RNP*, নং, ১৮, ১৮৮৪ এবং একই পত্রিকার ৬.১২.১৮৮৪ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, নং ৫১, ১৮৮৪।
১৫২. (লেখকের নাম নেই) "নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়"। কলকাতা, ১৯২২, পৃঃ ৬০-৬১। নিশিকান্তর চিঠি থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দেওয়া হল এখানে—(১৮৬১) '. . .I am a rich zemindar, living in a two storied building, which I can call my own : you are a poor houseless wonderer-seeking a place to lie on—denied by the world even a home—we had been born of the same parents : loved and petted equally—you rather more. Why then wonder houseless and live in a grand building . . .' লেখকের নাম নেই), "ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী", ঢাকা, ১৯০২।
১৫৩. শ্রীনাথ চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮৭ ও বৈকুন্ঠনাথ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।
১৫৪. "সোমপ্রকাশ", ৩০. ৬. ১৮৬৮।
১৫৫. বঙ্কবিহারী কর, "পূব বাঙলা ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত", পৃঃ ৩৫।
১৫৬. বঙ্কবিহারী কর, "মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত", ঢাকা ১৩১৭ (বাংলা সন), পৃঃ ১০২-১০৩। বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

১৫৭. শ্রীনাথ চন্দ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮০।

১৫৮. A. L. Clay, *Principal Heads of History and Statistics of Dacca Division*, Calcutta, 1868, p. 139.

১৫৯. বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮।

১৬০. শ্রীনাথ চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩।

১৬১. ঐ পৃঃ ১০৫।

১৬২. অমরচন্দ্র দত্ত, "শরচ্চন্দ্র", ময়মনসিংহ, ১৯১০, পৃঃ ৯।

১৬৩. জালাল উদ্দিন সম্পর্কে খুব বেশী একটা জানা যায়নি তথ্যের অভাবে। একটি ভাষ্যে জানা যায়, তাঁর বাড়ী ছিল জলপাইগুড়িতে। তারপর হয়ত তিনি ঢাকায় চলে এসেছিলেন এবং ব্রাহ্মদের আশ্রয়ে থেকে পড়াশোনা করেছিলেন এবং পরে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ১২৮১ সনে ব্রাহ্মদের স্থাপিত 'যুবতী বিদ্যালয়ের ছাত্রী প্যারী বিবির' সংগে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। দেখুন, বঙ্কবিহারী কর, "ব্রহ্মসিত চিত্ত স্বর্গীয় নবদ্বীপ চন্দ্র দাসের জীবন বৃত্তান্ত". পৃঃ ১০ ও একই লেখকের, "পূর্ব বাংলা ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত", পৃঃ ১০৭।

১৬৪. জালাল উদ্দিন ছাড়াও পূর্ববঙ্গে আরেকজন ব্রাহ্মের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে, যিনি ছিলেন মুসলমান (অবশ্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষের ভাষ্য যদি সত্য হয়)। ১৮৭২ সালে, গ্রামবার্তা প্রকাশিকায় কুষ্টিয়া থেকে "আ-জি" ছদ্মনামে এক মুসলমান যুবক চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং নিজ সম্প্রদায় থেকে অত্যাচারের আশংকা করছেন। 'পাবনা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিশচন্দ্র তলাপাত্র মহোদয় সমীপে নিবেদন যে তিনি যদি এ নরাধমকে তাঁহার সমাজে আশ্রয় প্রদান করেন, তাহলে ভালো। কিন্তু 'ব্রাহ্মভায়ারা যদি আবার যবনকে অস্পর্শীয় বলিয়া তাড়াইয়া দেন তাহা হইলে আরো বিপদ।' এ ব্যাপারে আর কোথাও কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। সুতরাং ঘটনাটি সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু উল্লেখ করা যাচ্ছে না। "গ্রামবার্তা প্রকাশিকা", তৃতীয় সপ্তাহ, ১৮৭২।

১৬৫. মানসী মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

১৬৬. আদিনাথ সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১।

১৬৭. বঙ্কবিহারী কর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭।

১৬৮. শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৭।

১৬৯. ঐ, পৃঃ ৩৭৪।

১৭০. "ঢাকা প্রকাশ", ২৮. ৩. ১৮৬৯।

১৭১. David Kopf, 'The Brahmo Idea of Social Reform and the Problem of Female Emancipation in Bengal',—John, N. Mclane (ed), *Bengal in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, Michigan, 1975, p. 42.

১৭২. শ্রীনাথ চন্দ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬০ ও ১০৮।

১৭৩. হেমলতা সরকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪।

১৭৪. কালীপ্রসন্ন ঘোষ, "নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব", কলকাতা, ১৯২৬ (সংবৎ), পৃঃ ৬৬।

১৭৫. শ্রীনাথ চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫।

১৭৬. "নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়", পৃঃ ৮৪। এ প্রসঙ্গে লণ্ডনে এক সভায় মিস কার্পেন্টার বলেছিলেন, "I proceeded to Dacca, where I had reason to know that a great work was going on. Here on adult school has been established which was attended by a number of the wives of native gentlemen anxious to advance the cause of female education. No other school of the same kind exists in India, but at Dacca as in other places, there is a great want of trained female teachers. . .' Dacca Gazette, 14. 8. 1876, উদ্ধৃত, আদিনাথ সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৫-১৪৬।

১৭৭. Usha Chakraborty, *Condition of Bengali Women*, Calcutta, 1963, p. 120.

১৭৮. শ্রীনাথ চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪-১১৫।

১৭৯. "বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস", পৃঃ ১১-১২। এ প্রসংগে বাংলার তৎকালীন লেঃ গভর্ণর সিসিল বিডন, বাখরগঞ্জের কালেক্টারকে এক চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে তিনি রাখালচন্দ্রের প্রশংসা করে কালেক্টারকে লিখেছেন, অবরোধ ভাঙ্গার ব্যাপারে রাজকর্মচারীরা যেন সহানুভূতি ও উৎসাহ দেখায় এবং তাদের স্ত্রীদের সংগে যেন লাখুটিয়ার জমিদার বাড়ীর মহিলাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।—'. . .I have had the pleasure of being introduced to the ladies of Harendra Krishnas family in Calcutta, but the instance you gave in the first I heard of. . .I beg you will be so good as to tell the zemindars and their ladies that I highly respect the feeling which has led them to throw off their ancient and deeply rooted prejudices and to take a step of such political importance in the way of social reform. (লেখকের নাম নেই) *A Short Sketch of the Lakhutia Roy Family*, Calcutta, 1896, p. 15.

১৮০. "নবকান্ত, চট্টোপাধ্যায়", পৃঃ ৯১-৯৭।

১৮১. আদিনাথ সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৬।

১৮২. "নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়", পৃঃ ১০৪ ১০৫। দেখুন এ প্রসংগে সমসাময়িক একটি পুস্তিকা (লেখকের নাম নেই) "লক্ষ্মীমণিচরিত", ঢাকা, ১৮৭৭।

১৮৩. বিজয়কৃষ্ণ এ পরিপ্রেক্ষিতে সোমপ্রকাশে লিখেছিলেন—' . . 'মনে করুন, বেশ্যাদিগকে উপদেশ দেওয়াতে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অসৎপথ পরিত্যাগ করিল। কিন্তু মানব প্রবৃত্তি অনুসারে তাহারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য? বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশের অবস্থা দর্শন করুন। কত শত লম্পট পুরুষ অনায়াসে বিবাহ করিতেছে, হয়তো বিবাহ করিয়াও ব্যভিচার করিতেছে তাহাতে আপনারা সম্মত আছেন (আমি নই) তবে বেশ্যারা বিশুদ্ধ হইলেও তাহাদের বিবাহ হইবে না তাহার কারণ কি?'. . . বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, "সোমপ্রকাশ", ৯. ৯. ১৮৬৭।

১৮৪. ব্রাহ্মরা যখন মহিলাদের মুক্তির আন্দোলন করছে তখন রক্ষণশীল সমাজ তাদের দেখেছে কি চোখে? ঢাকার জনৈক পূর্ণচন্দ্র সরকারের জবানীতে দেখা যাক—'আজ কালের মেয়েরাও বেশ সুসভ্য হয়ে উঠেছেন। লিখতে, পড়তে, কার্পেট বুনতে, আলাপ সালাপ কত্তে, সর্বকর্ম্মে তাঁরা বিশারদ। সেকেলে অসভ্য মেয়েদের মত রান্না করে শরীর কালো করা কি সর্বদা ঘোমটায় বদন লুকায়ে রাখা কখনও তারা লাইক করেন না। আর কেনই বা করবেন? ঐ সব ডার্টি বেশে থাকা কিছু সভ্যতার লক্ষণ নয়।. . .বস্তুত এখনকার মেয়েদের অর্থাৎ স্বর্গীয় দেবী বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।' পূর্ণচন্দ্র সরকার, "হাল আমলের সভ্যতা", ঢাকা ১৮৮৫, পৃঃ ২৬-২৭।

১৮৫. "নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়", পৃঃ ৮৩।

১৮৬. শ্রীনাথ চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩২।

১৮৭. রক্ষণশীলদের মতে কিন্তু, তরুণ ব্রাহ্মরা পছন্দ করত 'স্ট্রং ব্রাণ্ডি ইম্বৎ রেডি'। তারা কথা বলত আধা ইংরেজী আধা হিন্দী ও আধা বাংলায় এবং তারা যে নব্য একথা প্রমাণের জন্যে ভাগিয়ে নিত একে অপরের স্ত্রী। পূর্ণচন্দ্র সরকার, "প্রাগুক্ত গ্রন্থ"।

১৮৮. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, প্রকাশচন্দ্র রায়, "অঘোর প্রকাশ", কলকাতা, ১৯০৭।

১৮৯. শ্রীনাথ চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২।

১৯০. এ প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজের কর্মী নবদ্বীপ চন্দ্র দাস লিখেছিলেন, 'উত্তর বাঙ্গালার কোন স্থলে প্রচার উদ্দেশ্যে গমন করিলে নানা স্থানের ব্রাহ্মগণ তথায় আসিয়া একত্র হইতেন। রংপুর গেলে জলপাইগুড়ি দিনাজপুর প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানের ব্রাহ্মগণও আসিতেন। তখন সকলের উৎসাহ ও অনুরাগ মিলিয়া এক অপূর্ব ভাবের উদয় হইত। প্রতিদিন উপাসনা আলোচনায় মহোৎসবে দিন কাটিত।. . .ব্রাহ্মগণের মধ্যে তেমন উৎসাহ এবং প্রচারকগণের সমাগমে নানাস্থানের ব্রাহ্মগণের তেমন আগ্রহ আর দেখিনা।. . . এই উৎসাহ এবং অনুরাগ ভিন্ন ব্রাহ্ম জীবনের কোন গৌরব নাই।' বঙ্কবিহারী কর, "ব্রাহ্মপিত চিত্ত স্বর্গীয় নবদ্বীপচন্দ্র দাসের জীবন বৃত্তান্ত", পৃঃ ২৭।

১৯১. গোপাল হালদার, "ভাঙ্গনীকূল", ঢাকা. ১৯৭৬ পৃঃ ৫৫।

১৯২. গোপাল হালদার, "স্রোতের দীপ", ঢাকা, ১৯৭৬. পৃঃ ৩৫।

১৯৩. (লেখকের নাম নেই) "বামা চরিত", ঢাকা, ১৩০০, পৃঃ ৪৬।

১৯৪. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, গুরুচরণ মহলানবীশ, "আত্মকথা"। গুরুচরণ তাঁর আত্মকথায় এ বিষয়ে নতুন তথ্য দিয়েছেন। আরো দেখুন, "বঙ্গবন্ধু", ১. ৬. ১৮৮৮।

১৯৫. সত্যেন সেন, "শহরের ইতিকথা", ঢাকা, ১৯৭৪, পৃঃ ৯।

১৯৬. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে, মুনতাসীর মামুন, "উনিশ শতকের ঢাকার থিয়েটার", ঢাকা, ১৯৭৯।

১৯৭. "নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়", পৃঃ ৯৫।

১৯৮. ঐ. পৃঃ ৫৯।

১৯৯. বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন, ব্রাহ্ম সমাজের নেতারা, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র—তাঁদের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতের স্বরাজ বা স্বাধীনতা আন্দোলনে সহায়তা করেছেন—'It was Brahmo Samaj that first tried to set the individual free from the bonds of scriptural authority and Social and socerdotal laws, institutions and traditions. And our wider political freedom movement has been really built, unconsciously to the vast majority of the new builders, upon those intellectual and ethical foundation. Bipin Chandra Pal, *Brahmo Samaj and the Battle of Swaraj in India*, Calcutta, 1926, p. 5.

২০০. পারিবারিক জীবন বা জীবন যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে ব্রাহ্মদের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল তা বোঝা যাবে সমসাময়িক কিছু সাহিত্যকর্ম পড়লে। এমনি একটি উপন্যাসের নায়ক ছিলেন ব্রাহ্ম চাকুরিজীবী বিপিনবাবু। স্ত্রী ছাড়া ছিল বিপিনবাবুর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। প্রতিদিন সকালে উঠে তারা ব্রাহ্মোপসনা করতেন। তারপর ব্যায়াম। নাস্তার পর বিপিনবাবু ছেলেমেয়েদের পড়াতে বসতেন। স্নানের এক ঘন্টা পূর্বে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। তারপর অফিস। বিকেলে নাস্তার পর ছেলেমেয়েরা বিপিনবাবুকে নানারকম গল্প কবিতা শোনাত। রাত্রীকালীন আহারের পর 'সকলে মিলিয়া প্রাঙ্গনে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতেন।. . .জড়তার প্রশ্রয়কারী তাস, পাশা, দাবা, তাঁহাদিগের বাড়ীর ত্রিসীমানায় পদার্পণ করিতে পারিতে না'। (পৃঃ ৭)।

রাতে, প্রায়ই বিনোদিনী (বিপিনবাবুর স্ত্রী) 'ছেলেমেয়েদের কাছে ঈশ্বরের করুণা, তাঁহার জ্ঞান ও অনন্তশক্তির বিষয় কীর্তন করিয়া তাঁহার প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে যত্নবতী হইতেন।. . .স্বামী স্ত্রী প্রত্যহ শয়নের পূর্বে অন্ততঃ এক ঘন্টা একত্র উপবেশন করিয়া পরম ব্রহ্ম নামে

যোগে ব্রাহ্ম ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন।' (পৃঃ ৮) দেখুন, (লেখকের নাম নেই), "আদর্শ পরিবার", ঢাকা, ১৮৯৪।

২০১. John R. Mclane, 'Bengals Pre-1905 Congress Leadership and Hindu Society', Barbara Thomas and Spencer Lavan (eds), *West Bengal and Bangladesh : Perspective from 1872*, Michigan, 1972, p. 86.

২০২. 'The Age of Consent Act, 10 March 1891. An act to amend the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure, 1892. Whereas it is expedient to amend the Indian Penal Code of Criminal Procedure, 1882 ; It is hereby enacted as follows :

Indian Penal Code

1. In section 375 of the Indian Penal Code, in the class marked fifthly and in the Exception, the word 'twelve' shall be substituted for the word 'ten'.

Code of Criminal Procedure, 1882

2. After section 560 of the offence of Criminal Procedure, 1882, the following shall be added, namely : '561. (1) Notwithstanding anything in this code, no Magistrate except a chief Presidency Magistrate or District Magistrate shall (a) take cognigance of the offence of rape where the sexual intercourse was by a man with his wife, or (b) Committing the man for the offence ; (2) And, not withstanding anything in this code, if a chief Presidency Magistrate or District Magistrate deems it necessary direct to an investigation by a Police officer with respect to such an offence as is referred to in a sub section (i) of this section, no police officer of a rank below that of Police Inspector shall be employed either to make, or to take part in the investigation.'

3. In Schedule II to the said Code, for the entry respecting section 376 of the Indian Penal Code, the following shall be substituted, namely :

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
	Rape-If the sexual intercourse was by a man with his own wife.	Shall not arrest Without warrant	Summons
	In any other case	May arrest without Warrent	Warrent

Column 5	Column 6	Column 7	Column 8
Rape bailable	Not Compoundable	Transportation for life, or imprisonment of either description for 10 years and fine	Court of session
Not bailable	Ditto	Ditto	Ditto

উদ্ধৃত,

C. H. Philips (ed) *Select Documents on the History of India and Pakistan and Ceylon*, vol. IV, Oxford (U. K.), 1962 pp 740-741.

২০৩. Thomas R. Metcalf, *The Aftermath of Revolt, India 1857-1870*, New Jersey, 1964, p. 1.

২০৪. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, Erice Stokes, *The English Utilitarians and India.* Oxford, 1959.

২০৫. মেটকাফ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

২০৬. ঐ, পৃঃ ৯।

২০৭. ঐ, পৃঃ ১৮।

২০৮. স্টোকস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬ (ভূমিকা)।

২০৯. ঐ, পৃঃ ১৪৮।

২১০. মেটকাফ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭।

২১১. ফিলিপস, প্রাগুক্ত, ৭৩৫।

২১২. ঐ।

২১৩. মেটকাফ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬।

২১৪. Stanely A. Walpert, *Tillk and Gokhale, Revolution and Reform in the Making of India,* California, 1962, pp. 45-46.

২১৫. Amiya Prasad Sen, *Hindu Revivalism in late Nineteenth*

Century Bengal (Unpublished Ph. D. thesis), Delhi University, 1980, p. 166.

২১৬. মেটকাফ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪।

২১৭. Tilak Privat Correspondence, quoted in stantey A. Wolpert, *op. cit*. pp. 52-54.

২১৮. *RNP*, 27.12.1890.

২১৯. *RNP*, 14.3.1891.

২২০. "ঢাকা প্রকাশ," ৩০ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা।

২২১. "ঐ", ৩১ বর্ষ, ৫ সংখ্যা।

২২২. "ঐ," ৩১ বর্ষ, ৯ সংখ্যা।

২২৩. "ঐ," ৩০ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা।

২২৪. "ঐ"।

২২৫. শ্রীহট্ট দর্পন, ১২.১.১৮৯১. "RNP" নং ৪, ১৮৯১।

২২৬. শক্তি, ১৩.১.১৮৯১, "ঐ"।

২২৭. "ঢাকা প্রকাশ." ৩০ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা।

২২৮. মেয়ে কর্তৃক লিখিত, "আইন !! আইন !! আইন !!!" ঢাকা, ১৮৯০, পৃঃ ১০। (ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ক্যাটালগে লেখিকার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, ইন্দুনীভূষণ দেবী বলে)

২২৯. "ঢাকা প্রকাশ. ৩০ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা।

২৩০. ইন্দুনীভূষণ দেবী, "প্রাগুক্ত," পৃঃ ৯।

২৩১. "ঢাকা প্রকাশ," ৩১ বর্ষ ২ সংখ্যা।

২৩২. "ঐ," ৩১ বর্ষ, ৪ সংখ্যা।

২৩৩. অমিয় প্রসাদ সেন, "প্রাগুক্ত," পরিশিষ্ট ক।

২৩৪. ইন্ডিয়ান মিরর, ২৭.২.১৮৯১, উদ্ধৃত, অমিয়প্রসাদ সেন, "ঐ" পৃঃ ১৮৪।

২৩৫. ঢাকা গেজেট, ১৯ ১.১৮৯১, *RNP* নং ৪, ১৮৯১।

২৩৬. "ঢাকা প্রকাশ," ৩০ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা।

২৩৭. "ঐ," ৩০ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা।

২৩৮. *Bengal Times*, 11.2.1891.

২৩৯. "ঐ"।

২৪০. "ঢাকা প্রকাশ," ৩০ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা।

২৪১. ইন্দুনীভূষণ দেবী, 'প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।

২৪২. "ঢাকা প্রকাশ," ৩১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা।

২৪৩. "ঐ," ৩১ বর্ষ, ৪ সংখ্যা।

২৪৪. অমিয় প্রসাদ সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৮।

২৪৫. স্যার সৈয়দ আহমদকে লেখা কেম্পের চিঠি—

Bengal Times Office
Dacca, 24th Sept. 1888

The Hon. Sir Seyed Ahmed Khan K.C.S.I
Allyghur
Dear Sir,

It is proposed to hold a public meeting of Muhammadans on Sunday next at the Northbrook Hall if practicable, when resolutions will very likely to be passed to propose affiliation to the National Patriotic Association. As an old and staunch supporter of Muhammadan interests, I deem it right to inform you of this, It would be an encouragement if you wire approval as there is no time for a reply and I couldn't wire earlier as no day had been fixed, With best Wishes.

Yours truly
E.C. Kemp.

P.S. I sent you a copy of my paper of the 19th. Pray pardon a slip in omitting in the prefix, Honble, I was much troubled and worried. Hossainur Rahman, *Hindu-Muslim Relations in Bengal (1905-47)*, Bombay, 1974, p. 115 (Appendix).

২৪৬. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন Richard Paul Cronin, *British Policy and Administration in Bengal. 1905-1912*. Calcutta, 1977. এবং বঙ্গভঙ্গের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত) "বঙ্গভঙ্গ," ঢাকা, ১৯৮৯।

২৪৭. উদ্ধৃত হয়েছে, Ghulam Murshid, 'Co-existence in a Plural Society under Colonial Rule : Hindu-Muslim Relations in Bengal 1757-1912, '*The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol. I, Rajshahi, 1976, p. 313.

২৪৮. J.H. Broomfield, *Elite Conftict in a Plural Society*, Berkeley, 1966, p. 27.

২৪৯. "ঢাকা প্রকাশ", ২০.১২.১৯০৩।

২৫০. ঐ, ২৭.১২.১৯০৩।

২৫১. ঐ। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন ধানকোরার জমিদার হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, বক্তৃতা দিয়েছিলেন রায় কালী প্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর যিনি এক-সময় ব্রাহ্ম আন্দোলনেরও নেতা ছিলেন এবং উকিল আনন্দ চন্দ্র রায়। শেষোক্ত দু'জন ছিলেন পূর্ববঙ্গে বাংলা বিভাগ প্রস্তাবের প্রতিবাদ আন্দো-

লনের অগ্রণী নেতা।

২৫২. ১৮৭৬ সালে শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল ভারত সভা। পরে এর অনুকরণে এ ধরনের সভার উৎপত্তি হয়েছিল বিভিন্ন অঞ্চলে। পূর্ব-বঙ্গের ঢাকা ও বরিশালে এ ধরনের সভার নাম দেওয়া হয়েছিল 'জনসাধারণ সভা'। উকিলরা ছিলেন প্রধানতঃ এ সভার উদ্যোগী। "নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়", পৃঃ ৯০।

২৫৩. "ঢাকা প্রকাশ," ১০.১.১৯০৪।

২৫৪. ঐ, ৩১.১.১৯০৪।

২৫৫. ঐ। এই সময় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রচার পুস্তিকায়ও মোটামুটি এ যুক্তি-গুলিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হয়েছে। ঢাকা এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত এ ধরনের দু'টি পুস্তিকা—(লেখকের নাম নেই), *The Partition of Bengal : An Open Letter to Lord Curzon,* Dacca, 1904 ; and C.N. Basu, *The Partition Agitation Explained,* Calcutta, 1906.

২৫৬. Letter from W.C. Mcpherson, Officiating Chief Secretary to the Government of Bengal to the Secretary to the Government of India. Home Department, 6.4. 1904, *Further Papers Relating to the Reconstruction of the Provinces of Bengal and Assam,* London 1905, p. 60. (এরপর উল্লিখিত হবে *FPRPBA* নামে)

২৫৭. "ঢাকা প্রকাশ," ৩১.১.১৯০৪।

২৫৮. ঐ।

২৫৯. ঐ।

২৬০. ঐ, ৭.২.১৯০৪।

২৬১. ঐ, ১৪.২.১৯০৪।

২৬২. ঐ।

২৬৩. *FPRPBA* পৃঃ ৯৩-১০৪।

২৬৪. "ঢাকা প্রকাশ," ২৪.১.১৯০৪।

২৬৫. ঐ। ৩ মাঘ, ১৩০০ (বাংলা সন)।

২৬৬. *FPRPBA* পৃঃ ১১৩-১১৭।

২৬৭. ঐ, পৃঃ ৪৪-৪৬।

২৬৮. ঐ, পৃঃ ১১৮-১১৯।

২৬৯. শরৎকুমার রায়, "মহাত্মা অশ্বিনীকুমার," কলকাতা, ১৩৬৪, পৃঃ ১৬৯।

২৭০. "ঢাকা প্রকাশ," ২৮.২.১৯০৪।

২৭১. বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করার কারণ জানিয়ে সলিমুল্লাহ, বৃটিশ পার্লামেন্টারী দলের নেতা কীয়ের হাড়িকে ৩০ অক্টোবর ১৯০৭ সালে লিখেছিলেন—

"...We support the partition because it is without the least doubt beneficial to our cause—it has limited the Muhammadans in one vast body and has in consequence brought us some prominence—under it, our interest will be more carefully looked after—it has given us an impetus to social and political advancements of the districts, departed and placed under a district administration, which failed under the old systems to attract the amount of attention to local needs, commensurate with their importance." M.K.U. Molla, 'Keir Hardie and the First Partition of Bengal,' *Rajshahi University Studies*, Vol. III, January 1970, Appendix B, p. 108.

২৭২. Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal*, New Delhi, 1973, p. 425. ঢাকার সংবাদপত্র "ঢাকা প্রকাশ" থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। পত্রিকাটি ঐ সময় ছিল হিন্দু মালিকানাধীন এবং অনেকক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকও বটে। কিন্তু বিচারপতি আমীর আলী যখন পদত্যাগ করেছিলেন তখন পত্রিকাটি লিখেছিল তারা মনে করেছিল আমীর আলীর বদলে আরেকজন 'মুসলমান ভ্রাতা'কে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখবে। কিন্তু তা'হল না। কারণ 'বড়ই পরিতাপের বিষয়, লর্ড কার্জনের আমলে এই বিগর্হিত নীতি অনুসৃত হইতেছে বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। আমরা এখনও বলি, গভর্ণমেন্ট এই নীতি পরিত্যাগ করিয়া ন্যায্যের মর্যাদা রক্ষা করুন, ন্যায় নিশ্চয় ব্রিটিশ রাজত্বে গৌরব স্তম্ভ এবং এ নিমিত্তই ব্রিটিশ সম্রাট সর্বত্র পূজিত।' (৩.৪.১৯০৪) এখানে দেখা যাচ্ছে, যদিও প্রথমে মুসলমানদের প্রতি ন্যায় বিচারের কথা বলা হয়েছে কিন্তু ক্ষোভটা প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গভঙ্গের প্রতি।

২৭৩. আনিসুজ্জামান, 'মেহেরুল্লহে ও জমিরুদ্দীন', "সাহিত্য পত্রিকা," ৪ বর্ষ, ২ সংখ্যা, শীত ১৩৬৭, পৃঃ ৮৯।

২৭৪. "ঢাকা প্রকাশ," ২৮.৮.১৯০৪।

২৭৫. গিরিশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯-১২০। এখানে অবশ্য একটি কথা উল্লেখ্য। গিরিশচন্দ্র ছিলেন নববিধান (ব্রাহ্ম) সমাজের অন্তর্গত। এবং তাঁর মতে, 'নববিধানের মূলমতের অন্তর্গত রাজভক্তি একটি মত'। রাজভক্তিকে ভিত্তি করে গিরিশচন্দ্র বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন পূর্ববঙ্গবাসী হিসেবে তিনি যে বিভাগকে মেনে নিয়েছিলেন তা স্পষ্ট।

২৭৬. ঐ পৃঃ ১৩১। এ প্রসঙ্গে একটি সভার কথা উল্লেখ্য। বাখরগঞ্জে আরাকান্দিতে জমিদার রাজেন্দ্র নাথ মণ্ডলের সভাপতিত্বে নমশূদ্রদের একটি সভা

অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারা বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, মুসলমানদের যেসব অধিকার আছে নমশূদ্রদের সেগুলি দেওয়া হোক কারণ উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অত্যন্ত নিপীড়ন চালায় তাদের ওপর এবং তাদের থেকে মুসলমানরা নমশূদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল। উচ্চবর্ণদের সরকার বিরোধী আন্দোলনে তারা নেই। মুসলমান ভাইদের সংগে হাতে হাত মিলিয়ে তারা কাজ করবে। 'দি টাইমস', ১০.১০.১৯০৬, উদ্ধৃত সুফিয়া আহমদ। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৭। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণের জন্যে আরো দেখুন, Bandyopadhyay, S. *Caste and Politics in Eastern Bengal: The Namasudras and the Anti-Partition Agitation, 1905-1911*, (mimeo) Centre for South East Asian Studies, Calcutta University, 1981.

২৭৭. ক্রনিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৬।

২৭৮. তৎকালীন পূর্ববঙ্গের কয়েকজন ব্রাহ্ম কর্মীর সন্তানদের নাম করা যেতে পারে যারা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যশস্বী হয়েছিলেন। যেমন—

পিতা	পুত্র/কন্যা
রামলোচন ঘোষ	মনোমোহন ঘোষ
ভগবানচন্দ্র বসু	জগদীশচন্দ্র বসু
রামপ্রসাদ সেন	অতুল প্রসাদ সেন
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	সরোজনী নাইডু
কালীনারায়ন গুপ্ত	স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত
উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	সুকুমার রায়

২৭৯. স্টোকস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬ (ভূমিকা)।

২৮০. ফরায়েযী আন্দোলনের ওপর (ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা) বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দেখুন—Muin Uddin Ahmed Khan, *History of the Fariadi Movement in Bengal*, Karachi, 1965 এবং Azizur Rahman Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal* (1757-1856), Dacca, 1961, pp. 66-91.

২৮১. অমলেন্দু দে, "বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ," কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ১২৩-১৩১।

২৮২. প্রমোদ সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩।

চতুর্থ অধ্যায়

জনমত ঃ সংবাদপত্র ও সভাসমিতির উদ্ভব ও বিকাশ

তৃতীয় অধ্যায়ে আমি বিভিন্ন আন্দোলনের কয়েকটি টাইপোলজী তৈরী করেছি। এ উপস্থাপনা আন্দোলনগুলির দু'টি দিক স্পষ্ট করে তুলেছে—

ক. আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা এবং

খ. সীমাবদ্ধতার সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শগত পরিপ্রেক্ষিত।

এ দু'টি সূচক আরো তুলে ধরে আন্দোলনগুলি প্রধানত যে শ্রেণীর সাহায্য, সমর্থন ও মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে সে শ্রেণীর বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী। আমাদের আলোচনার জন্যে এ দৃষ্টিভঙ্গী গুরুত্বপূর্ণ। এটিকে বোঝার জন্যে আমি যে আয়তন ব্যবহার করবো তা'হচ্ছে শ্রেণী ও ব্যক্তির মধ্যেকার সম্পর্ক, ব্যক্তির গতিশীলতা এবং তার কারণ। সেক্ষেত্রে বোঝার চেষ্টা করবো—

ক. যে পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গে মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে সে পরিপ্রক্ষিতে ঔপনিবেশিক অবস্থানের মধ্যে সম্প্রদায়গত ভিন্নতা ও বিরোধ (হিন্দু-মুসলমান)

খ. এই সম্প্রদায়গত বিরোধ ও ভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যশ্রেণীর ও ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে সম্পর্ক। এই সম্পর্ক ব্যক্তির সম্প্রদায়গত ও শ্রেণীগত অবস্থানের মধ্যে বৈপরীত্য, সহমর্মিতা ও সহযোগীতা নির্ণীত করেছে।

এগুলিকের আমি বিশ্লেষণ করবো ঐ সময়ের পত্র-পত্রিকা, সভা-সমিতিগুলির উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনার মধ্যে দিয়ে।

১. সংবাদপত্র

উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কেউ আর খাটো করে দেখেন না। অনেকে তো মনে করেন, বিদেশী শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার ব্যাপারে সংবাদপত্র এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।[১] সামাজিক ঐতিহাসিকরা (যেমন ব্রজেন্দ্রনাথ বা বিনয় ঘোষ), বাংলার সামাজিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, উনিশ শতকে প্রকাশিত সংবাদপত্র/সাময়িকপত্রের গুরুত্ব বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁদের মতে, উনিশ শতকে প্রকাশিত সংবাদপত্র/সাময়িকপত্র বাংলার মধ্যশ্রেণীর চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত করেছিল, অবদান রেখেছিল সমাজ পরিবর্তনে। শুধু তাই নয়, অনেকে মনে করেন, উনিশ শতকে বাংলার 'নবজাগরণের' ইতিহাস বাংলা সংবাদপত্রেরই ইতিহাস।[২] পার্থ চট্টোপাধ্যায় এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশেষ দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ১৮১৮ থেকে ১৮৭৮ পর্যন্ত প্রকাশিত ৭১টি সাময়িকপত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা। এঁদের মধ্যে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী—সবাই আছেন।[৩]

বাংলায় সংবাদ সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রথম প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল ইংরেজরা। প্রথমদিকে, মুদ্রণযন্ত্র, হরফের অভাব ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল প্রথম প্রতিবন্ধক। কারণ যাঁরা পত্রিকাগুলি প্রকাশ বা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা কোম্পানীর চাকুরে ছিলেন না। তাই কোম্পানীর সঙ্গে ছিল তাঁদের স্বার্থগত এবং নীতিগত বিরোধ।[৪] এ জন্যেই আমরা দেখি, লর্ড ওয়েলসলি প্রবর্তন করেছিলেন কঠোর সেন্সর ব্যবস্থার এবং হেস্টিংসের আমলেও এই নিয়মের পরিবর্তন হয় নি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখি ১৭৬৮ সালে, ওলন্দাজ বংশোদ্ভূত উইলিয়াম বোল্টস যখন কলকাতায় একটি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন তখন ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের সিলেক্ট কমিটি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিল, প্রথম যে জাহাজ পাওয়া যাবে তাতে করেই তাঁকে বাংলা ত্যাগ করে মাদ্রাজ রওয়ানা হতে হবে এবং সেখান থেকে সোজা ইউরোপে।[৫] শুধু তাই নয়, বাংলার প্রথম সংবাদপত্র ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত, 'বেঙ্গল গেজেটে অর ক্যালকাটা জেনারেল এডভার্টাইজার' (১৭৮০)-এর মালিক ও সম্পাদক জেমস অগাস্টস হিকিকে বারবার

মুখোমুখি হতে হয়েছিল কোম্পানীর রোষদৃষ্টির এবং সবশেষে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল কলকাতা থেকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সংবাদপত্র প্রকাশের প্রাথমিক উদ্যোগ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না।

প্রথম বাংলা সাময়িকী প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের উদ্যোগে, ১৮১৮ সালে। পত্রিকাটি ছিল মাসিক, নাম, 'দিগদর্শন'। সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। এই মাসিক পত্রিকা প্রকাশের একমাস পরেই (মে, ১৮১৮) তিনি প্রকাশ করেছিলেন, প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক, 'সমাচার দর্পন'। ব্যাপটিস্ট মিশন 'দিগদর্শন' এর বাংলা ও ইংরেজী সংস্করণ এবং 'সমাচার দর্পন' এর ফার্সী সংস্করণও প্রকাশ করেছিল।[৬] একই বছর জুন মাসে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রকাশ করেছিলেন, 'বাঙ্গাল গেজেটি'—বাঙ্গালী সম্পাদিত প্রথম সাময়িকপত্র।[৭]

এ ধরনের পত্রিকা/সাময়িকপত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ সংবাদপরিবেশন এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা। এবং 'এসব সংবাদ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সরস ও সাধারণের পাঠোপযোগী করতে গিয়ে সাময়িকপত্রগুলো বাংলা গদ্যের উন্নতির পথ বাধামুক্ত'[৮] করেছিল।

১৮১৮ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত আরো কিছু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু সেগুলি উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নয়। বলা যেতে পারে বাঙ্গালীর কাছে সংবাদপত্র উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল ১৮৩১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। আনিসুজ্জামান মনে করেন, পত্রিকাটি বাংলা সাময়িকপত্রে সৃষ্টি করেছিল এক নতুন ধারার। কারণ, তখন থেকে সাময়িকপত্রগুলিকে অবলম্বন করে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস দেখা গিয়েছিল, উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল বাংলা গদ্যরীতির এবং আবির্ভাব হয়েছিল অনেক নতুন লেখকের।[৯] ঐ বছরই আবার প্রকাশিত হয়েছিল, মুসলমান সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' (৭ মার্চ, ১৮৩১)।[১০] এরপর শুরু হয়েছিল কলকাতা এবং আশেপাশের অঞ্চল থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন রকম মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক সাময়িকপত্র/সংবাদপত্রের প্রকাশের শুরু।

ঐ সময় যে শুধু বাংলা সংবাদপত্রই প্রকাশিত হয়েছিল তা নয়, প্রকাশিত হয়েছিল যথেস্ট ইংরেজী সংবাদপত্রও। উর্দু ও ফারসী সংবাদ-পত্রও ছিল কিছু। তবে ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল

স্বতন্ত্র। প্রথমটির উদ্দেশ্য ছিল 'মনোরঞ্জন ও মুনাফা অর্জন' এবং দ্বিতীয়টির 'সমাজ সংস্কার ও জ্ঞানের প্রসার।'[১১]

ক. পূর্ববঙ্গে সংবাদপত্র/সাময়িকপত্রের আবির্ভাব

১৮৫৭ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত ব্রজেন্দ্রনাথের হিসাব অনুযায়ী বংলায়, বাংলাভাষায় প্রকাশিত সাময়িকপত্র/সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল মোট ৯০৫টি। এরমধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০টি। কিন্তু এ ছাড়াও আরো ৬১টি সাময়িকপত্রের খোঁজ পাওয়া গেছে। ফলে আমার আলোচ্য সময়ে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্র/সংবাদপত্রের সংখ্যা ২৪২টি বলে ধরে নিতে পারি।[১২] এ সংখ্যা অবশ্য একদিক থেকে তুলে ধরে পূর্ববঙ্গের সামগ্রিক অবস্থা এবং কলকাতার সঙ্গে এর বিচ্ছিন্নতা। কিন্তু এ চিত্রের অন্য আরেকটি দিক আছে। যদি শুধুমাত্র পূর্ববঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিচার করি এবং সে সময়কার পূর্ববঙ্গের চিত্রটি মনে রাখি যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তা'হলে বরং পুরো ব্যাপারটা অকিঞ্চিৎকর মনে হবে না। কারণ পূর্ববঙ্গ ছিল তখন বনে জঙ্গলে ঢাকা, এবং বহির্বিশ্বের কেন, বাংলাদেশেরই অনেক অঞ্চলের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না। সুতরাং সে সময় সংবাদপত্র/সাময়িকপত্র নিয়মিত প্রকাশিত হওয়াই ছিল অভাবনীয় ঘটনা।

কিন্তু সেই অভাবনীয় ঘটনাই ঘটেছিল। আমার আলোচ্য সময়ে পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত ২৪১টি সংবাদ-সাময়িকপত্রের অনেকগুলিই ছিল সাপ্তাহিক এবং নিয়মিত। যেমন 'ঢাকা প্রকাশ' বা 'বেঙ্গল টাইমস'। এ দুটি কাগজ টিকে ছিল দীর্ঘদিন। 'ঢাকা প্রকাশ' এর আয়ুতো ছিল প্রায় একশো বছর। কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত সাহিত্য মাসিক 'বান্ধব'-কে অনেকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন' বলে।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পরবর্তীকাল শুধু রাজনৈতিক বা সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেই নয়; বাংলা সাময়িকপত্রের জন্যেও উল্লেখযোগ্য। এ সময় কলকাতা থেকে 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হতে থাকে (১৫ নভেম্বর ১৮৫৮)। 'সোমপ্রকাশ' এর প্রভাব তৎকালীন খুব কম পত্রিকাই এড়াতে পেরেছিল। উৎসাহী সম্পাদক মাত্রই চাইতেন, প্রায় ক্ষেত্রেই, 'সোমপ্রকাশ' এর মত পত্রিকা প্রকাশ করতে। যেমন 'ঢাকা প্রকাশ' এর নামকরণ, আকার, রচনাভঙ্গী সবকিছুতেই আমরা এই প্রভাব লক্ষ্য করি। 'সোম প্রকাশ' এর

প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এর আগে বাংলা সাময়িক/সংবাদপত্রে রাজনীতি বা সমাজ নিয়ে ব্যাপক কোন আলোচনা হত না। 'সোম প্রকাশে'ই ব্যাপকভাবে এ ধরনের আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছিল। অবশ্য এর কারণ ১৮৫৭ এর পর 'বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের মনে দ্রুত সঞ্চারিত হয় রাজনৈতিক চেতনা এবং এর বহিপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।'[১৩]

১৮৫৭ এর আগে প্রকাশিত দু'একটি পত্র-পত্রিকার কথা বাদ দিলে, সত্যিকার অর্থে, পূর্ববঙ্গে সংবাদ-সাময়িকপত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল ষাটের দশকে। পত্রিকার সম্পাদকরা বাংলা সংবাদপত্রের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের পটভূমিকা সম্পর্কে পরিচিত ছিলেন। বলা যেতে পারে, পূর্বসুরী-দের অভিজ্ঞতা নিয়েই তারা যাত্রা শুরু করেছিলেন। আমরা যদি উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রকে মধ্যশ্রেণী/প্রবলশ্রেণীর ভাবনার জগতের মাপকাঠী হিসেবে ধরি তা'হলে দেখবো উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণীর অনেক বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক সংবাদ বিষয়ক পত্রিকাগুলিকে এই আলোচনায় সংবাদপত্র ও বাকীগুলিকে সাময়িকপত্র হিসেবে উল্লেখ করা হবে।

খ. পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের বিবরণ

পূর্ববঙ্গের প্রথম সংবাদপত্র 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৭ সালে, 'রংপুরের কুণ্ডী পরগনার বিদ্যোৎসাহী ভূম্যাধিকারী কালী-চন্দ্র রায় চৌধুরীর আনুকূল্যে।'[১৪] ১৮৪৭ থেকে ১৮৬০ এর মধ্যে, তের বছরে পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল পূর্ববঙ্গের প্রথম ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ঢাকা নিউজ' (১৮৫৬)।[১৫] ১৮৬০ সালে রংপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল আরেকটি বাংলা সাপ্তাহিক 'রঙ্গপুর দিক প্রকাশ'। মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল চারটি এবং চারটিই ঢাকা থেকে। এর মধ্যে দু'টি ছিল সাহিত্য বিষয়ক,[১৬] একটি ইংরেজী গেজেটের অনুবাদ,[১৭] আরেকটি ছিল বিক্রমপুরের এক সভার মুখপত্র।[১৮] উপরোক্ত তিনটি সংবাদপত্রই প্রকাশিত হয়েছিল জমিদারদের অর্থানুকূল্যে এবং সেগুলি আদৌ জনমনে কোন রেখাপাত করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না।

সংবাদপত্র সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে, সামগ্রিক ভাবে পূব-বঙ্গের মুদ্রণশিল্পের ব্যাপারে আমাদের জানা উচিত। পূর্ববঙ্গে প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি কখন স্থাপিত হয়েছিল তা জানা যায় নি। তবে ধরে নিতে পারি,

১৮৪৭ সালে 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' প্রকাশের জন্যে রংপুরে স্থাপিত মুদ্রণ যন্ত্রণটিই পূর্ববঙ্গের প্রাচীনতম বাংলা মুদ্রণযন্ত্র। ঢাকায়, যদিও অনেকের ধারণা 'ঢাকা নিউজ' প্রকাশের জন্যে স্থাপিত 'ঢাকা নিউজ প্রেস'ই প্রাচীনতম, আসলে কিন্তু তা সঠিক নয়। এর অনেক আগে, ১৮৪৮ সালে, ঢাকায় অন্তত একটি হলেও ইংরেজী মুদ্রণযন্ত্র ছিল।[১৯] কিন্তু, ১৮৬০ সালে, ঢাকা শহরের বাবুর বাজারে স্থাপিত 'বাঙ্গালা যন্ত্র' শুধু ঢাকাতেই নয়, পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। এ ছাড়া 'বাঙ্গালা যন্ত্র' ঢাকার সমাজ জীবনে যতোটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তা আর কোন মুদ্রণ যন্ত্র করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। এই যন্ত্র থেকেই মুদ্রিত হয়েছিল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'।[২০] ষাটের দশক থেকেই পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপিত হতে থাকে।

আগেই উল্লেখ করেছি, প্রধানত ব্রাহ্ম আন্দোলনের অভিঘাতের ফলে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল বেশ কিছু সভাসমিতি, সমাজ সংস্কারই ছিল যাদের প্রধান উদ্দেশ্য। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্ম বিরোধীরাও চেয়েছিল নিজেদের কথা সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে। ব্রাহ্ম, রক্ষণশীল হিন্দু, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক—সবার ক্ষোভ, আকুলতা প্রকাশের বা উঠতি মধ্য/প্রবল শ্রেণীর মাধ্যম হয়ে উঠেছিল সংবাদপত্র বা বলা যেতে পারে সামাজিক কারণেই সংবাদ/সাময়িকপত্র হয়ে উঠেছিল অনিবার্য। আমাদের এ অনুমান যে ভুল নয়, ১৮৬০-১৯০৫ সালের সংবাদ/সাময়িকপত্রের উপাত্তই এর প্রমাণ (দেখুন, সারণী ঃ ১৪)।

সারণী ঃ ১৪ পরীক্ষা করলে দেখতে পাবো, এর মাঝে, পূর্ববঙ্গের সমাজ ও সংবাদ/সাময়িকপত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠছে।

১৮৬১-৭০ এর উপাত্ত থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, পূর্ববঙ্গে মধ্য/প্রবলশ্রেণী সংলগ্ন একটি বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল এবং তারা আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন সাহিত্য সমাজ সংস্কারে। তবে সব কিছু আবর্তিত হয়েছিল ঢাকাকে কেন্দ্র করেই।[২১]

১৮৭১-৯০-এ বিশ বছরে দেখা যাচ্ছে, সংবাদ/সাময়িকপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তা শুধু ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল মফস্বলে, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামেও। ঐ সময় প্রকাশিত সাময়িকপত্রগুলি ছিল বৈচিত্র্যময়। কি বিষয়ে না ঐ সময়

পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। নতুন কিছু করার তাড়না এবং নতুনকে জানার আগ্রহই বোধ হয় এর কারণ। যেমন, ঢাকা থেকে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল কাব্য বিষয়ক সাময়িকী 'কবিতা কুসুমাবলী'। নারীমুক্তি বিষয়ক সাপ্তাহিক 'বালারঞ্জিকা' প্রকাশিত হয়েছিল আবদুর রহিমের সম্পাদনায় বরিশাল থেকে।[২২] চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল আয়ুর্ব্বেদ ও তন্ত্রমন্ত্র সম্পর্কিত মাসিক 'ঋষি-তত্ত্ব'।[২৩] ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল সঙ্গীত বিষয়ক মাসিক 'কৌমুদী'।[২৪] শিল্প ও কৃষি বিষয়ক একটি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হত রাজশাহী থেকে।[২৫] কিশোরদের জন্যে 'সুখীপাখী' প্রকাশিত হয়েছিল যশোর থেকে।[২৬] ঢাকা থেকে, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়েছিল 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ'।[২৭] ঢাকার শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাপ্তাহিক রামধনুও ছিল বেশ জনপ্রিয়।[২৮] আর সংবাদভিত্তিক সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রগুলির কথা না হয় বাদই দিলাম।

এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, ষাটের দশকে পূর্ববঙ্গে যে, বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীটির উদ্ভব হয়েছিল তা বিকশিত হয়ে উঠেছিল সত্তর থেকে নব্বই দশকের মধ্যে। এবং পত্রিকার পাঠক যেহেতু ছিলেন পেশাজীবী শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত শ্রেণী সেহেতু অনুমান করে নিতে পারি যে, পেশাজীবী/মধ্যশ্রেণীও ঐ সময় বিকাশ লাভ করেছিল।

নব্বই দশকের পর অবশ্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশের হার হ্রাস পেয়েছিল যার কারণ জানা যায়নি। তবে মনে হয়, প্রধানতঃ ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলে সমাজ জীবন যে রকম আলোড়িত ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল নব্বই দশকের পর হঠাৎ যেন ভাটা পড়েছিল তাতে। পত্র-পত্রিকা প্রকাশের সেরকম উৎসাহ হয়ত তখন আর ছিল না।

এখন আমি আমার আলোচ্য সময়ে প্রকাশিত কয়েকটি বিশেষ পরিচিত সংবাদপত্রের পরিচয় তুলে ধরবো। সংবাদপত্র বলতে আমরা বুঝবো, সংবাদভিত্তিক সাপ্তাহিক বা পাক্ষিকগুলোকে। যে সব সাপ্তাহিকগুলি মোটামুটি বেশ কিছুদিন টিকে ছিল এবং প্রভাবিত করতে পেরেছিল পাঠকদের, সে ধরনের কয়েকটি সংবাদপত্র মাত্র উদাহরণ হিসেবে বেছে নেওয়া হল আলোচনার জন্যে।

সারণী ঃ ১৪ উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা

অঞ্চল	প্রকৃতি	সময়কাল					
		১৮৪৭-৬০	১৮৬১-৭০	১৮৭১-৮০	১৮৮১-১৮৯০	১৮৯১-১৯০৫	মোট
ঢাকা	সাপ্তাহিক	১	৫	৫	৯	১	২১
	পাক্ষিক		১	১			২
	সপ্তাহে দু'দিন		১				১
ময়মনসিংহ	সাপ্তাহিক			৪	২	১	৭
	পাক্ষিক				২		২
চট্টগ্রাম	সাপ্তাহিক			১	৩		৪
	পাক্ষিক			১	১		২
কুমিল্লা	সাপ্তাহিক			১	১	১	৩
	পাক্ষিক					১	১
নোয়াখালী	সাপ্তাহিক				১		১
সিলেট	সাপ্তাহিক			১		১	২
	পাক্ষিক			১		২	৩
পাবনা	সাপ্তাহিক			১	১		২
	পাক্ষিক			১			১
খুলনা	পাক্ষিক						
রাজশাহী	সাপ্তাহিক		১	১			২
	পাক্ষিক		১			১	২
বগুড়া	সাপ্তাহিক					১	১
যশোর	সাপ্তাহিক		১		১		২
রংপুর	সাপ্তাহিক	২					২
	পাক্ষিক				১		১
কুষ্টিয়া	সাপ্তাহিক			১			১
	পাক্ষিক		১		১		২
ফরিদপুর	সাপ্তাহিক				১	১	২
বরিশাল	সাপ্তাহিক			২	১	২	৫
	পাক্ষিক		১	১	২		৪

সারণী ঃ ১৫ উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত সাময়িকপত্রের সংখ্যা

অঞ্চল	প্রকৃতি	সময়কাল ১৮৪৭-৬০	১৮৬১-৭০	১৮৭১-৮০	১৮৮১-১৮৯০	১৮৯১-১৯০৫	মোট-
ঢাকা	মাসিক	৪	৮	১০	১৫	১১	৪৮
	পাক্ষিক		১		১	১	৩
	সাপ্তাহিক				১		১
ময়মনসিংহ	ত্রৈমাসিক				১		১
	মাসিক		২	৬	৮	২	১৮
চট্টগ্রাম	মাসিক			২	৩	১	৬
কুমিল্লা	মাসিক				১	২	৩
নোয়াখালী	মাসিক					১	১
সিলেট	মাসিক				১	২	৩
পাবনা	মাসিক		২	২	২	১	৭
রাজশাহী	ত্রৈমাসিক					১	১
	মাসিক		২	১	৫	২	১০
বগুড়া	মাসিক			১			১
যশোর	মাসিক				৬	৫	১১
	পাক্ষিক		১				১
রংপুর	মাসিক		১			৫	৬
কুষ্টিয়া	মাসিক		২		২	২	৬
	ত্রৈমাসিক					১	১
ফরিদপুর	ত্রৈমাসিক					১	১
	মাসিক			২	১	৩	৬
বরিশাল	মাসিক			৩	২	১	৬
	পাক্ষিক			২			২
	সাপ্তাহিক			২			২
দিনাজপুর	মাসিক			১	১		২
খুলনা	মাসিক					২	২

সংবাদপত্র	মোট	সাময়িক পত্র	মোট
সাপ্তাহিক	৫৩	ত্রৈমাসিক	৪
পাক্ষিক	২২	মাসিক	১৩৬
সপ্তাহে দু'দিন	১	পাক্ষিক	৬
বিজ্ঞাপিত	৫	সাপ্তাহিক	২
		প্রকাশকাল বা স্থান জানা যায়নি	৫
		বিজ্ঞাপিত	৭

সর্বমোট ঃ ২৪১

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ ঃ (১৮৬০)

পূর্ববঙ্গের দ্বিতীয় বাংলা সংবাদপত্র 'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ'। রংপুরের কাকিনীয়া 'ভূগোলক বাটির' জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরীর সাহায্যে ১৮৬০ সালের এপ্রিল মাসে সাপ্তাহিক এই সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল। এর সম্পাদক ছিলেন মধুসূদন ভট্টাচার্য। পত্রিকাটি ছাপা হত তিন'শ কপি।[২৯] 'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' কতদিন টিকে ছিল তথ্যের অভাবে তা বলা যাচ্ছে না। তবে ১৮৮৪ সালের পত্রিকাটির অস্তিত্ব ছিল।[৩০]

ঢাকা প্রকাশ ঃ (১৮৬১)

'ঢাকা প্রকাশ' ছিল ঢাকার প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। পত্রিকাটি টিকে ছিল প্রায় একশো বছর এবং পূর্ববঙ্গের আর কোন পত্রিকা এতোদিন টিকে ছিল বলে জানা যায় নি। স্বভাবতই পূর্ববঙ্গের প্রভাবশালী পত্রিকা ছিল 'ঢাকা প্রকাশ' সরকার পর্যন্ত যার মতামতকে গুরুত্ব দিত।[৩১]

কলকাতার 'সোম প্রকাশ' এর অনুকরণে, ১৮৬১ সালে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায়, ব্রাহ্মদের বেসরকারী মুখপত্র হিসেবে 'ঢাকা প্রকাশ' এর যাত্রা শুরু। তবে পত্রিকাটির মালিকানা বদল হয়েছিল বিভিন্ন সময় এবং মালিকানা বদলের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছিল দৃষ্টিভঙ্গীও। তাই প্রথমদিকে ব্রাহ্মদের সমর্থক হলেও পরে তা হয়ে উঠেছিল রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র। 'ঢাকা প্রকাশ' ছাপা হত' বাঙ্গালা-যন্ত্র' থেকে। পত্রিকা প্রকাশের সময় এর প্রচার সংখ্যা ছিল আড়াইশো, কিন্তু নব্বই দশকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের আন্দোলনের সময় 'ঢাকা

প্রকাশের' প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৯৩ সালে পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার।[৩২]

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা : (১৮৬৩)

শত সংগ্রামের মধ্যে দিয়েও একটি পত্রিকা কিভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' তার প্রমাণ। ১৮৬৩ সালে কুমারখালীর বাংলা পাঠশালার শিক্ষক হরিনাথ মজুমদার বা কাঙ্গাল হরিনাথ মাসিক 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' প্রকাশ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল হরিনাথের ভাষায়, "আমার ইচ্ছা হইল, এই সময় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিয়া গ্রামবাসী প্রজারা যে ভাবে অত্যাচারিত হইতেছে, তাহা গভর্ণমেন্টের কর্ণগত করিলে, অবশ্যই তাহার প্রতিকার এবং তাহাদিগের নানা প্রকার উপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।"[৩৩]

আরেকটি কারণও ছিল যা উল্লিখিত হয়েছিল প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞাপনে। 'এ পর্যন্ত বাঙ্গালা সংবাদপত্রিকা যতই প্রচারিত হইতেছে তাহা কেবল প্রধান প্রধান নগর ও বিদেশীয় সম্বাদাদিতেই পরিপূর্ণ। গ্রামীয় অর্থাৎ মফস্বলের অবস্থাদি কিছুই প্রকাশিত হয় না।'[৩৪]

'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' মাসিক হিসেবে প্রকাশিত হলেও অচিরে রূপান্তরিত হয়েছিল পাক্ষিকে, তারপর সাপ্তাহিকে এবং আবার মাসিকে। মনে হয় হরিনাথের মূল লক্ষ্য ছিল যে ভাবে হোক পত্রিকা প্রকাশ অব্যাহত রাখা। বোধহয় অর্থ থাকলে তা পাক্ষিক এবং সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হত। না থাকলে মাসিকে। পত্রিকাটির রূপান্তর কতবার হয়েছিল নীচের তালিকা দেখলে তা বোঝা যাবে—

১ম ভাগ :	বৈশাখ-চৈত্র	১২৭০	মাসিক
২য় ভাগ :	আষাঢ়-চৈত্র	১২৭১	পাক্ষিক
৩য় ভাগ :	বৈশাখ-চৈত্র	১২৭২	মাসিক
৭ম ভাগ :	বৈশাখ-চৈত্র	১২৭৬	পাক্ষিক
৮ম ভাগ :	বৈশাখ-ভাদ্র	১২৭৭	সাপ্তাহিক
:	কার্ত্তিক-চৈত্র	১২৭৭	পাক্ষিক
৯ম-১৫শ :	বৈশাখ-চৈত্র	১২৭৮	সাপ্তাহিক[৩৫]
:	বৈশাখ-চৈত্র	১২৮৪।	

কিন্তু সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হওয়াকালীন ও অনিয়মিত ভাবে মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' বের হত।

হরিনাথ লিখেছিলেন, 'যখন গ্রামবার্ত্তা মাসিক ছিল, তখন ধর্ম্ম নীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি সাহিত্যময় প্রবন্ধ এবং রাজনীতিময় প্রস্তাব গ্রামের ঘটনাময় সংবাদ সহকারে গ্রামবাসীদিগের জ্ঞাতব্য বজায় অভিপ্রায়, মন্তব্য ও বিবিধ সংবাদ প্রকাশিত হইত। পাক্ষিকাবস্থায় ধর্ম্মনীতি সাহিত্য ব্যতীত পূর্ব্ববৎ আর সকলেরই প্রচার হইয়াছে। সাপ্তাহিকাবস্থায় সাহিত্যময় প্রবন্ধাদি প্রচার রহিত হইয়া বাহুল্যরূপে রাজনীতিরই আলোচনা হইতে লাগিল।'[৩৬]

পত্রিকাটি প্রকাশের ফলে, ঐ অঞ্চলে ধনীরা গরীবদের ওপর আগের মত অত্যাচার করতে সাহস করতেন না।[৩৭] অর্থাভাবে পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কারণ এর প্রচার সংখ্যা কখনই বেশী ছিল না।

হিন্দু হিতৈষিনী : (১৮৬৫)

ঢাকার ব্রাহ্ম আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলে, ঢাকার প্রতাপশালী গোঁড়া হিন্দু উকিল কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গোঁড়া হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান 'হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভা' স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু কাশীকান্তর বড় ছেলে শ্যামাকান্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মে এবং 'ঢাকা প্রকাশে' এর সমর্থনে লেখালেখিও শুরু করেছিলেন। 'পুত্রের এইরূপ আচরণে পিতা মর্মান্তিক ক্লেশ পাইয়াছিলেন এবং এই ঘটনা হইতেই 'ঢাকা প্রকাশ' এর প্রতিদ্বন্দ্বী তত্রত্য হিন্দু সমাজের মুখপত্র স্বরূপ একখানি পত্রিকা বাহির করিবার জন্যে তাহার প্রবল ইচ্ছা জন্মে।'[৩৮] সুতরাং হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভার মুখপত্ররূপে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হতে থাকে 'হিন্দু হিতৈষিনী'। হরিশচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৬৫ সালের মার্চ মাসে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। হরিশচন্দ্র অবশ্য ১৮৬৯ সালে এর সম্পাদনা ভার ত্যাগ করেছিলেন। 'হিন্দু হিতৈষিনী' কতদিন টিকে ছিলে সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ব্রজেন্দ্রনাথ, কেদারনাথের অনুসরণে লিখেছেন পত্রিকাটি ১২৮৪ (১৮৭৮) পর্যন্ত টিকে ছিল। কিন্তু সরকারী তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় ১৮৮০ পর্যন্তও পত্রিকাটির অস্তিত্ব ছিল এবং তখন এর প্রচার সংখ্যা ছিল তিনশো।[৩৯]

বিজ্ঞাপনী ঃ (১৮৬৫)

বালিয়াটির গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী ঢাকায় 'বিজ্ঞাপনী' নামে একটি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেছিলেন। এবং এই প্রেস থেকেই 'বিজ্ঞাপনী'র প্রকাশ শুরু হয়েছিল ১৮৬৫ সালের মার্চ মাসে। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার নিযুক্ত হয়েছিলেন এর সম্পাদক, অবশ্য তাঁকে প্রেসের দেখাশোনাও করতে হত।[৪০] ১৮৬৬ সালের প্রথমভাগে 'বিজ্ঞাপনী' স্থানান্তরিত করা হয়েছিল ময়মনসিংহে। এবং সেখানে কিছুদিন প্রকাশিত হওয়ার পর ১৮৬৮ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।[৪১]

বেঙ্গল টাইমস ঃ (১৮৬৯)

ইংরেজীতে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও, বেঙ্গল টাইমস, শুধু ঢাকার নয়, পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে প্রভাবশালী পত্রিকা ছিল।

খুব সম্ভব ১৮৬৯ সালে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল।[৪২] এর মালিক ও সম্পাদক ছিলেন 'নেটিভ' বিদ্বেষী ই. সি. কেম্প। প্রতি বুধ ও শনিবারে নিয়মিত পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। এর প্রথম তিন পাতা জুড়ে থাকতো বিজ্ঞাপন, মাঝে মাঝে শেষের পাতাতেও থাকতো। অধিকাংশ বিজ্ঞাপন ছিল কলকাতার, তবে ঢাকা, লণ্ডনেরও থাকতো কিছু বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের হার সে আমলের অন্যান্য পত্রিকার তুলনায় একটু বেশীই ছিল। যেমন ১ কলাম নিয়মিত তিনমাসের জন্যে ছিল ষাট টাকা।

পত্রিকার বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংকলন, লণ্ডন এবং ফ্রান্সের চিঠি, কিছু রচনা, ঢাকা ও অন্যান্য অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত খবর। মাঝে মাঝে কবিতাও ছাপা হত। তবে সুযোগ পেলেই পত্রিকাটি দেশীয়দের প্রতি কটুক্তি করত। সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকার তুলনায় এর দাম ছিল অত্যন্ত বেশী, প্রতি সংখ্যা ঢাকায় আট আনা এবং মফস্বলে ডাক খরচ নিয়ে ন'আনা।

গ. পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্রের বৈশিষ্ট্য

উপরোক্ত আলোচনা, এবং সংবাদপত্র/সাময়িকপত্র সম্পর্কে সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্র সম্পর্কে কিছু বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন একটি সংবাদপত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না। একটি পত্রিকা কখন প্রকাশিত হয়েছিল

তা জানা গেলেও কখন লুপ্ত হল, প্রায় ক্ষেত্রেই তা' জানা যায় না। এর কারণ পূর্ববঙ্গে উনিশ শতকে প্রকাশিত প্রায় সব পত্র-পত্রিকাই এখন বিলুপ্ত। তাই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে স্বল্প তথ্য নিয়ে এবং তার ওপর ভিত্তি করেই অনুমান করে নিতে হবে অনেক কিছু।

আমার আলোচ্য সময়ে, পূর্ববঙ্গে সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল খুবই কম। এর কারণ অবশ্য অজানা নয়। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের জন্যে যে ইনফ্রা-স্ট্রাকচার, যেমন প্রেস, দক্ষ কম্পোজিটর, সংবাদ সংগ্রহের সুবিধা ইত্যাদির অভাব ছিল এবং তা স্বাভাবিক। ফলে সংবাদ ভিত্তিক পত্রিকার খানিকটা চাহিদা থাকলেও তার সংখ্যা বাড়েনি এবং যে সব পত্রিকা বেরিয়েছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বেশী দিন টেকেনি।

এ সময় মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার স্বল্পতা স্পষ্টতত চোখে পড়ে। এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার (সাময়িকী) সংখ্যা ছিল মাত্র আঠারোটি এবং এর অধিকাংশই ছিল মাসিক। সুতরাং কোন রকম উপাত্ত ছাড়াই বলা যায়, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সামাজিক সব-ক্ষেত্রেই পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা ছিল অনেক পিছিয়ে। মুসলমান মধ্যশ্রেণী তখনও অপরিণত এবং দেখা যাচ্ছে সম্প্রদায়গতভাবে সমাজে তার কোন প্রভাব ছিল না।

উনিশ শতকের বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার ছিল সীমিত; সামগ্রিক-ভাবে বাংলা সংবাদপত্রের পশ্চাদমুখীনতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, এর কারণ 'আর্থিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা'। ধনীরা সংবাদপত্রকে সাহায্য করেছেন ঠিকই কিন্তু পুঁজিপতি লগ্নী করেন নি সংবাদ পত্রের জন্যে।[৪৩] কারণ স্বাভাবিক। আমরা আগেই দেখিয়েছি, ঔপনিবেশিক কাঠামোয়, অধস্তন শ্রেণী হিসেবে বাঙ্গালী ধনবানরা শিল্প বা ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করার চাইতে জমিতে খাটানো অনেক নিরাপদ মনে করতেন। উমা দাশগুপ্ত লিখেছেন, ১৮৭০ ৮০ সালে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একুশটি পত্রিকার মধ্যে সতেরটি ছিল একক উদ্যোগে প্রকাশিত, চারটি যৌথ উদ্যোগে।[৪৪] চট্টোপাধ্যায় ও দাশগুপ্ত যে মন্তব্য করেছেন অনেকাংশে তা সত্য হলেও পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ছিল খানিকটা ভিন্নতর।

পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতায় অনেক সংবাদপত্রকে রক্ষা করেছেন

ধনী ব্যবসায়ী বা সম্পন্ন মধ্যশ্রেণী। অর্থাৎ সেখানে সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারটি খানিকটা ছিল। কিন্তু এ অঞ্চলের সংবাদ-পত্রগুলি ঠিক ঐ ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি। এর একটি কারণ হয়ত এই যে, পূর্ববঙ্গের জমিদাররা প্রায় ক্ষেত্রেই ছিলেন অনুপস্থিত জমিদার। নব্য অভিজাত বা ধনীরাও সময় কাটাতে ভালোবাসতেন রাজধানী কলকাতায়। ফলে পূর্ববঙ্গের অনেক পত্রিকা বেরিয়েছিল যৌথ উদ্যোগে অথবা বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলের মুখপত্র হিসেবে (অন্তত প্রাথমিকভাবে হলেও)।[৪৫] ধনী জমিদারদের অর্থানুকুল্যেও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু তাঁরা তা করেছিলেন নিজেদের স্বার্থ সামনে রেখে। অবশ্য পেশাজীবী বা মধ্যশ্রেণীরও যে স্বার্থ ছিল না তা নয়, কিন্তু তার চেয়েও তীব্রতর ছিল বোধহয় তাঁদের জ্ঞানাকাঙ্খা এবং নতুন কিছু করার আগ্রহ। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা যারা প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন ছোটখাট উকিল, সমাজ সেবী, ব্রাহ্ম প্রচারক বা শিক্ষক। একই ব্যক্তি একাধারে ছিলেন সম্পাদক, লেখক, সাংবাদিক সবকিছু। তাই দেখা গেছে, যতদিন প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা উদ্যম টিকে ছিল, ততদিন পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল। আবার এসব পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গই পরিচিত ছিলেন তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবী হিসেবে।

যোগাযোগের অভাবে বা বলা যেতে পারে, বিচ্ছিন্নতার কারণে, বিভিন্ন অঞ্চল, এমনকি আদিম পাঁড়াগা থেকে পর্যন্ত পত্রিকা/সাম-য়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। অথবা হয়ত এ বোধ কাজ করেছিল যে, যদি ঢাকা থেকে পত্রিকা বের করা সম্ভব হয় তা'হলে অন্যান্য অঞ্চল থেকে তা সম্ভব হবে না কেন?

ঢাকা বা মফস্বল থেকে প্রকাশিত প্রায় সব পত্রিকারই প্রচার সংখ্যা ছিল অস্বাভাবিক রকম কম। ১৮৬৩ সালের সরকারী হিসাব অনুযায়ী, 'ঢাকা নিউজ', 'ঢাকা প্রকাশ', 'ঢাকা দর্পণ' এবং 'হিন্দু হিতৈষিনী'র প্রচার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩০০, ২৫০, ৩৫০ এবং ৩০০ কপি।[৪৬] ১৮৬৭ সালের এক হিসাবে জানা যায়, ঢাকা প্রকাশের প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ১৯ কপি এবং হিন্দু হিতৈষিণীর ১০০ কপি।[৪৭] ১৮৮০ সালে পূর্ববঙ্গের দশটি পরিচিত পত্রিকার সম্মিলিত প্রচার সংখ্যা ছিল ৩২৭৭ কপি। এর মধ্যে সবচেয়ে কম

ছিল 'রাজশাহী সমাচারের'—মাত্র ৩১ কপি।[৪৮] ১৮৯০ এর আরেক হিসাবে জানা যায়, ছয়টি পত্রিকার সম্মিলিত প্রচার সংখ্যা ছিল ২২৪০ কপি। এর মধ্যে ঢাকা প্রকাশেরই প্রচার সংখ্যা ছিল ১২০০ কপি।[৪৯] পত্রিকার বিকাশের এও ছিল একটি অন্তরায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোনরকম উপাত্ত ছাড়া এটাও পরিস্কার হয়ে যায় যে, বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত জনসংখ্যাই ছিল নিরক্ষর (পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে, সরকারী হিসাব উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, বাংলায় অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা তিনভাগ মাত্র পৃঃ, ৯১)। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, কোন গ্রামে হয়ত মাত্র একটি খবরের কাগজ আসতো। তখন খবর জানতে হলে লোকজন গ্রামের পোস্ট অফিসে এসে হাজির হতো। একজন পড়তো এবং বাকী সবাই শুনতো।[৫০]

এ পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিকা প্রকাশের ব্যয়ের দিকটাও আমাদের মনে রাখতে হবে। ঐ আমলের তুলনায় ছাপা বা কাগজের খরচ খুব একটা কম ছিল না। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানিক ব্যয়তো ছিলই। ঢাকা প্রকাশের ১৮৬৩ সালের এক বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, পাইকা টাইপে প্রতি ফর্মা ছাপার জন্যে লাগতো ছয়টাকা।[৫১] 'পল্লী বিজ্ঞান'-এর মুদ্রণ ও কাগজ বাবদ খরচ ছিল যথাক্রমে ৩৯ টাকা এবং ২২ টাকা ৬ আনা। অন্য দিকে ডাকমাশুলের ব্যয় ছিল ৪০ টাকা।[৫২]

সাধারণত একটি পাত্রিকার আয়ের প্রধান উৎস হল প্রচার ও বিজ্ঞাপন। প্রচারের কথাতো আগেই উল্লেখ করেছি। এবাবে বিজ্ঞাপন। উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের বাংলা সংবাদ/সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন প্রায় থাকতো না বললেই চলে (দু'এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে, যেমন, বেঙ্গল টাইমস)। এ থেকে পূর্ববঙ্গের তৎকালীন শহর ও শহরকেন্দ্রিক ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে ধারণা করা চলে। অর্থাৎ এগুলির কোনটিরই বিকাশ হয় নি। তবে দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রে, পত্রিকার দাম কম হলে, কাটতি বাড়তো। যেমন, ঢাকার এক পয়সার দু'টি কাগজ শুভসাধিনী ও হিতকরীর প্রচার সংখ্যা ছিল গড়ে ৫০০/৬০০ কপি।[৫৩] কিন্তু পত্রিকা কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব ছিল না সব সময় কাগজের দাম কমিয়ে রাখা।

যেহেতু বিজ্ঞাপনের ওপর পত্রিকা কর্তৃপক্ষের কোন ভরসা ছিল না, তাই গ্রাহকদের তারা নানারকম সুবিধা দিয়ে প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি

করতে চাইতেন। যেমন 'গৌরব' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিলেন, গ্রাহকরা 'আপন বংশের গৌরব চিরস্থায়ী করিতে ইচ্ছা করিলে তাদের বংশ লতিকা' পত্রিকায় মুদ্রণের জন্যে পাঠাতে পারেন। শুধু তাই নয়, যারা অগ্রিম গ্রাহক মূল্য দেবেন তাদের উপহার দেওয়া হবে একটাকা তিনআনা মূল্যের পাঁচ খানা বই। সুবিধা দেওয়া হবে বিক্রেতাদেরও।[৫৪] 'ঢাকা প্রকাশে'র বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ছিল পাঁচ টাকা। কিন্তু 'অসমর্থদিগকে' তিন টাকাতেও পত্রিকা দেয়া হত। তা' সত্ত্বেও পাওয়া যেত না গ্রাহক। ১৮৭৯ সালে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' লিখেছিল, ষোল বছর ধরে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তুলে ধরেছিল নানারকম নিপীড়ণের কাহিনী, পালন করেছিল কর্ত্তব্য। কিন্তু গ্রাহকগণের অবহেলা বা বলতে গেলে পাওনা টাকা পরিশোধ না করার কারণে পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। বন্ধ হওয়ার সময় পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ছিল মাত্র দু'শো কপি।[৫৫] কিন্তু গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ারতো কোন কারণ ছিল না। কারণ নিরক্ষরতা, কারণ ক্রয়ক্ষমতা।

ঘ. সংবাদপত্রের নীতি ও বিষয়

সংবাদপত্রের নিরপেক্ষ নীতি বলতে কিছু নেই। সংবাদপত্র সবসময় জনগণের একটি অংশের মত প্রকাশ করে মাত্র। উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্রগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্র সমর্থন করত একটি বিশেষ গোষ্ঠী বা দল বা সম্প্রদায়কে। যিনি এর কোনটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না, তিনি তাঁর আপন রুচি, ইচ্ছা প্রতিফলিত করতেন সাময়িকপত্রে। কিন্তু তার সঙ্গেও সম্পর্ক থাকতো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কোন আদর্শের। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেমন, 'ঢাকা নিউজ' সমর্থক ছিল নীলকরদের। 'ঢাকা প্রকাশ' প্রথমে ব্রাহ্ম এবং পরে গোঁড়া হিন্দুদের। 'হিন্দু হিতৈষিনী' প্রকাশিত হয়েছিল রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র হিসেবে। 'বঙ্গবন্ধু' ছিল ব্রাহ্মদের মুখপত্র। 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' বিরোধীতা করেছিল জমিদার নীলকরদের অত্যাচারের। 'বেঙ্গল টাইমস' আবার সমর্থক ছিল ইংরেজদের।

উনিশ শতকের সংবাদপত্রগুলি ছিল প্রধানতঃ রচনা ভিত্তিক। অর্থাৎ ছোটখাট সংবাদ ছাড়া প্রায় ক্ষেত্রেই যে কোন একটি সংবাদ বা বিষয়কে

নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা, মতামত ছাপা হত। খবরের মধ্যে স্থানীয় খবর থাকতো কিছু আর থাকতো বিদেশী কাগজ থেকে সংগৃহীত খবর। মাঝে মাঝে ছাপা হত মফস্বল থেকে পত্রিকার ভক্ত প্রেরিত সংবাদ। ছিল চিঠিপত্রের কলামও। তবে বিষয় ভিত্তিক রচনা বা কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সম্পাদকরা নিজস্ব মতামত তুলে ধরতেন।

প্রায় ক্ষেত্রেই সম্পাদকদের নিজস্ব মতামত থাকতো। তবে তাঁদের প্রধান সম্পাদকীয় থিম ছিল জমিদার-রায়ত এবং সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক, সমাজ সংস্কার, ইংরেজ আচরণ ও নেটিবদের প্রতিক্রিয়া, সিভিল সার্ভিস, শিক্ষা ইত্যাদি। ইংরেজ শাসন নিয়েও অহরহ মন্তব্য করা হত, যে বিষয়ে আমরা উপসংহারে আলোচনা করবো। তবে সম্প্রদায় বা দল, গোষ্ঠীগত কারণে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন রকম গুরুত্ব আরোপ করেছিল কারণ সমাজ বা রাজনীতি সম্পর্কে ব্রাহ্ম হিন্দু বা মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ভিন্ন। কিন্তু অন্তর্গত মিলও ছিল কিছু এবং সে মিলই হল ঔপনিবেশিক আমলে পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র যা নিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

আমার আলোচ্য সময়ের পূর্বে বাংলার সাময়িকপত্র সংবাদপত্রগুলির দৃষ্টিভঙ্গী কি রকম ছিল? সালাহউদ্দিন আহমদ লিখেছেন, যেখানে ভারতীয় মালিকানাধীন ইংরেজী কাগজগুলির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সংস্কারমূলক সেখানে অধিকাংশ বাংলা পত্রিকাগুলি ছিল রক্ষণশীল এবং তা সেই আমলের ঝোঁক তুলে ধরে। রক্ষণশীল এবং সংস্কারবাদীদের এই দ্বন্দ্বে শেষোক্তরা গুরুত্বপূর্ণ জয়লাভ করেছিল তবে চূড়ান্ত ঝোঁক ছিল রক্ষণশীলদের পক্ষেই...হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ থেকে গেল রক্ষণশীল এবং সংবাদপত্রে তাই হয়েছিল প্রতিফলিত।[৩৬]

তিনি সামগ্রিকভাবে অখণ্ড বাংলার সাময়িকপত্র। সংবাদপত্র সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন এবং পূর্ববঙ্গে তখন কোন পত্রিকার অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায় নি। কিন্তু ঐ পটভূমিকায়ই এ অঞ্চলের পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদপত্রগুলির প্রিয় বিষয় ছিল, পূর্ববঙ্গ, কৃষক-জমিদার নীলকর, সিবিল সার্ভিস, শিক্ষা/সমাজ সংস্কার, মধ্যশ্রেণী, সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক। এই পত্রিকাগুলি দেখলে বোঝা যাবে, উপরোক্ত বিষয় ছাড়া আর কি কি বিষয় তুলে ধরেছিল সংবাদপত্রগুলি, তাদের ঝোঁক কি একই রকম থেকে গিয়েছিল বা একটি সম্প্রদায় কি চোখে

দেখেছিল অন্য সম্প্রদায়কে ইত্যাদি।[৫৭]

উ. সংবাদপত্রের কয়েকজন সম্পাদক

উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্র সম্পাদকদের নাম প্রায় ক্ষেত্রেই জানা যায় না কারণ পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে তাঁদের নাম থাকতো না। নাম থাকতো প্রকাশকের, অনেক সময় প্রকাশকের অনুপস্থিতিতে 'হেড কমপোজিটরের'। মনে হয়, প্রায় ক্ষেত্রেই সম্পাদককে একই সঙ্গে, সংবাদদাতা, লেখক, অনুবাদক সবকিছুর দায়িত্ব পালন করতে হত। অনেক সময় শুভানুধ্যায়ী কেউ হয়ত লিখে দিতেন দীর্ঘ প্রবন্ধ। কারণ প্রত্যেক বিষয়ের জন্যে স্বতন্ত্র লোক রেখে কাগজ চালানো ছিল অসম্ভব।

তৎকালীন পূর্ববঙ্গের, বিশেষ করে ঢাকার সাংবাদিক জগতের দু'জন সাংবাদিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা ছিলেন আবার কবি এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এঁদের একজন হলেন 'সদ্ভাবশতকের' কবি হিসাবে খ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, অপর জন হরিশচন্দ্র মিত্র। এ ছাড়া ছিলেন, শিশির কুমার ঘোষ, কালী প্রসন্ন ঘোষ, আবদুর রহিম, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ই, সি কেম্প প্রমুখ।

পত্রিকার সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা সম্পন্ন পরিবারের ছিলেন না। আবার খুব কম ক্ষেত্রেই সাংবাদিকতা গৃহীত হয়েছিল সার্বক্ষণিক পেশা হিসেবে। যা বলা যেতে পারে, সাংবাদিক জীবন পেশা হিসেব তখনও গ্রহণযোগ্য হয় নি বরং তা'ছিল নেশা। এ পরিপ্রেক্ষিতে, আমার আলোচ্য সময়ের পূর্ববঙ্গের কয়েকজন সাংবাদিককে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার শুধু দু'টি সংবাদপত্র ও তিনটি সাময়িকীর সম্পাদক হিসেবেই নয়, কবি হিসেবেও ছিলেন বিখ্যাত। জন্ম তাঁর ১৮৩৪ সালে, ঢাকার এক গরীব পরিবারে। পিতৃহীন কৃষ্ণচন্দ্রের শৈশব ও কৈশোর কেটেছিল দারিদ্রে। নিজের চেষ্টায় তিনি কিছু ফার্সী ও সংস্কৃত শিখেছিলেন। ঢাকায় তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল হরিশচন্দ্রের।

প্রথম জীবনে, কৃষ্ণচন্দ্র উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করেছিলেন। অনেকটা সে জন্যে তাঁকে অর্থকষ্টে কালাতিপাত করতে হয়েছিল। প্রথম জীবনে মাসিক পনের টাকা বেতনে চাকরি নিয়েছিলেন এক স্কুলে। এরপর চাকরি পেয়েছিলেন 'ঢাকা প্রকাশ' এ, সম্পাদক হিসেবে। সম্পাদক হিসেবে

মাইনে পেতেন তিনি মাসে পঁচিশ টাকা আর তাঁর হেড কমপোজিটার ত্রিশ টাকা (কমপোজিটারের অভাবও এর কারণ হতে পারে)। তারপর চাকরি পেয়েছিলেন যশোরের এক স্কুলে ত্রিশ টাকা বেতনে, কিন্তু 'ঢাকা প্রকাশ' দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি করাতে সেখানেই থেকে যান। পরবর্তীকালে পঞ্চাশ টাকা বেতনে চাকরি নিয়েছিলেন 'বিজ্ঞাপনী'তে। সে চাকরিও ছেড়ে দিয়েছিলেন কিছু দিন পর। এরপর তাঁর জীবন কেমন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ 'ঢাকা প্রকাশ' এ মুদ্রিত একটি বিজ্ঞাপন।

"শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বোধ করি ঢাকার সকলের নিকটই পরিচিত। তাঁহাকে কোন কার্যে নিযুক্ত রাখিতে পারিলে তাঁহার বর্তমান পীড়ার উপশম হইবে। এই বিবেচনায় ঢাকা ব্রাহ্ম স্কুলে আর শিক্ষকের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে ব্রাহ্ম স্কুলে অল্প বেতনে একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা গিয়াছিল। কৃষ্ণবাবুর সাহায্যার্থে অতি সহজে মাসিক এই ক্ষুদ্র চাঁদা সংগ্রহ হইতে পারিবে কেবল এইমাত্র ভরসাতে আমি কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, প্রায় ৪ মাস অতীত হইল, ইহার মধ্যে ২/১ জন ব্যতীত আর কেহই কৃষ্ণবাবুর সাহায্যে অগ্রসর হইলেন না। এ যাবৎ তাঁহার বেতনের কতক অংশ হাওলাত করিয়া দেওয়া গিয়াছে। এবং তাঁহার প্রাপ্য রহিয়া গিয়াছে।...শ্রী পার্বতীচরণ রায়।"[৫৯]

১৮৭৪ সালে যশোরের এক স্কুলে তিনি চাকরি নিয়েছিলেন। শেষ জীবনে বেশ ভালো বেতন পেতেন—একশ টাকা। কিন্তু পত্রিকার নেশা ছাড়েনি তাঁকে। যশোর থেকেও সংস্কৃত ও বাংলায় এক দ্বিভাষী পত্রিকা, 'মাসিক দ্বৈভাষিকা' প্রকাশ করেছিলেন। চাকরি জীবন থেকে অবসর নিয়ে, পরে তিনি ফিরে যান নিজ গ্রামে এবং দারিদ্রের কারণে ১৯০৭ সালে পরলোক গমন করেন। আদিনাথ সেন অবশ্য লিখেছেন, '—সদ্ভাবশতকের উপস্বত্ব নন্দকুমার গুহের নিকট ৩৮০ টাকায় বিক্রয় করিয়া স্বগ্রামে গিয়া মস্তিস্ক বিকৃত অবস্থায় মারা যান।'[৬০] কবি হরিচন্দ্রের জীবন আরো সংঘাতময়। জন্ম ১৮৩৮ সালে ঢাকায়। দারিদ্রের কারণে শিক্ষালাভ করতে পারেন নি। যা শিখেছেন তাঁর সবটুকুই নিজের চেষ্টায়। ১৮৫৯ সালে ঢাকার একটি স্কুলে কিছু দিন দিন শিক্ষকতা করে তারপর 'বাঙ্গলা যন্ত্রে' কমপোজিটারের চাকরি নিয়েছিলেন। ১৮৬০ সালে কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে একত্রে বের করেছিলেন

ঢাকার প্রথম সাময়িকপত্র 'কবিতা কুসুমাবলী'।[৬১] কৃষ্ণচন্দ্র ও হরিশ-চন্দ্র দু'জনের সাংবাদিক জীবনেরই শুরু হয়েছিল এ পত্রিকার মাধ্যমে। এর পর হরিশচন্দ্র সম্পাদনা করেছিলেন 'ঢাকা দর্পণ' 'হিন্দু হিতৈষিনী' এবং 'হিন্দুরঞ্জিকা'র। এর মাঝে আবার বের করেছিলেন চারটি মাসিক পত্রিকা—'অবকাশ রঞ্জিকা', 'কাব্য প্রকাশ' 'চিত্তপ্রকাশ' এবং 'মিত্র প্রকাশ'।[৬২]

ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন, ১৮৬৩ সালে হরিশচন্দ্র ইমাম গঞ্জে সুলভযন্ত্র ও পুস্তকালয় স্থাপন করেছিলেন।[৬৩] ১৮৬৯ সালে আবার স্থাপন করে-ছিলেন গিরীশ যন্ত্র। কিন্তু সুলভ যন্ত্র উঠে যাওয়ার পর গিরীশযন্ত্র স্থাপন করেছিলেন কিনা তার উল্লেখ নেই। হতে পারে সুলভ যন্ত্র তিনি চালাতে পারেননি দেখে 'হিন্দু হিতৈষিনী'তে চাকরি নিয়েছিলেন। এ জন্যে একটি পত্রিকা ব্যঙ্গ করে লিখেছিল, 'হরিশবাবু এতকাল চির দুঃখিনী বঙ্গ বিধবা দিগের স্বপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করিয়া এখন তাহাদিগের বিপক্ষ আচরণ করিতেছেন, শিক্ষিত অন্তঃকরণের এতাদৃশ্য পরিবর্তন অসম্ভবনীয়।'[৬৪] এরপর বোধহয় গিরীশযন্ত্র লাটে ওঠে এবং শেষ জীবনে তিনি 'হা অন্ন হা অন্ন' করে মারা যান।[৬৫]

শিশিরকুমার সম্পাদিত সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকাও একসময় খানিকটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। বহুদিন থেকে শিশিরকুমারের ইচ্ছে ছিল, একটি পত্রিকা প্রকাশের। একসময়, এই প্রেস কেনার উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন এবং এক বিধবার কাছ থেকে ৩২ টাকায় একটি ভাঙ্গা প্রেস সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর সে প্রেস নিয়ে আসেন নিজ গ্রাম যশোরের পলুয়া-মাগুরায়। প্রেস গ্রামে আনার আগে কলকাতায় তিনি প্রেসের যাবতীয় কাজকর্ম শিখে নিয়ে-ছিলেন। এই প্রেস থেকে ১৮৬২ সালের ডিসেম্বরে তাঁর ভাই বসন্ত কুমার প্রকাশ করেছিলেন পাক্ষিক 'অমৃত প্রবাহিনী' যা প্রায় চলেছিল একবছর।

বসন্তকুমারের মৃত্যুর পর ১৮৬৮ সালের মার্চ মাসে পুরনো প্রেসটি ঠিকঠাক করে, শিশিরকুমার ঘোষ বের করা শুরু করেছিলেন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা—যার নাম দিয়েছিলেন নিজ গ্রামানুসারে—'অমৃত বাজার পত্রিকা'। পত্রিকা চালাবার জন্যে, শিশিরকুমার নিজে লিখতেন, কম্পোজ করতেন। অনেক সময় প্রেসের কালি এবং কাগজ ও তিনি

তৈরী করে নিতেন। পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মতে—'It began by teaching that we are 'we' and they are 'they' অচিরেই তাঁকে ইংরেজদের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। এবং এক সময় এ সব এবং ম্যালেরিয়ার কারণে তিনি যশোর ত্যাগ করে ১৮৭১ সালে কলকাতা চলে যান এবং নতুন উদ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করেন।[৬৬]

কাঙ্গাল হরিনাথ বা হরিনাথ মজুমদারও অনেক নিগ্রহ সয়েছিলেন তাঁর পত্রিকার জন্যে। বিশেষ করে জমিদার মহাজনদের অত্যাচার তুলে ধরার জন্যে তিনি প্রকাশ শুরু করেছিলেন 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র। পেশায় ছিলেন তিনি সামান্য স্কুল মাষ্টার। কিন্তু একসময় যখন দেখলেন শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা একসঙ্গে চলছে না তখন শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছিলেন পত্রিকা প্রকাশে। এরপর বাকী জীবন তাঁর অর্থ কষ্টে কাটাতে হয়েছিল। এ সময় তিনি লিখেছিলেন, 'আমি লেখক, আমিই সম্পাদক, আমিই পত্রিকা লেফাফা ও বিলিকারক এবং আমিই মূল্য আদায়কারী অর্থ সংগ্রাহক। আবার আমিই আমার স্ত্রী পুত্রাদি সংসারের সংসারী। দীনজনের দীনতার দিন এই ভাবে দিনদিন গত হইতেছে।'[৬৭] শুধু তাই নয়, পত্রিকার কারণে তাঁকে সইতে হয়েছিল জমিদার ধনীদের নিগ্রহ।

পত্রিকার সম্পাদক/কর্তৃপক্ষকে বিজ্ঞাপনের টাকা নিয়ে সবসময় শংকিত থাকতে হত। কারণ এখনকার মত তখনও বিজ্ঞাপনদাতারা টাকা দিতে গড়িমসি করতেন। আবার সম্পাদক অনেক সময় প্রেসের দেনা মেটাতে না পেরে হেয় হতেন সমাজের কাছে। যেমন ১৮৭২ সালে 'ঢাকা প্রকাশ'—এ বঙ্গচন্দ্র রায়ের নামে একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। বঙ্গচন্দ্র ছিলেন ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজের নেতা এবং শ্রদ্ধার পাত্র কিন্তু দরিদ্র। এ হেন শ্রদ্ধার পাত্রকে প্রেস কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিয়ে জানিয়েছিল—'আপনাদিগের নিকট শুভ সাধিনী পত্রিকা মুদ্রাঙ্কন দরুন যাহা প্রাপ্য আছে তাহা অদ্য তারিখ হইতে ১৫ দিবসের মধ্যে পরিশোধ করিয়া দিবেন। যদি তাহা না দেন তবে ১৫ দিবস পরে আপনাদিগের নামে নালিশ উপস্থিত করিব।' 'গরীব' এর সম্পাদক কুঞ্জবাবু তো পত্রিকা চালাতে না পেরে তিনশ টাকায় প্রেসই বিক্রি করে দিয়েছিলেন।[৬৮] হরিনাথ মজুমদার একবার দুঃখ করে লিখেছিলেন, কৃষকদের জন্যে

তিনি লিখেন ফলে জমিদার তাঁর ওপর অত্যাচার করে কিন্তু কৃষক বা অন্যেরা তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায় না। —'যাঁহাদের নিমিত্ত কাঁদিলাম, বিবাদ মাথায় করিয়া বহন করিলাম, তাঁহাদিগের এই ব্যবহার'।[৬৯]

উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্র/সাময়িকপত্রের সম্পাদকরা অসম্ভব মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ সহ্য করেছেন কিন্তু ভেঙ্গে পড়েন নি। যেমন কৃষ্ণচন্দ্র যখন 'বিজ্ঞাপনী'র সম্পাদক ছিলেন তখন ব্রাহ্ম আন্দোলনের পক্ষে কিছু ছেপেছিলেন যা পত্রিকার মালিক পছন্দ করে নি। কৃষ্ণচন্দ্র ভবিষ্যতের কথা না ভেবে তখনই চাকুরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন।[৭০] হরিনাথের খেদোক্তির কথাতো আগেই উল্লেখ করেছি কিন্তু তাই বলে পত্রিকা প্রকাশ তিনি বন্ধ রাখেননি। আর হরিশচন্দ্র লিখেছিলেন—

'হরিশের এই পণ যায় যদি এ জীবন
তবু কভু তোষামুদী করিবে না কায়রে
প্রাণ চিরস্থায়ী নহে যায় যায় গ্রহ রহে
মান গেলে ছার প্রাণ রাখিতে কে চায়রে।'

উনিশ শতকের সংবাদপত্রে সাধারণ মানুষের প্রায় কোন স্থান ছিল না। ছিল না তারা খবরের বিষয়বস্তু। এবং তারাও সংবাদপত্র নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, কারণ শিক্ষিতের হার, কারণ দারিদ্র। বাংলা পত্রিকা প্রকাশের শুরু থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বাংলা সংবাদ-পত্রের পাঠকরা অধিকাংশই ছিলেন ধনী বা মধ্যশ্রেণীর এবং প্রাচরও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল নগর এলাকার মধ্যে।[৭১]

এখনও যে, সে অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে প্রচুর-পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল বটে কিন্তু আগেই দেখিয়েছি এর প্রচার ছিল সামান্য। সাধারণ মানুষের খবর কিছু ছিল বৈকি সংবাদপত্রে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ছিলেন করুনার পাত্র। সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী, সংবাদপত্র খুব সীমিত একটি শ্রেণীর মনোভাব প্রকাশ করে মাত্র যারা সরকার দ্বারা শিক্ষিত।[৭২] এর ইঙ্গিত স্পষ্ট, অর্থাৎ তারা শাসক শ্রেণীর স্বার্থের বাইরে যাবে না। এবং তারা যায়ওনি।

আমাদের আলোচ্য সময়ের প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির চূড়ান্ত ঝোঁক ছিল কোনদিকে? ঔপনিবেশিক সমাজ কাঠামোয়, বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র কি ধরনের হয় তা' আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এক্ষেত্রেও তার

ব্যতিক্রম হয় নি। সংবাদপত্রগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে তাদের চিন্তার বৈপরীত্য, ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য, সমাজ কাঠামো অপরিবর্তিত রাখার ইচ্ছা। তাঁদের চিন্তা রক্ষণশীল ছিল না প্রগতিশীল—এ সরলীকরণ না করে বরং আমরা বলতে পারি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন তাঁরা ঐতিহ্যবাদী বুদ্ধিজীবী।

কিন্তু এর বিপরীত দিকটিও আমাদের বিবেচনা করা দরকার। আমরা দেখেছি, শুধু ঢাকা থেকেই নয়, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। নির্জন গ্রামের বাঁশ ঝাড়ের পাশে খড়ো কুটিরে কাঠের আদিম প্রেসে বা উত্তর বঙ্গের ধুলিওড়া মলিন শহর থেকে বা ঢাকার বদ্ধ অন্ধকার নোংরা গলিতে বসে, অক্লান্ত সব কর্মীরা নতুন যুগের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে একটির পর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন যার অনেকগুলির খবর হয়ত আমরা জানি না। অর্থাভাবে, মানহানির মামলা ও বিরুদ্ধবাদীদের হামলায় বা সরকারী বিধিনিষেধের কারণে অনেক সময় পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লোকলাঞ্ছনা, দারিদ্র উপেক্ষা করে তাঁরা কাজ করে গিয়েছিলেন। সমাজে অন্তত একটি শ্রেণীর মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন সচলতার, সচেতন করে তুলেছিলেন অনেক ক্ষেত্রে দেশ এবং নিজেদের সম্পর্কে। ভবিষ্যতের ঔপনিবেশিক সরকার বিরোধী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন—এমন মন্তব্য করাও বোধহয় ভুল হবে না। দেখিয়েছেন পরাজিত হওয়াটা কিছু নয়, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াইটাই হচ্ছে আসল।

২. সভাসমিতি

আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হিসাবেই অনেকেই সভাসমিতির কথা উল্লেখ করেছেন, কারণ সামাজিক সংঘাতেই তার সৃষ্টি। এসব সভাসমিতির মূল নীতি, অনেকের মতে, 'স্বাধীনতা, অবাধ অত্মপ্রকাশের ও পরস্পর মিলনের অধিকার।[৭৩]

ইউরোপে এ ধরনের সভাসমিতির উদ্ভব হয়েছিল রেঁনেসা যুগে। জনসনের সময়কার ইংল্যাণ্ডের কথা বলতে গিয়ে টুরবারতিল বলেছিলেন, ঐ সময় পত্তন হতে থাকে বিভিন্ন সভাসমিতির এবং সংস্কারমূলক কার্যকলাপের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল সেগুলি।[৭৪] সামগ্রিকভাবে, ভারতবর্ষে, উনিশ শতকে, মধ্যশ্রেণীর মতামত সংগঠনে এবং বিভিন্ন সংস্কারমূলক

কার্যকলাপের উদ্যোক্তা হিসেবে এ ধরনের অনেক সভাসমিতি স্থাপিত হয়েছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সামাজিক সংস্কারে। পূর্ব-বঙ্গের মধ্যশ্রেণীর মতামত সংগঠনে, সামাজিক সংস্কার ও সমাজে সচলতা সৃষ্টির ব্যাপারে উনিশ শতকের সভাসমিতিগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইংরেজরাই উদ্যোগী হয়ে বাংলায় সভাসমিতি স্থাপন শুরু করেছিলেন। তারপর এ উদ্যোগ গ্রহণ করে-ছিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী ও বিত্তবানরা।[৭৫]

বাঙ্গালীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সভা আত্মীয়সভা। ১৮১৫ সালে রামমোহন রায় নিজের বাসগৃহে এ সভার পত্তন করেছিলেন। 'আত্মীয় সভায়' শুধু ধর্মই নয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, আলোচনা হত। এরপর ইংরেজদের উদ্যোগেও স্থাপিত হয়েছিল বেশ কিছু সভাসমিতি। তবে বাঙ্গালীদের স্থাপিত সভাসমিতির আলোচ্য বিষয় থেকে বোঝা যায়, বাঙ্গালী সমাজের একটি শ্রেণীর সামনেই তৎকালীন সামাজিক সমস্যাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এ পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, ১৮৩০ থেকে ১৮৪০ এর মধ্যে সামাজিক আলোড়নের ফলে কলকাতায় প্রচুর সভাসমিতি স্থাপিত হয়েছিল এবং সেগুলি ছিল বৈচিত্র্যময়।[৭৬] ঐ সময় স্থাপিত কিছু সভাসমিতির নামই এর প্রমাণ। যেমন, বঙ্গহিত সভা, এংলো-ইণ্ডিয়ান হিন্দু এসোসিয়েসন, বিজ্ঞান দায়িনী সভা, সোসাইটি ফর দি একুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ, মেকানিক্স ইন্সিটিটিউট, টিচার্স সোসাইটি ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য যে প্রথমদিকের স্থাপিত সভাসমিতিগুলির বেশীর ভাগই ছিল, বিনয় ঘোষের ভাষায়, 'বিদ্বৎসমাজ'।[৭৭] এর প্রধান কারণ, শিক্ষিত শ্রেণীর বিকাশ।

উনিশ শতকের সমাজ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল, সভাসমিতি। সভাসমিতিই উনিশ শতকের ভারতকে রাজনীতির মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছিল।[৭৮] তবে বাংলার সভাসমিতিগুলির কাজের ঝোঁক ছিল প্রধানত সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রতি। তবে এগুলির চরিত্র সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা মেলে সরকারী ভাষ্যে—

শিক্ষার বিকাশের ফলেই পুরো দেশজুড়ে (বাংলার) সভাসমিতি স্থাপিত হয়েছে...তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য খানিকটা ধোঁয়াটে তবে এটা স্পষ্ট যে, তাদের প্রধান আগ্রহ শিক্ষা ও সামাজিক বিষয়ে। রাজনীতি ক্ষেত্রে, বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে, মানুষের ইচ্ছা ও স্বার্থই শুধু তুলে ধরার মধ্যে

এগুলির ভূমিকা সীমিত। জাতীয় জীবনে সভাসমিতিগুলি চিন্তার আলোড়ন ও গতিশীলতার সৃষ্টি করেছে।[৭৯]

বৃটিশ শাসকরা চেয়েছিলেন, রাজনীতির কথা চিন্তা না করে সভাসমিতিগুলি যেন, সামাজিক কর্মকাণ্ড নিয়েই বেশী মাথা ঘামায়। ১৮৭৪ সালে 'বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনে'র বার্ষিক সভায় সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল বলেছিলেন—

'এ দেশে আমরা রাজনৈতিক স্বাধিকার দিতে পারি না কিন্তু এ দেশের লোকেরা সামাজিক স্বাধিকার ভোগ করে। এবং এ সামাজিক স্বাধীকার-গুলি বিকশিত হচ্ছে সভাসমিতিরূপে যেখানে সামাজিক প্রশ্নগুলি আলোচিত হতে পারে, যেখানে পণ্ডিত প্রবররা তাদের মতামত দিতে পারেন এবং মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছে তা দিয়ে সরকারকে প্রভাবিত করতে পারেন, প্রভাবি করতে পারেন সামজিক আন্দোলনকে'।[৮০]

কলকাতায় যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৮১৫ সালে, তা অব্যাহত ছিল গোটা উনিশ শতক ধরে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল আরো পরে। উনিশ শতকের চল্লিশ দশক থেকে এ অঞ্চলে সভাসমিতি স্থাপন শুরু হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায়, কলকাতা তার আশেপাশের অঞ্চলকে তেমনভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। বাংলায় সামাজিক রাজনৈতিক বিকাশ হয়েছিল অসমভাবে। কারণ, আমরা দেখছি, পূর্ববঙ্গ বা ঢাকা বাংলায় দ্বিতীয় প্রধান শহর হওয়া সত্বেও এখানে সভাসমিতির বিকাশ হয়েছিল কলকাতার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে। আক্ষরিক অর্থেই পূর্ববঙ্গ ছিল পশ্চাদভূমি।

কিন্তু আমরা যদি মনে করি, পূর্ববঙ্গে গোটা উনিশ শতকেই অবস্থাটা এমন ছিল তা'হলে ভুল হবে। যদি মনে করি, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রশ্নে এখানকার মধ্যশ্রেণী নীরব ছিল তা'হলেও ভুল হবে। কারণ, সভাসমিতির হিসাব ও অন্যান্য তথ্য প্রমাণ করে যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পূর্ববঙ্গের সভাসমিতিগুলি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল এবং এর চরম বিকাশ হয়েছিল ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ এর মধ্যে। তা'ছাড়া, পূর্ববঙ্গের সভাসমিতিগুলি শুধু এ অঞ্চলের প্রধান শহর ঢাকাতেই সীমা-বদ্ধ ছিল না, মফস্বল বা গ্রামাঞ্চলে এর সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না।

ক. পূর্ববঙ্গে সভাসমিতির বিবরণ

পূর্ববঙ্গে প্রথম সভা বা সমিতিটি কখন স্থাপিত হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে ১৮৫৭ সালের আগে, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত সাতটি সভার নাম জানা গেছে। এর মধ্যে প্রাচীনতম হল ১৮৩৮ সালে ঢাকায় স্থাপিত 'তিমিরনাশক সভা'।[৮১] ১৮৩৯ সালে রংপুরে গঠিত হয়েছিল 'রংপুর ইউনাইটেড সোসাইটি'।[৮২] উদ্দেশ্য ছিল, ভূম্যধিকারী ও রায়তদের অধিকার রক্ষা করা। চট্টগ্রামে আইন সম্পর্কিত বিষয়াদি আলোচনার জন্য ১৮৫১ সালে স্থাপিত হয়েছিল 'নৃপনীতি বোধিনী'।[৮৩] ১৮৫১ এবং ১৮৫২ সালে ঢাকায় প্রধানত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য স্থাপিত হয়েছিল 'ঢাকা ক্লাব'[৮৪] এবং 'বেথুন সোসাইটির শাখা।'[৮৫] রংপুর ও দিনাজপুরে ভূম্যধিকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৮৫১ ও ১৮৫৩ সালে স্থাপিত হয়েছিল যথাক্রমে রংপুর ও দিনাজপুর 'ভূম্যধিকারী সভা।'[৮৬]

পূর্ববঙ্গে স্থাপিত সভাসমিতিগুলি তেমন বৈচিত্র্যময় ছিল না পশ্চিমবঙ্গের মত, তবে ১৮৫৭ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে স্থাপিত মোট ৩৭৪ সভাসমিতির খোঁজ পাওয়া গেছে। অধিকাংশক্ষেত্রে সভা-সমিতিগুলি স্থাপনের সময় জানা গেলেও কতদিন সেগুলি টিকে ছিল তা জানা যায় নি তথ্যের অভাবে। শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী ছিল মুসলমানদের সমিতি বা 'আঞ্জুমানগুলি।'

সভাসমিতিগুলি অধিকাংশই স্হাপিত হয়েছিল ঢাকা জেলায়। তারপরই ছিল ময়মনসিংহ এবং নোয়াখালীর স্হান। সভাসমিতির সংখ্যা সবচেয়ে কম ছিল উত্তরাঞ্চলে। সরকারী তথ্য অনুযায়ী ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে স্হাপিত হয়েছিল মোট ২৫৪টি সমিতি।

উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গে যেসব সভাসমিতিগুলি গড়ে উঠেছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার স্হাপনের সময় জানা গেলেও, কতদিন পর্যন্ত একটি সভা বা সমিতি টিকে ছিল তা জানা যায় না। সরকারী তথ্য অনুযায়ী শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, গড়ে প্রায় প্রতিটি সভাই কমপক্ষে পাঁচ বছর টিকে ছিল।[৮৮]

সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, ঐ সময় যেসব সভাসমিতিগুলি গড়ে উঠেছিল সেগুলি প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, শিক্ষা, সমাজোন্নয়নমূলক এবং সম্প্রদায়গত। অবশ্য, সব সভাসমিতির উদ্দেশ্য

বা লক্ষ্যের মধ্যে যে নির্দিষ্টভাবে এসব উল্লিখিত হত তা নয়। সমাজোন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে এ ধরনের উদ্দেশ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যেমন, আত্মোন্নয়ন, নৈতিক উন্নয়ন ও সমাজসেবা। আর শিক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে বক্তৃতা বা রচনা লেখা, জ্ঞানোন্নয়ন বা শিক্ষা, সাহিত্যচর্চা এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ। সম্প্রদায়গত সভাসমিতিগুলি ছিল সম্পূর্ণভাবে একটি সম্প্রদায়ের (হিন্দু বা মুসলমান) সভ্যদের দ্বারা গঠিত এবং তাদের লক্ষ্যও ছিল নির্দিষ্ট। এ ছাড়াও ছিল কিছু সভাসমিতি, যেগুলির উদ্দেশ্য এ বিভাজনের মধ্যে পড়ে না, যেমন, 'হর্টিকালচারাল সোসাইটি' আর লক্ষ্য ছিল কৃষির উন্নতি। বা 'নৃপনীতি বোধিনী' (১৮৫১) বা 'রংপুর ইউনাইটেড সোসাইটি' (১৮৩৯)। আবার অনেক সভার উদ্দেশ্য ছিল মিশ্র, যেমন, সাহিত্যচর্চা ও নৈতিক-উন্নয়ন। এখানে উল্লেখ্য যে, আমার আলোচ্য সময়ে রাজনীতি বিষয়ক সভাসমিতি প্রায় ছিল না বললেই চলে।

যেসব সভাসমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা, সে সবের অধিকাংশই যুক্ত ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। সরকারী উপাত্ত অনুযায়ী যে ২৯৫টি সভাসমিতির খোঁজ পাওয়া গেছে তাদের সিংহভাগের উদ্দেশ্য ছিল এই শিক্ষা।[৮৯] শিক্ষামূলক সভাসমিতির মধ্যে ১২১টির উদ্দেশ্য ছিল বক্তৃতা ও রচনা লেখা, বিশেষ করে ইংরেজী রচনা ও কম্পোজিশন। এরপরই ছিল জ্ঞানোন্নয়ন ও শিক্ষা এবং নৈতিক উন্নয়ন ও সাহিত্যের স্থান। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, সামগ্রিকভাবে ঐ সময় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল শিক্ষার ওপর। এর কারণও সহজবোধ্য, ঔপনিবেশিক সরকারের বিভিন্ন নিম্নস্তরের চাকরি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল দেশীয়দের জন্য এবং সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছিল সরকারী চাকুরি এবং শিক্ষা।

সমাজোন্নয়নমূলক অধিকাংশ সভাসমিতির ভিত্তি ছিল আঞ্চলিক। স্থানীয় সমাজ সেবী, শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত 'ভদ্রলোক'রাই এগুলি গড়ে তুলেছিলেন। সম্প্রদায়গত সমিতিগুলির বেলায়ও এই একই কথা প্রযোজ্য। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, সভাসমিতিগুলির নেতৃত্বে ছিল মধ্যশ্রেণী। পেশাজীবি শ্রেণীর হাতে যার মধ্যে উকিলের সংখ্যাই, অনুমান করছি ছিল বেশী।[৯০] অনেক সময় স্থানীয় জমিদাররাও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এ ধরনের সভার।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল যে সব সভাসমিতি স্বাভাবিক ভাবেই সেগুলির উদ্যোক্তা ছিলেন স্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্ররা। যেগুলি যুক্ত ছিল না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সেগুলিরও উদ্যোক্তা ছিলেন স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তি, সমাজসেবী, প্রবাসী সরকারী কর্মচারী অর্থাৎ এক কথায় যারা শিক্ষিত হয়ে উঠছিলেন পূর্ববঙ্গে বা শিক্ষার মর্ম উপলব্ধি করছিলেন তারাই গড়ে তুলেছিলেন এগুলি।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য, অধিকাংশ সভাসমিতিগুলিই গড়ে উঠেছিল প্রধানত হিন্দুদের উদ্যোগে, ব্রাহ্মরাও সত্তর আশির দশকে উদ্যোক্তা ছিলেন অনেক সভাসমিতির।

শিক্ষামূলক সভাসমিতিগুলিতে সব সম্প্রদায়ের সভ্যই বোধ হয় থাকতেন। তবে স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের সভাসমিতিগুলিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের সভ্য ছিল কম। কারণ, শিক্ষাদীক্ষা বা সম্প্রদায়গতভাবে মুসলমানরা ছিল পিছিয়ে এবং মুসলমান মধ্যশ্রেণীর বিকাশও হয়নি তখন তেমনভাবে।

সমাজোন্নয়ণমূলক সভাসমিতিগুলির ক্ষেত্রেও একথা কমবেশী প্রযোজ্য। তবে এ ধরনের কিছু সমিতির সদস্য ছিলেন হয় হিন্দু বা ব্রাহ্ম বা এগুলি গঠিত হয়েছিল একেবারেই হিন্দু সম্প্রদায়ের সভ্যদের নিয়ে, যেমন বিধবা বিবাহ বা বিবাহ ব্যয় হ্রাস সমিতি। এগুলিকে সম্প্রদায়গত বা সাম্প্রদায়িক বলা যাবে না যদিও এগুলি ছিল হিন্দু ধর্মজাত বা সম্প্রদায়গত সমস্যা। যেমন, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার বর্ণের ভিত্তিতেও গড়ে উঠেছিল কিছু সমিতি। অনীল শীল এ পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছেন, একদিক থেকে দেখতে গেলে কি সব বর্ণই এক ধরনের সমিতি নয়?[৯১]

হয়ত তাই। বগুড়ার 'কন্যাপণ নিবারণী সভা'র [পরে আলোচনা করা হয়েছে] ভিত্তি ছিল পুরোপুরি বর্ণগত। সদ্গোপরা মিলিত ভাবে গড়ে তুলেছিলেন ঐ সমিতিটি। সমিতিটির একটি লক্ষ্য ছিল, বিধবাদের হাটে বাজারে যাওয়া বন্ধ করা, কারণ, তাতে সম্মান হানি হয়। তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গীকে অনেকে হয়ত বলবেন, সামাজিক গতিশীলতার বৈশিষ্ট্য।[৯২] কিন্তু আসলে এধরনের দৃষ্টিভঙ্গীকে কি সামাজিক গতিশীলতা বলা যায়? বরং এ হল, মধ্যশ্রেণীর আধিপত্যবাদের বৈশিষ্ট্য। মধ্যশ্রেণী বা 'ভদ্রলোক'দের ঘরের মেয়েরা হাটে বাজারে যায় না সম্মান

হানির ভয়ে। সদ্‌গোপরা চেয়েছিল তাই অনুকরণ করতে। দ্বিতীয়ত, এর মধ্যে মেয়েদের পুরুষদের ওপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল করে তোলার প্রচেষ্টাও লক্ষ্যণীয়। এ মনোভঙ্গী আবার মেয়েদের ওপর পুরুষদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা মাত্র।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ধরনের সভাসমিতিগুলির কোন আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। সরকারও সাহায্য দিতেন না তাদের বা হয়ত তা সম্ভবও ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য ধর্মস্ব পাওয়া যেত। তবে তার পরিমাণ ছিল কম, যেমন, ঢাকা জেলার 'মায়াপাড়া বিদ্যোন্নতি সাধিনী'র (১৮৫৮) ধর্মস্বের পরিমাণ ছিল প্রায় সাত টাকা।[৯৩] 'হাসাড়া (ঢাকা জেলায়) শুভসাধিনী সভা'র (১৮৭৯) সভ্য ছিল ২০০ (পুরুষ ঃ ৭৫, কিশোর ঃ ১২৫) কিন্তু এর বার্ষিক আয় ছিল মাত্র চার আনা।[৯৪] এ পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, মধ্যশ্রেণীতো বটেই তবে গ্রামে যারা একেবারে নিঃস্ব থেকে একটু ওপরে, অথচ নতুন যুগের শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী তারাই এগিয়ে এসেছিলেন এগুলি গড়তে। অবশ্য আরেকটি প্রশ্ন তোলা যেতে পারে এখানে, শুধু কিশোররা যেখানে সভা গড়ে তুলেছিল সেখানে হয়ত চাঁদা প্রদানের প্রশ্নটি ওঠেনি।

অন্যদিকে সমাজোন্নয়ণের জন্য যেসব সভাসমিতি গড়ে উঠেছিল তাদের আর্থিক ভিত্তি ছিল খানিকটা ভালো। যেমন, 'বিক্রমপুর শুভকরী সভা' (১৮৬৭)। এর বার্ষিক আয় ছিল একশো রুপী।[৯৫] 'ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা' (১৮৭০) সরকারী সাহায্য পেত দেড়শো রুপী আর চাঁদা বাবদ আয় হত আরো দেড়শো রুপী।[৯৬] 'ঢাকা ফিলানথ্রপিক সোসাইটি'র (১৮৭১) আয় ছিল দুশো ষোল রুপী।[৯৭] এখানে অবশ্য একটি কথা উল্লেখ্য, এ ধরনের সব সভাসমিতিই আবার সাহায্য পেত না। যাদের কর্মব্যপ্তি ছিল খানিকটা বিস্তৃত এবং যাদের ওপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ছিল প্রসন্ন তারাই পেত এ ধরনের সরকারী সাহায্য। এ ছাড়া চাঁদা বাবদ সব সভাসমিতির আয়ই ছিল নগণ্য।

শিক্ষামূলক সভাসমিতিগুলির প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ছাত্রদের শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা ও তাদের জ্ঞানস্পৃহা বৃদ্ধি করা। কিন্তু সমাজোন্নয়নমূলক সভাগুলি কি কাজ করত ?

নৈতিক উন্নয়ন, মদ্যপান নিবারণ, বাল্য বিবাহ রোধ-এ ধরনের অনেক উদ্দেশ্য ছিল সমাজোন্নয়নমূলক সভাসমিতির। তবে এ ধরনের

সভার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মধ্যশ্রেণীকে নারীমুক্তি সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। নারীমুক্তির মানে ছিল অবশ্য স্ত্রী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব প্রদান। এ ধরনের যে কটি সভার তথ্য সংগ্রহ করেছি, কমবেশী প্রায় সবগুলির উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল স্ত্রী শিক্ষা। নারীমুক্তি সম্পর্কে উদ্যোক্তারা কি বুঝতেন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেকালের একজন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী (ব্রাহ্মসমাজের একাকালীন কর্মী) ও ঢাকা 'শুভসাধিনী সভা'র একজন উদ্যোক্তা কালীপ্রসন্ন ঘোষের লেখায়—'পুরবধূদিগকে, ন্যায় এবং ধর্ম্মের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া প্রগাঢ় এবং প্রসারিত শিক্ষা প্রদান কর, সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দাও, তাহাদিগের বুদ্ধি, বিবেক এবং মানসিক অপরাপর শক্তি যাহাতে সুন্দররূপে বিকশিত হইতে পারে, তৎপক্ষে হৃদয়ের সহিত যত্নশীল হও; সমাজের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে যতদূর স্বাধীনতা তাহারা সম্মানের সহিত ভোগ করিতে পারে তাহারাই তাহার বিচার করিবে।'[১৮]

এ সমিতিগুলি মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠা করত স্কুল, পাঠশালা বা এক ধরনের বার্ষিক পরীক্ষা নিত মেয়েদের, বিতরণ করত পুরস্কার। যেমন, 'ত্রিপুরা হিতৈষিনী সভা' একজন মহিলাকে বৃত্তি প্রদান করেছিল কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়ার জন্য। ১৮৯৬ সালে এরা ১৬৬ জন মহিলার পরীক্ষা গ্রহণ করেছিল যার মধ্যে পাশ করেছিল ১৫৩ জন। 'সিলেট ইউনিয়ন' একই বছর ৬৩৭ জন মহিলার আবেদনপত্র পেয়েছিল পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য। 'ময়মনসিংহ সম্মিলনী সভা' যে পরীক্ষা নিয়েছিল তাতে পাশ করেছিল ১৪২ জন।[১৯]

এখানে, প্রথমে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নমূলক সভা-সমিতির বিবরণ দেব এবং তারপর আলোচনা করব সম্প্রদায়গত সভাসমিতি নিয়ে।

খ. শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নমূলক সভা

বিক্রমপুর হিতসাধিনী সভা (১৮৭১)

বিক্রমপুরে স্থাপিত এই সভার সাতজন উদ্যোক্তার মধ্যে চারজন ছিলেন উকিল, একজন পত্রিকার তত্ত্বধায়ক এবং অপর জন ছোট আদালতের কেরানী। উদ্দেশ্য ছিল, বিক্রমপুরের 'বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিধান, পূর্ত্তকার্য্য অর্থাৎ রাস্তা, খাল ইত্যাদির

বিস্তার ও সংস্কারণ, কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্যের উন্নতি সাধন, রাজকার্য্য পর্যালোচনা ও রাজকীয় সাহায্য প্রার্থনা ও সামাজিক হিত পর্য্যালোচনা (রীতি নীতির উৎকর্ষ সাধন)।'[১০০] প্রথম অধিবেশনেই বার্ষিক একটাকা চাঁদা দিয়ে ৭৮ জন সভ্য হয়েছিলেন।

ঢাকা জনসাধারণ সভা (১৮৭১)

সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, 'এই প্রদেশের দুরবস্থা সংশোধন, অভাব মোচন এবং সর্ব্বপ্রকার হিত সাধনের চেষ্টা।' সদস্য পদ উন্মুক্ত ছিল পূর্ববঙ্গের সকল প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্যে। সভার কার্যনির্বাহী চব্বিশ জন সদস্যের মধ্যে একজন ছিলেন মাত্র মুসলমান।[১০১] এর প্রধান উদ্যোক্তারা ছিলেন উকিল।[১০২] জন সাধারণ সভা কালক্রমে রাজনৈতিক বিষয়াবলীতে দৃষ্টি বেশী দিয়েছিল এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

সুহৃৎ সভা (১৮৮০)

এ সভা স্থাপিত হয়েছিল ফরিদপুরে। সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রী শিক্ষার বিকাশ। সভার সদস্য সংখ্যা ছিল ১৮৮৪-৮৫ সালে ৫১৮ জন। সরকার অনুদান দিতেন ৭২ টাকা এবং চাঁদা থেকে আয় ছিল ১৭৯ টাকা।[১০৩] সভা স্থাপনের তৃতীয় বছর জানা যায় যে, সভার উত্তরোত্তর উন্নতি হয়েছিল। মেয়েদের জন্যে সভা আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা যে ধরনের হয় সে ধরনের পরীক্ষা নেওয়া শুরু করে। দ্বিতীয় বর্ষের রিপোর্ট অনুযায়ী ২২৫ জন পরীক্ষা দিয়েছিল এবং তারমধ্যে প্রথমবিভাগে পাশ করেছিল পনের জন।[১০৪]

গৈলা ছাত্র সম্মিলনী সভা (১৮৮১)

বরিশালের গৈলা গ্রামে ১৮৮১ সালে স্থাপিত হয়েছিল, 'গৈলা হিতসাধিনী' নামে একটি সভা যার উদ্যোক্তরা ছিলেন, 'বৃদ্ধ সম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণই।'[১০৫] সভাটি স্থাপন করা হয়েছিল, গৈলার নৈতিক উন্নতি স্কুল, টোল ও পাঠশালার বৃদ্ধি সাধন, সুরাপান নিবারন, চিকিৎসালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, রাস্তাঘাট প্রস্তুত করা এবং অন্যান্য হিতকর কার্য্য সাধনের উদ্দেশ্যে।'[১০৬]

এই সভা রোড সেস ফাণ্ড থেকে দু'টি রাস্তা ও একটি খাল তৈরীর জন্যে টাকা পেয়েছিল। কিন্তু খুব শিগ্রীই পরস্পরের স্বার্থ নিয়ে মামলা মোকদ্দমা শুরু হয়। তা'ছাড়া 'নব্য সম্প্রদায়ের আর্তনাদ বৃদ্ধদের কর্ণে স্থান পাইত না'।[১০৭] ফলে ১৮৮১ সালে তরুণরা ঐ সভা থেকে বেরিয়ে এসে স্থাপন করেছিলেন গৈলা ছাত্র-সম্মিলনী সভা। ঢাকায়ও এর শাখা ছিল।

সভার প্রচারপত্র অনুযায়ী, দু'বছরে সভা যা করেছিল তা'হল—

১. পাঠশালার ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করেছিল।

২. কলকাতার বাকরগঞ্জ হিতৈষিণী সভার নিয়ম ও পাঠ্যানুসারে পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে ক্লাশ খুলেছিল।

৩. একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল যার ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২৯।

৪: স্হাপন করেছিল একটি পাঠাগার।

৫. এ ছাড়া, সভার এক বিশেষ অধিবেশনে সভ্যরা প্রতিজ্ঞা করেছিল তারা কন্যাপন গ্রহণ করবে না এবং বংশজ ও কুলীন নির্ব্বিশেষে সৎপাত্রে কন্যাদান করবে।[১০৮]

কন্যাপন নিবারিনী সভা (১৮৭১)

এই সভা স্হাপন করেছিলেন রাজশাহী ও বগুড়া জেলার সদগোপরা। প্রথমে সমিতি স্হাপনের বিষয় নিয়ে ১২৫টি গ্রামের প্রধান বা মণ্ডলদের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছিল এবং তারপর ৮০টি গ্রামের প্রতিনিধি নিয়ে স্হাপিত হয়েছিল এ সভা।

এ সভা প্রথমে নজর দিয়েছিল বিধবাদের দিকে। বিধবারা এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে দুধ বিক্রি করতে যায় এবং এতে নানাজন নানা কথা বলে ফলে সদগোপদের সম্মান হানি হয়। সুতরাং ঠিক করা হয়েছিল, বিধবারা আর হাটে বাজারে নিজেদের জিনিষপত্র বিক্রি করতে পারবেন না। তবে নিজ নিজ গ্রামে তারা দুধ দই বিক্রি করতে পারবেন। এ ছাড়া বারোয়ারী পুজোয় তারা যেতে পারবেন না, গোবর কুড়োতে পারবেন না রাস্তা বা মাঠ থেকে। যদি কোন বিধবার জীবন-ধারনের কোন উপায় না থাকে তবে তিনি থাকবেন আত্মীয় স্বজনের আশ্রয়ে। আত্মীয়-স্বজন না থাকলে অর্থাৎ জীবীকার কোন উপায় না থাকলে সভার কাছে আবেদন জানালে সভা তখন এ ব্যাপারে সাধ্যমত

চেষ্টা করবে।[১০৯]

এ ছাড়াও এ সভা কন্যাপনের ব্যাপারে কিছু নিয়ম করেছিল—

১. কোন পক্ষ কোন রকম পণ নিতে পারবে না।

২. যদি কন্যাপক্ষের কনে উঠিয়ে নেওয়ার সঙ্গতি না থাকে তবে বরপক্ষ তার বন্দোবস্ত করবেন।

৩. চিঠির মারফত সম্বন্ধ ঠিক হবে। এক স্ত্রী থাকাকালীন আরেক স্ত্রী গ্রহণ করলে প্রথম স্ত্রীকে নগদ তিনশো টাকা দিতে হবে।[১১০]

এ সভা আরো নিয়ম করেছিল, সদগোপদের মধ্যে কেউ এ নিয়ম ভাঙলে তাকে জাতিচ্যুত করা হবে বা এ কারণে 'স্বজাতি সভার প্রধান বা প্রামানিকগন' যে অর্থ জরিমানা করবে তা দিতে হবে। এবং কেউ তা না মানলে, 'তাহার সন্তান সন্ততিগণ চিরকালের জন্য স্বজাতি মধ্যে সামাজিক আবদ্ধ থাকিবেন। এইরূপে যিনি আবদ্ধ থাকিবেন তাঁহার সহিত যিনি আহারাদি ব্যবহার করিবেন তিনিও আবদ্ধ এবং স্বজাতি সভায় দণ্ডনীয় হইবেন'।[১১১]

ময়মনসিংহ সাহিত্য সভা (১৯০১)

'মাতৃভাষার সেবাব্রত শিরে লইয়া' ১৯০১ সালে স্থাপিত হয়েছিল 'ময়মনসিংহ সাহিত্য সভা'। সভার উদ্দেশ্য ছিল—

১. 'আরতি' নামক সাহিত্য পত্রটির 'উন্নতি বিধান ও নিয়মিত প্রচার'।

২. ময়মনসিংহ জেলার প্রাচীন তত্ত্ব ও ইতিহাস সংগ্রহ।

৩. ময়মনসিংহের প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের হস্ত লিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ ও প্রচার।

৪. সাহিত্য আলোচনা।

এই সমিতির সভাপতি ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন সাহিত্যিক কেদারনাথ মজুমদার।[১১২]

উপরে যে দু'ধরনের সভাসমিতির কথা আলোচনা করলাম তারা সমাজের কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল ?

শিক্ষামূলক সভাসমিতিগুলি মনে হয় স্থানীয়ভাবে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করতে পারতো স্থানীয় কিশোর বা তরুণদের। শুধু শিক্ষা

নয়, জীবন-যাপনে শৃঙ্খলা, (বিশেষ করে যেসব সভা ছিল ব্রাহ্ম নিয়ন্ত্রণে) সমাজ সেবা প্রভৃতিতেও এগুলি উদ্বুদ্ধ করতো। এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতো স্কুল/কলেজ বা স্থানীয় ছাত্রদের ওপর। এ প্রসঙ্গে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে গড়ে তোলা 'মনোরঞ্জিকা সভা'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীনাথ চন্দ, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রমুখ যখন ঐ স্কুলে পড়তেন তখন গড়ে তুলেছিলেন এই সভাটি। শ্রীনাথ চন্দ লিখেছেন, 'সভার কার্য্যারম্ভে ঈশ্বর স্তোত্র ও প্রার্থনা পঠিত হইত। সকলকেই প্রবন্ধ লিখিতে এবং উপস্থিত বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইত। কেবল সভার নির্দিষ্ট সময়ে উহার কার্য্য আবদ্ধ থাকিত না, সভ্যদের স্বভাব-চরিত্র, রীতিনীতি এবং পড়াশুনা সম্বন্ধে গৃহেও অনুসন্ধান করা হইত।'[১১৩] স্কুলে কোন ছেলে অবাধ্য বা পড়াশোনায় অমনোযোগী হলে শিক্ষক প্রশ্ন করতেন, 'তুমি কি মনোরঞ্জিকা সভার সভ্য নও?'[১১৪]

সমাজোন্নয়নমূলক সভাসমিতিগুলি সামগ্রিকভাবে সমাজে হয়ত তেমন কোন কিছু করতে পারেনি তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সীমিত অর্থে সফলতা অর্জন করেছিল। যেমন, মদ্যপান নিবারণ, বিয়ের ব্যয় হ্রাস, কন্যাপণের বিলুপ্তি এবং কুলীন বিয়ে রোধেও সভাসমিতিগুলি প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। বিশেষভাবে, মদ্যপান নিবারণের জন্যে ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুরে স্থাপিত হয়েছিল সমিতি।[১১৫] এমন কি 'গৈলা ছাত্র সম্মিলনীর' মত অজ পাড়াগাঁয় স্থাপিত একটি সভাও গৈলা বাজার থেকে সরিয়ে দিতে পেরেছিল একটি মদের ভাটি। ঢাকায় এবং ময়মনসিংহে বিয়ের ব্যয় হ্রাসের জন্য ১৮৯০ সালে স্থাপিত হয়েছিল দু'টি সভা।[১১৬] কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে আন্তর্বিবাহ, কুলীন প্রথা এবং বাল্য বিবাহ রোধ ও বিধবা বিবাহ প্রচলনে সমিতিগুলি খুব একটা কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি।[১১৭] এর কারণ, এগুলি প্রধানত যুক্ত ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দুরা চেয়েছিল নিজেদের সনাতন ধর্ম অটুট রেখে এক আধটু সংস্কার করতে।

ব্রাহ্মদের উদ্দেশ্যও পূর্বোক্তদের থেকে খুব একটা পৃথক ছিল না। নারী মুক্তির ব্যাপারে, বিশেষ করে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে মধ্যশ্রেণীর মতামত সংগঠনে তারাও বেশ সহায়তা করেছিল।

কিন্তু নব্বই দশকের দিকে পূর্বোক্ত সভাসমিতিগুলির ঝোঁকের

খানিকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এর কারণ, হিন্দু ও মুসলমান পুণর্জাগরণ।

ধর্মীয় এই পুণর্জাগরণ প্রভাবান্বিত করেছিল সভাসমিতিগুলিকে। নৈতিক উন্নয়নের ওপর তখন গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল বেশী। ব্রাহ্মদেরও তখন দেখা গেছে, গোঁড়া হিন্দুদের মত, ঢাকা, টাঙ্গাইল ও বরিশালে নৈতিক উন্নয়নের জন্য সভা প্রতিষ্ঠা করতে।[১১৮]

নব্বই দশকের দিকে গঠিত ছাত্র সভাগুলিকেও প্রভাবিত করেছিল এই ঝোঁক। ছাত্ররাও ধারণা করেছিল, নৈতিক চরিত্র সমুন্নত রাখলে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যেমন, চাঁটগায় ছাত্ররা শহরের কেন্দ্রস্হল থেকে একবার একটি পতিতালয় স্হানান্তরিত করেছিল এবং সভ্যরা প্রতিজ্ঞা করেছিল মদ্যপান থেকে তারা বিরত থাকবে।[১১৯] এ সব বিষয়ে বক্তৃতা দিতেও ভালোবাসতো ছাত্ররা।

কিন্তু মনে হয়, উনিশ শতকের বাংলাদেশে বা পূর্ববঙ্গে এ ধরনের সভাসমিতিগুলির প্রধান অবদান ছিল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে মধ্য শ্রেণীর মতামত সংগঠন। এ জন্য বিভিন্ন সভাসমিতি বিভিন্ন সময় প্রকাশ করেছিল সংবাদ-সাময়িকপত্র। এখানে এধরনের কয়েকটি মুখপত্রের নাম উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে—

'হিন্দু হিতৈষিণী' (১৮৬৫, হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিণী সভা, ঢাকা), 'শুভ-সাধিনী' (১৮৭১, শুভাসাধিনী, ঢাকা), 'সারস্বতপত্র' (১৮৮১, সারস্বত সমাজ, ঢাকা), 'উদ্যোগ বিধায়িনী' (১৮৬৩, উদ্যোগবিধায়িনী, পাবনা), 'মনোরঞ্জিকা' (১৮৬০, মনোরঞ্জিকা সভা, ঢাকা), 'সংস্কার সংশোধিনী' (১৮৬০, জ্ঞানমিহির বিকাশিনী, ঢাকা), 'মহাপাপ বাল্য বিবাহ' (১৮৭৩, বাল্য বিবাহ নিবারিণী, ঢাকা), 'হিন্দু রঞ্জিকা' (১৮৬৬, ধর্ম্মরক্ষিণী সভা, বোয়ালিয়া), 'নূর অল ইমান' (১৯০০, নূর অল ইমান সভা, রাজশাহী), 'কোহিনূর' (১৮৯৯, কোহিনূর সাহিত্য সভা, ফরিদপুর)।

গ. সম্প্রদায়গত সভাসমিতি

সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সভা-সমিতিগুলি নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, এগুলির চরিত্র ছিল পূর্বোক্তগুলি থেকে ভিন্ন। শিক্ষা বা সমাজোয়নমূলক সভাসমিতিগুলিতে কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য থাকলেও বলা যাবেনা যে, সম্পূর্ণভাবে

সেটি সম্প্রদায়গত। এ কথা সত্যি যে, বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপ সমিতি বা কায়স্থ হিতৈষিণী সভার মত কিছু সভাসমিতি গড়ে উঠেছিল একটি বিশেষ সম্প্রদায় বা বর্ণের সভ্যদের নিয়ে। কিন্তু সেগুলির কর্মকাণ্ডের ঝোঁক ছিল না ধর্মীয় ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার। অন্যদিকে, আলোচ্য সভাসমিতিগুলি ছিল একটি বিশেষ সম্প্রদায়জাত এবং এগুলির ঝোঁক ছিল প্রধানত ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষার দিকে। শুধু তাই নয়, নামকরণও এগুলিকে চিহ্নিত করে আলাদাভাবে। যেমন, হিন্দু সম্প্রদায়ের এ ধরনের সভাগুলির আগে যুক্ত থাকতো 'হিন্দু' অথবা পরে 'ধর্মসভা' বা 'ধর্মরক্ষিণী সভা'। মুসলমান সম্প্রদায়ের সভাসমিতিগুলির আগে যুক্ত থাকতো 'মুসলমান' বা 'আঞ্জুমান' এবং অনেক ক্ষেত্রে পরে 'ইসলামিয়া' শব্দটি।

'হিন্দু ধর্মরক্ষিণী' সভাগুলির উদ্ভব হয়েছিল ষাটের দশকে যখন বিকশিত হচ্ছিল ব্রাহ্ম আন্দোলন। ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার ফলই ছিল সেগুলি। শ্রেণী ও সম্প্রদায়গত আধিপত্য রক্ষার উদ্দেশ্যেই হিন্দু মধ্যশ্রেণীর গোঁড়া সভ্যরা গড়ে তুলেছিলেন এ ধরনের সভাসমিতি।

মুসলমান সভাগুলির বিকাশ হয়েছিল আশির দশকে। সামান্য ভাবে হলেও তখন বিকাশ শুরু হয়েছিল মুসলমান মধ্যশ্রেণীর. উপলব্ধি করেছিল তারা শিক্ষার গুরুত্ব। ১৮৭০ সালে সরকারী শিক্ষানীতির পরিবর্তনও সহায়তা করেছিল তাদের। পূর্ববঙ্গের মুসলমান মধ্যশ্রেণী তখন হয়ত সম্প্রদায়গতভাবে নিজেদের assert করতে চাচ্ছিল। যার ফলে এখানে একটি দু'টি করে আঞ্জুমান বা মুসলমান সম্প্রদায়ের সভা গড়ে উঠেছিল।

সম্প্রদায়গত ভাবে গড়ে ওঠা ব্রাহ্ম ও বৌদ্ধদের মাত্র তিনটি সভার খোঁজ পাওয়া গেছে 'সঙ্গত সভা,' 'ব্রাহ্মিকা সভা' (ময়মনসিংহ ১৮৭৭) এবং 'বৌদ্ধ সভা'।

এখানে প্রথমে কয়েকটি 'ধর্মসভা' সম্পর্কে (সঙ্গে সঙ্গত ও বৌদ্ধ সভা সম্পর্কেও) তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলির বিবরণ এবং তারপর 'আঞ্জুমান'গুলির ওপর বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করবো। 'আঞ্জুমান'গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার কারণ, সম্প্রদায়গতভাবে মুসলমানরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং 'আঞ্জুমান'গুলির ওপর তুলনামূলকভাবে আলোচনা হয়েছে কম।

হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিনী সভা (১৮৬৫)

ব্রাহ্ম আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলে, ঢাকার প্রভাবশালী উকিল কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল 'হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষিণী সভা'। কাশীকান্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন ব্রাহ্মদের প্রতি কারণ তাঁর দু'পুত্র গিয়েছিলেন ব্রাহ্ম হয়ে। এই সভা গঠনে কাশীকান্তকে সহায়তা করেছিলেন জমিদার দীননাথ মুন্সী (ভাওয়াল), জগবন্ধু বসু (বৈকন্ঠপুর) এবং তারা প্রসাদ রায়, উকিল বরদাকিঙ্কর রায়, নাজির বঙ্গচন্দ্র বসু এবং মৃত্যুঞ্জয় মুন্সী, গোকুল মুন্সী, লক্ষীকান্ত মুন্সী ও ত্রিলোচন চক্রবর্তী। এই সভা থেকে প্রকাশিত হত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা—'হিন্দুহিতৈষিণী'।[১২০]

সঙ্গত সভা (১৮৬৫)

১৮৬৫ সালে কেশবচন্দ্র সেন ঢাকায় এলে, কলকাতার অনুকরণে ঢাকার ব্রাহ্মরা গঠন করেছিলেন 'সঙ্গত সভা'। দীননাথ সেন, বঙ্গ চন্দ্র রায় ছিলেন সভার প্রধান উদ্যোক্তা। প্রসন্নকুমার রায়, কালীনারায়ণ গুপ্ত, কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত, ভুবনমোহন সেন প্রমুখ ছিলেন এর সভ্য। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার এবং 'চরিত্রের উন্নতি সাধন ও বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ' করতে লোকদের শিক্ষাদান করাই ছিল সভার উদ্দেশ্য।[১২১]

বৌদ্ধ সমিতি (১৮৮৪)

'চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি' ছিল চট্টগ্রামবাসী বৌদ্ধদের সমিতি। 'ধর্ম শিক্ষা ও সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য' ১৮৮৪ সালে এই সভা প্রকাশ করেছিল একটি মাসিক পত্রিকা 'বৌদ্ধ বন্ধু'।[১২২]

ঘ. আঞ্জুমান

বাংলায় মুসলমানদের স্হাপিত প্রথম সমিতি স্হাপিত হয়েছিল কলকাতায়—'মহামেডান এসোসিয়েসন,' যার চরিত্র ছিল খানিকটা রাজনৈতিক। ১৮৫৬ সালে স্হাপিত এই সমিতি ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় সহায়তা করেছিল সরকারকে। তবে এটা বেশী দিন টিকে থাকে নি।

১৮৬৩ সালে আবদুল লতিফ স্হাপন করেছিলেন 'মহামেডান লিটা-

রেরী সোসাইটি'। প্রয়োজন হলে সরকার এই সমিতি থেকে মতামত নিতেন, কারণ মুসলমানদের এই একটি মাত্র সমিতিই ছিল। ১৮৭৭ সালে আমীর আলী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'সেন্ট্রাল মহামেডান এসোসিয়েসন'। বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে মতামত রাখতো এই সমিতি। প্রথমোক্তটি থেকে শেষোক্তটি ছিল খানিকটা প্রগতিশীল এবং অভিন্ন বাংলায় এর খানিকটা প্রতিষ্ঠাও ছিল। ১৮৮৮ সালের এক হিসেবে দেখা যায় বাংলায় এর শাখা ছিল ৪৪টি এবং এর মধ্যে পূর্ববঙ্গে ছিল আটটি।

আশীর দশকে বাংলাদেশে বিকশিত হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের স্থাপিত সমিতিগুলি। এদের কারো কারো সঙ্গে কলকাতার কোন কোন সংস্থার যোগ ছিল বটে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলির রূপ ছিল আঞ্চলিক। এক কথায় 'আঞ্জমান' বা মুসলমানদের সভাসমিতিগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানদের বিদ্যমান অবস্থার উন্নতি এবং স্থানীয় প্রয়োজন পূরণ।[১২৩] অবশ্য প্রায় সব ধরনের সভাসমিতিরই একটি লক্ষ্য ছিল স্থানীয় প্রয়োজন পূরণ।

এ ধরনের আঞ্জুমানগুলি প্রধানত গড়ে উঠেছিল স্থানীয় ক্ষুদ্র জমিদার, উকিল, মোক্তার বা স্থানীয় সরকারী অথবা মাদ্রাসা শিক্ষকদের উদ্যোগে। এক কথায় স্থানীয় এলিটদের সাহায্যে। এভাবে আবার শিক্ষিত মুসলমান ও মৌলবীদের মধ্যে মেলবন্ধন সম্ভব হয়েছিল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'আঞ্জুমান'গুলি নিয়ন্ত্রণ করতেন সরকারী কর্মচারী বা ধনী ব্যক্তিরা।[১২৪] এখানে এখন দু'টি মুসলমান সমিতির বিবরণ দেব।

ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী (১৮৮৩)

১৮৮৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে ঢাকা শহরে স্থাপিত হয়েছিল এই 'সম্মিলনী'। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন আবদুল মজিদ। 'বঙ্গ দেশবাসী মুসলমানগণের হিতসাধন'ই ছিল এর 'মুখ্যোদ্দেশ্য'। তবে 'আপাততঃ এই সভা এতদ্দেশীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার করিতে যত্নবান হইবেন'।[১২৫]

সভার উদ্যোক্তারা প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য তালিকা নির্বাচন করে তদনুসারে মেয়েদের পরীক্ষা নেওয়ার বন্দোবস্ত করেছিল। পরীক্ষা নেওয়া হত বাংলা এবং উর্দুতে। প্রথম বছর বাংলা ও উর্দুতে

পরীক্ষা দিয়েছিল ২৩ ও ১৪ জন এবং উত্তীর্ণ হয়েছিল যথাক্রমে ২২ ও ১২ জন। মেয়েরা নিজ নিজ বাসায়, অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা দিতে পারতেন।[১২৬]

প্রথম বছরের রিপোর্ট অনুসারে জানা যায়, সাধারণ সভ্যের মাসিক চাঁদা ছিল দু'আনা। সম্মিলনী মাসিক সভার বন্দোবস্ত করেছিল। অধিবেশন হত ঢাকা কলেজ অথবা মাহুতটুলির মুন্সী নূর বক্সের বাসায় সম্মিলনীর দফতরে।[১২৭]

সভার তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্টেও দেখি শিক্ষার কথাই ঘুরে ফিরে আসছে। 'বর্তমান সময় বঙ্গে'র মুসলমান অধিবাসীগণের অবস্থা যাহাতে সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইতে পারে, যাহাতে তাহাদের অসহ্য দারিদ্র-যন্ত্রণা বিদূরিত এবং সামাজিক বিশৃংখলা অপনীত হইতে পারে, যাহাতে তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষায় ব্রতী হইয়া জ্ঞানালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইতে পারেন, যাহাতে তাঁহারা বঙ্গের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত সমকক্ষতা করিতে পারেন এই সকল গুরুতর কার্য্য সম্পাদন জন্য মুসলমান সম্মিলনী কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।' তবে ধর্মশিক্ষার ওপর গুরুত্ব অরোপ করেছিল সমিতি। বাংলা পাঠ্য বইয়ের অভাব অনুভব করে 'সম্মিলনী' মোহাম্মদ রোয়জুদ্দীন আহমদকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল 'তোহফাতুল মোসলেমিন' (১২৯০)।[১২৮]

এই সমিতির উদ্যোক্তাদের অধিকাংশই ছিলেন শিক্ষিত যুবক, জমিদার, মোক্তার বা মাদ্রাসা শিক্ষক। কিছু হিন্দু ভদ্রলোকও ছিলেন এ সভার সম্মানিত সদস্য এবং তাঁরা অর্থ সাহায্যও করতেন। সমিতির সাহায্য তালিকায় যে সব মুসলমানের নাম আছে তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন জমিদার, মোক্তার এবং ঢাকা মাদ্রাসার শিক্ষক। বারোজন মুসলমান জমিদারের নাম ছিল তালিকায় কিন্তু তাঁদের দানের পরিমাণ ছিল ২, ৫, ১০ অথবা ১৫ টাকা মাত্র।[১২৯]

১৮৮৫ সালে 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র তৃতীয় বার্ষিক পুরস্কার প্রদান সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ পুরস্কার সভা সম্পর্কে একটি পত্রিকা মন্তব্য করেছিল—"...১৮৮৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কতকগুলি মুসলমান ছাত্র মিলিয়া যখন একটা ক্ষুদ্র সভা করে, কে মনে করিয়াছিল মাত্র তখন তিন বৎসর পরে সেই সভা হইতে ৮০/৯০ টাকা মূল্যের নানারূপ সুন্দর দ্রব্য মুসলমান বালিকাদিগকে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে,

কলিকাতা, হুগলি, ঢাকা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালী, বরিশাল, ফরিদপুর, ও ময়মনসিংহ ইত্যাদি স্থান হইতে মুসলমান বালিকাগণ সেই সভার অধীনে পরীক্ষা দিবে ?"[১৩০]

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ঢাকার নর্থব্রুক হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় 'মহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন' নামে একটি নতুন সংগঠন স্থাপন করলে 'ঢাকা মুসলমান সম্মিলনী' লোপ পেয়েছিল।'[১৩১]

প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, সভাপতি ছিলেন হিম্মত আলী, সম্পাদক, আবদুল মজিদ, সহকারী সম্পাদক হেমায়েত উদ্দিন আহমদ ও জোহাদর [জাহেদুর] রহিম জহিদ [জাহিদ], কোষাধ্যক্ষ মকবুল আহমদ এবং মফস্বল প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন আজাদ আলী, মদস্বের [মোদাস্‌সের] হোসেন, সৈয়দ হজরত আলী, মোহাম্মদ ফাজেল, মওয়াজেস আলী ও মোহাম্মদ সাদেক। ওয়াকিল আহমদ তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন, হিম্মত আলী হুগলী কলেজ থেকে ১৮৮১ সালে বি, এ, এবং ১৮৮৬ সালে বি, এল পাশ করেছিলেন ঢাকা কলেজ থেকে। নোয়াখালীর আবদুল মজিদ বি, এ পাশ করেছিলেন ঢাকা কলেজ থেকে ১৮৮৪ সালে। হেমায়েত উদ্দিনের বাড়ী ছিল বরিশালে এবং ঢাকা কলেজ থেকে বি, এ ও বি, এল পাশ করেছিলেন যথাক্রমে ১৮৮৬ ও ১৮৯১ সালে। ঢাকা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ওবেদুল্লাহ ওবেদীর ছেলে জাহিদুর রহিম ১৮৮৬ সালে বি, এ পাশ করেছিলেন ঢাকা কলেজ থেকে। আবদুল আজিজও পাশ করেছিলেন একই সময়ে। এঁরা সবাই ছিলেন 'সম্মিলনী'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

১৮৮৮-৮৯-এ সমিতির সভাপতি ছিলেন ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আবুল খায়ের মোহাম্মদ সিদ্দিক, সহকারী সভাপতি জমিদার কাজী রাজিউদ্দিন এবং স্পেশাল সাব-রেজিস্ট্রার সৈয়দ আওলাদ হোসেন, সম্পাদক জজকোর্টের উকিল, আবদুল মজিদ, সহকারী সম্পাদক, ঢাকা মাদ্রাসার শিক্ষক অলিওর রহমান এবং সদস্য ছিলেন সৈয়দ আমজাদ আলী (পার্সোনাল এসিসট্যান্ট, ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল), আবদুস সালাম (ঢাকা মাদ্রাসার শিক্ষক), অধ্যাপক হাফেজ আবদুল্লাহ, অধ্যাপক আবদুল মুনিম, আবদুল ওয়াজ্রিদ (মাদ্রাসার শিক্ষক), জহুরুল হক (মুসলমান রেজিস্ট্রার, কাজী) ও মোহাম্মদ হাসান (রেজিস্ট্রার অফিসের প্রধান কেরানী)।[১৩১ক]

আঞ্জুমনে নূরল ইসলাম (১৮৯৯)

যশোরের মনোহরপুর গ্রামে মহাতাব উদ্দীন নামে জনৈক ডাক্তারের উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল 'শুভকরী' নামে একটি সভা। 'শুভকরীর' নাম পরিবর্তন করে পরে রাখা হয়েছিল 'প্রভাকর'। ১৯০২ সালে 'পরম ভক্তিভাজন মোসলেমকুল শিরোরত্ন যশোহরের ডিস্ট্রিক ও সেসন জজ সৈয়দ নূরল হোদা সাহেবের যশোহর অবস্থানের স্মরণ চিহ্নের জন্য উক্ত 'প্রভাকর' সমিতির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল 'নূরল ইসলাম।',

১৯০৩ সালের মধ্যে সভা যে কাজগুলি করেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ঃ

১. মনোহরপুরে একটি নিম্ন প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা ; অল্পদিনের মধ্যে আবার 'প্রভাকর' নাম দিয়ে স্কুলটিকে পরিণত করা হয়েছিল 'মধ্য ইংরাজী স্কুল'এ। এর সঙ্গে খোলা হয়েছিল 'মাদ্রাসা আলিয়ার ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত আরবী ও পারসী ক্লাশ।' ১৯০০ সালে সভার বার্ষিক অধিবেশনে স্কুলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল 'মাদ্রাসা কারামাতিয়া' (মওলানা কেরামত আলীর নামানুসারে)। মুনশী মেহেরুল্লাহ নির্বাচিত হয়েছিলেন মাদ্রাসার সম্পাদক।

২. ১৯০২ সালে, সভা মুসলমানদের চাকরি ক্ষেত্রে (স্কুল সাব-ইনেসপেক্টর পদ) বৈষম্যের জন্যে প্রেরণ করেছিল স্মারকলিপি। এছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ১. মাদ্রাসা চিরস্থায়ীকরণ ২. পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন সাধন ৩. নিকটবর্তী নদী ও খাল পারাপারের জন্যে সেতু নির্মাণ।[১৩২]

আঞ্জুমানগুলির কর্মকাণ্ডের একটি চিত্র পাওয়া যায় মীর্জা ইউসুফ আলীর লেখায়। তিনি লিখেছেন, এগুলি বৃদ্ধ, যুবক, শিশু সবার কাছেই ইসলামের আসল অর্থ এবং কোরানে উল্লিখিত কর্তব্যসমূহ বোঝাতো। এজন্যে যত দুর্গম অঞ্চলই হোক না কেন সেখানে যেতে তারা বদ্ধপরিকর ছিল। এ জন্যে সাধারণ মানুষের জন্যে প্রকাশ করতো পুস্তিকা। মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদ স্থাপন ছাড়াও স্থানীয় মুসলমানদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আঞ্জুমানগুলি সহায়তা করত। নিয়মিত ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে প্রচার করত তাদের বক্তব্য।[১৩৩]

আঞ্জুমানগুলির চরিত্র, কর্মকাণ্ড এবং এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তৃত

বিবরণ পাওয়া যায় ইবনে মাযুদ্দিন আহমদের আত্মচরিত, 'আমার সংসার জীবন' এ। আঞ্জুমান কিভাবে মুসলমানদের সংগঠিত করে তাদের নৈতিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করেছিল, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে উপরোক্ত গ্রন্থে।[১৩৪]

মাযুদ্দিন লিখেছেন, ওয়াজ-মাহফিলের মাধ্যমে প্রথমে মৌলবী সাহেব গ্রামবাসীদের কাছে ইসলামের মর্মবাণী পৌঁছে দিতেন। গ্রামবাসী মুসলমানরা এতে উদ্বুদ্ধ হলে তারপর সমিতি বা 'আঞ্জুমান' গঠন করা হত। মাযুদ্দিনের নিজ গ্রামে প্রথমে জনৈক মৌলবী সাহেব এসে ওয়াজ করা শুরু করেছিলেন। ওয়াজের 'ফযিলত' সম্পর্কে মাযুদ্দিন যা লিখেছেন তা হয়ত খানিকটা অতিরঞ্জিত কিন্তু প্রণিধানযোগ্য—"এই সকল ওয়াজের সভায় যে সুফল ফলিল, তাহা বর্ণনানীত। ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহেও সুবাতাস বহিল। হিন্দুগণ মুসলমানদিগের জাগ্রত অবস্থা দেখিয়া চমৎকৃত ও ভীত হইয়া পড়িলেন। দেশে মামলা মোকদ্দমার পরিমাণ কমিয়া যাওয়াতে, নিকটস্থ মহকুমার উকিল-মোক্তার ও আমলা বাবুগণ প্রমাদ গনিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, এই সংক্রমক ব্যাধি যদি বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তবেত আমাদের হাঁড়ি শিকায় উঠিবে। নেড়ে বেটাদের নিকট হইতেই আমাদের যত কিছু আমদানী। ...ওদিকে পুলিশ এবং আদালতের পিয়নগুলিরও ভাবনা হইল। জমিদারের নায়েব-গোমস্তাগণও মাথায় হাত দিয়ে ভাবিতে লাগিলেন। সুদখোর মহাজন ও দলিল লেখকদিগের তো কথাই নাই। ষ্ট্যাম্প বিক্রেতাদের মুখও শুকাইয়া গেল'।[১৩৫]

ওয়াজের মারফত এ ভাবে গ্রামের মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করে, মৌলভী সাহেব একটি 'আঞ্জুমান' স্থাপন করলেন। এবং ৯ বছরের মধ্যে ১৪৫ খানি গ্রাম এই 'আঞ্জুমানের' কর্মকাণ্ডের আওতাধীনে আনা হয়েছিল। মুসলমানদের জীবন আঞ্জুমান কিভাবে বদলে দিয়েছিল তার একটি বর্ণনা পাওয়া যায় মাযুদ্দিনের লেখায়। বর্ণনাটি একটু দীর্ঘ কিন্তু এখানে তা উদ্ধৃত করছি, আঞ্জুমানগুলি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা তুলে ধরার জন্যে—'আমরা বিশেষভাবে তদন্ত করিয়া জানিয়াছিলাম, আঞ্জুমানাদি স্থাপনের পূর্ব্বে আমাদের কয়েকখানি গ্রামের ৩৮০৩৬ জন মুসলমান অধিবাসীর মধ্যে ২১ জন চোর, ২৮ জন বিবিধ অপরাধে জেলখাটা দাগী লোক, ১৭ জন গাঁজা খোর, ৪৪ জন তাড়িখোর ২৪ জন বেশ্যাশক্ত

ও লম্পট, ৭ জন সুরাপায়ী, ১২ জন জুয়াড়ি, ৩২ জন দাঙ্গাবাজ লেঠেন (লাঠিয়াল), ৩১২ জন নিস্কর্মা অলস লোক, ১৩৭ জন কার্য্যাক্ষক ভিক্ষুক, ২৮ জন মোকদ্দমার দালাল, ১৯ জন মিথ্যা সাক্ষী দেনেওয়ালা, ২১২ জন সুদখোর, ৩৩৮ অসদ্ব্যবসায়ী (অর্থাৎ জিনিষে ভেজাল দিয়া বিক্রয়কারী), ৩২ জন নিন্দুক লোক ছিল ; খোদার ফজল ও করমে এই ৩/৪ কৎসরের মধ্যে তাহাদের প্রায় অস্তিত্ব রহিল না। .. ২/৩ জন চোর কিছুতেই নিজেদের ঘৃণিত ব্যবসায় ত্যাগ করিতে পারিয়াছিল না, অগত্যা তাহাদিগেকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ৭ জন লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়া তাহাদিগকে লইয়া ঘর করিতঃ সেই ৭ জন পাপাচারীকে, সেই তালাক দেওয়া স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া তওবা করিতে হইয়াছিল। সেই ৭টা নিঃসহায়া রমনীর মধ্যে ৫টাকে অন্য উপযুক্ত পাত্রে নেকাহ দেওয়া হয়। ...'[১৩৬] এ ছাড়া ২৯৭ জন হিন্দু ভদ্রলোকদের বাড়ীতে 'নিতান্ত নীচ, জঘন্য ও ঘৃণিত চাকুরী' করত, তাদের জন্যেও আঞ্জুমান বিকল্প রুজি রোজগারের বন্দোবস্ত করেছিল। এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে আঞ্জুমানের প্রভাবে মুসলমানরা বিভিন্ন ধরনের ২৭৩টি দোকান স্থাপন করেছিল।[১৩৭] শুধু তাই নয়, গ্রামের মুসলমানরা ১৩টি দুধের 'কারখানা', ১৮টি ফল ও তরকারীর বাগান, ২৬৬টি 'নুতন ক্ষেত্র' আবাদ ও মাছের জন্যে ২৮টি পুকুর 'খনিত' করেছিল।[১৩৮]

ইবনে মাযুদ্দিনের বর্ণনা আবেগজাত কারণে হয়ত খানিকটা অতি-রঞ্জিত হতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে মুসলমান সমাজ উন্নয়নে এদের প্রয়াসটি এ গ্রন্থ থেকে বোঝা যায়। আঞ্জুমানের কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মাযুদ্দিন লিখেছেন, 'জ্ঞানী হিন্দুগণ মুসলমানদিগের ঈদৃশ অপূর্ব্ব পরিবর্তন দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু স্বার্থপর কুটিলমনা হিন্দুদিগের চক্ষে এ দৃশ্য বড়ই ক্লেশকর বোধ হইতেছে।'[১৩৯]

শিক্ষার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেছিল আঞ্জুমান। পূর্বে মাযুদ্দিন উল্লিখিত আঞ্জুমান একদশকের মধ্যে একটি বড় মাদ্রাসা, চৌদ্দটি মক্তব, পাঁচটি পাঠশালা ও 'অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষার উপযুক্ত' দু'টি 'প্রাইভেট স্কুল', স্থাপন করেছিল।[১৪০] আন্জুমান কাজকর্ম চালিয়ে যাবার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল একটি তহবিল যেখানে গ্রামের মুসলমানরা সবাই কিছু না কিছু দান করতেন।

আঞ্জুমানগুলির উপরোক্ত কর্মকাণ্ড দেখে তাদের চরিত্র সম্পূর্ণ ধর্মীয় ছিল একথা বলা বোধ হয় ভুল হবে। সম্প্রদায়গত উন্নতিই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য এবং সেই জন্যে হয়ত তারা ভেবেছিল, ইসলামের সঠিক পথ অনুসরন করলে হয়ত সম্প্রদায়গত উন্নতি সম্ভব। নির্দিষ্ট ভাবে পশ্চাত্য শিক্ষার কথা না বললেও শিক্ষার ওপর তারা গুরুত্ব দিয়েছিল। ধর্ম শিক্ষার কথা তারা বলেছিল কিন্তু নির্দিষ্টভাবে মাদ্রাসা বা মক্তবের শিক্ষাই গ্রহণযোগ্য এমন কথা বলেনি। শিক্ষার প্রতি তাদের এতোটা গুরুত্ব আরোপের ফলেই হয়ত উনিশ শতকের শেষের দিকে পূর্ববঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষিত মুসলমানের প্রথম জেনারেশনের উদ্ভব হচ্ছিল।

সামাজিক সমস্যাবলী নিয়ে যতোটা না তার চেয়ে ধর্মবোধ বেশী জাগ্রত করার জন্যে মুসলমান সমিতিগুলি অবশ্য জোর বেশী দিয়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এগুলির ভূমিকা ছিল নগন্য। তাদের একমাত্র রাজনীতি ছিল, ঔপনিবেশিক শাসন অটুট রাখা।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে গ্রামীণ মুসলমানদের মধ্যে একতাবোধ গড়ে তুলতে আঞ্জুমানগুলি সহায়তা করেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এগুলি এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদেরও সৃষ্টি করেছিল অসচেতন ভাবে। পূর্ববঙ্গের মুসলমান—তারা যে মুসলমান এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এ প্রত্যয় জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা সংস্কৃতি সবদিক থেকে তারা নিজেদের আলাদাভাবে ভাবতে শুরু করেছিল। এবং এ ভাবে ক্রমে দু'সম্প্রদায় পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল।

সংবাদপত্র ও সভাসমিতির উদ্ভব ও বিকাশ, একদিক থেকে বলতে গেলে পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের সমান্তরালে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ইতিহাস। শুধু তাই নয়, আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর জাগরণের প্রধান উপাদান হিসেবে যদি আমরা এ দু'টিকে ধরি তা'হলেও দেখা যাবে সংবাদপত্র ও সভাসমিতির উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গেই পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণীর জাগরণের উদ্ভব ও বিকাশ।

আমরা দেখেছি, ১৮১৫ সালে থেকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের উদ্ভব ও বিকাশ শুরু হয়েছিল এবং তা

বয়ে এনেছিল জাগরণের বার্তা। পূর্ববঙ্গে ১৮৫৭ এর পর একটি দু'টি করে সংবাদপত্র প্রকাশিত ও সভাসমিতি স্থাপিত হতে থাকে এবং এর চরম বিকাশ হয়েছিল ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ এর মধ্যে। শুধু তাই নয়, এ সময়ই জোরদার হয়ে উঠেছিল ব্রাহ্ম আন্দোলন, বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল মুদ্রণযন্ত্র, শুরু হয়েছিল থিয়েটার ও ব্যাপক-ভাবে সাহিত্য চর্চার। এক কথায়, ঐ সময়ই হয়েছিল পূর্ববঙ্গে সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কলরব। এবং মধ্যশ্রেণী সভাসমিতি ও সংবাদ-পত্রের উদ্যোক্তা হিসেবে, বা মাধ্যমে এগিয়ে এসেছিল সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণে। সংবাদপত্র ও সভাসমিতির মাধ্যমেই তারা প্রশ্ন তুলেছিলেন বিভিন্ন বিষয়ে। তাই আমাদের যদি প্রশ্ন করা হয়, কোন সময়টিকে আমরা পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণীর জাগরণের উদ্ভব ও বিকাশের কাল হিসেবে ধরবো, তা'হলে উত্তর হবে, ১৮৭০-১৮৯০।

১৮৫৭ থেকে ১৯০৫—এ সময়টুকুতে, অধিকাংশ সংবাদপত্র এবং সভাসমিতির উদ্যোক্তা ছিলেন হিন্দু পেশাজীবী বা 'ভদ্রলোক'রা। কারণ হিন্দু মধ্যশ্রেণীর বিকাশ শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই এবং বাংলায় তারাই ছিলেন আধিপত্য বিস্তারকারী সম্প্রদায়। শিক্ষাদীক্ষা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গেও তারা এগিয়ে ছিলেন, মুসলমানরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ হয়েও সমাজে ছিলেন পশ্চাৎপদ। তাই আমরা দেখি ঐ সময় মুসলমানদের পত্র-পত্রিকা, সভাসমিতির সংখ্যা কম।

বুদ্ধিজীবী কারা এবং ঔপনিবেশিক কাঠামোয় তাদের চিন্তার জগত কি রকম হয় তা' ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। সেই আলোচনার পরি-প্রেক্ষিতে বলা যায় সংবাদপত্রের সম্পাদক, লেখক এবং সভাসমিতির শিক্ষিত উদ্যোক্তরা ছিলেন তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অগ্রণী অংশ। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মতামত বিশ্লেষণ করলে একই সঙ্গে পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণীর চরিত্র, জাগরণের রূপ পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

এখানে অবশ্য একটি কথা উল্লেখ্য। কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে 'নবজাগরণের' সৃষ্টি হয়েছিল তার পুরোটা ছিল এক বিশেষ সম্প্রদায়, হিন্দু সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে উভয় সম্প্রদায়েরই ভূমিকা ছিল এই জাগরণে। এটা ঠিক সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন হিন্দু মধ্যশ্রেণী কিন্তু মুসলমানরা পিছিয়ে থাকলেও তাদের যেটুকু সম্বল ছিল সেটুকু নিয়েই এগিয়ে এসেছিলেন। এক্ষেত্রে আরেকটি জিনিষ লক্ষ্যণীয়,

১৮৭০-৯০ এর মধ্যেই হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের বিকাশ হয়েছিল। শুধু তাই নয়, পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমান লেখকদের অধিকাংশ গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হয়েছিল এ সময়। বিশেষ করে এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে গিয়ে আনিসুজ্জামান লিখেছেন, '১৮৭০ খৃষ্টাব্দকে মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সীমারেখা বলে গণ্য করা অসমীচীন নয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দকে এই যুগান্তরের কাল বলে মনে করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। সরকারী শিক্ষানীতির পরিবর্তনের ফলে এই সময় থেকে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটতে থাকে। এই শিক্ষা আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টিতে মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করে।'[১৪১] সুতরাং বলা যেতে পারে, পূর্ববঙ্গে মধ্যশ্রেণীর জাগরণ ঠিক একতরফা ভাবে একটি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নি। শুধু তাই নয়, কলকাতা কেন্দ্রীক নবজাগরণ ঠিক কলকাতার বাইরে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। কিন্তু, পূর্ববঙ্গে, সবকিছু ঢাকাকে কেন্দ্র করেই বিরাজ করেনি। ঢাকা হয়ত অগ্রণী ছিল কিন্তু এ জাগরনের রেশ ঢাকার বাইরে মফস্বলেও পৌঁছেছিল। তবে এটাও ঠিক, এটা একটি শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এর রশ্মি হিন্দু মুসলমান সাধারণ মানুষ বা কৃষকের কাছে পৌঁছেনি।

এখন আমি, বুদ্ধিজীবীদের মতৈক্য এবং মতানৈক্য বিষয়ক সমস্যাটির ওপর আলোকপাত করবো।

বুদ্ধিজীবীরা জোর দিয়েছিলেন শিক্ষার ওপর বিশেষ করে স্ত্রী শিক্ষার ওপর। নব্য শিক্ষিতরা বুঝেছিলেন, শিক্ষাই সামাজিক মর্যাদা, বিত্ত, ও ক্ষমতা এনে দেবে, এবং জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ মহিলাদেরও আর একেবারে অন্ধকারে রাখা ঠিক হবে না। তাই হিন্দু মুসলমান পরিচালিত সংবাদপত্র বা সভাসমিতি থেকে শিক্ষার ওপর সামগ্রিকভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে কি ভাবে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া যায় সে সম্পর্কে তারা খুব একটা উচ্চবাচ্য করেন নি।

তবে মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষার ওপর সবসময় উভয় সম্প্রদায় এখানে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কলকাতাবাসী উচ্চকোটির মুসলমান বা শিক্ষিত মুসলমানদের মত এখানকার মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে শরাফতি দেখান নি।

আগেই উল্লেখ করেছি, সমাজ সংস্কার নিয়ে কলরব উঠেছিল।

তবে সমাজ সংস্কারের প্রশ্নে হিন্দু সমাজে আলোড়ন হয়েছিল বেশী, কারণ, সমস্যাগুলি ছিল তাদের ধর্মজাত এবং এর উদ্ভব হয়েছিল উঁচুবর্ণের হিন্দুদের সমস্যা থেকে। ব্রাহ্ম আন্দোলন হয়েছিল সে জন্যেই। মুসলমানরা চেয়েছিল বাল্যবিবাহ বরপণ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতে।[১৪২] কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীরাই গ্রাম অব্দি পৌঁছুতে পারেন নি। তবে হয়ত বলা যায়, মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক ছিল হিন্দুদের থেকে বেশী। বটতলার পুঁথির অধিকাংশের রচয়িতা ছিলেন মুসলমান এবং পুঁথির সাহায্যে অনেক সময় এ ধরনের বক্তব্য পৌঁছে যেত গ্রামে। কারণ তাঁদের রচিত পুঁথির ভাষা আর গ্রামের ভাষার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য ছিলনা যে পার্থক্য ছিল সংবাদপত্র সাময়িকপত্র বা সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে।

ঔপনিবেশিক কাঠামোয় সৃষ্ট এ বুদ্ধিজীবীরা সংস্কার চেয়েছেন কোন কোন ক্ষেত্রে কিন্তু সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন কামনা করেন নি কখনো। এ কথা সব সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রেই সত্য। যেমন, গোঁড়া হিন্দুদের সহানুভূতি ছিল জমিদারদের প্রতি। ব্রাহ্ম বা মুসলমানরা সহানুভূতি দেখিয়েছেন রায়তদের প্রতি। এর কারণ ব্রাহ্মরা ছিলেন খানিকটা উদারনীতিতে বিশ্বাসী আর কৃষকদের অধিকাংশইতো ছিলেন মুসলমান। কিন্তু তাই বলে যদি আমরা মনে করি তারা জমিদারদের উৎখাত করতে চেয়েছিলেন তা'হলে ভুল হবে। বরং সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা বা সভাসমিতি গঠনে অনেক ক্ষেত্রেই বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে জমিদারদের আঁতাত ছিল। বুদ্ধিজীবীদের উদারনীতির কেন্দ্রে ছিল ভালো জমিদার এবং ভালো ইংরেজ।

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা লিখেছিল, সরকারের উচিত খারাপও ভালো জমিদারের পার্থক্য করা। কারণ খারাপ জমিদারের অত্যাচারে দেশ উৎসন্নে গেল।[১৪৩] পত্রিকাটি আরো লিখেছিল, 'জমিদার প্রজাদিগের পিতামাতা স্বরূপ ও সহায় সম্পদ, ইহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।'[১৪৪]

ইংরেজ শাসন অপছন্দ ছিল না বুদ্ধিজীবীদের। রাণী ভিক্টোরিয়া ছিলেন তাঁদের 'মাতা'। এ প্রসঙ্গে দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কালীকৃষ্ণ ঘোষ ছিলেন ময়মনসিংহের একজন পরিচিত ব্রাহ্ম। ১৮৭৭ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া ভারত সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করলে তিনি একটি

গীত রচনা করেছিলেন যার শেষ চারটি চরন ছিল এরকম—

'দয়াবতী মহারাণী
মোদের জননী যিনি
রাজ রাজেশ্বরী তিনি
আরকারে করি ভয়'।[১৪৫]

সিলেটের তৎকালীন বিখ্যাত কবি রামকুমার নন্দী (১৮৮০-১৯০২) পেন্সন পাওয়ার পর রাণী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন—

'সেবি-বহুদিন, ভক্তি সহকারে
ভারত সম্রাজ্ঞী জননী পায়।
বৃদ্ধকালে পুনঃ যাঁহার কৃপায়
হইল এখন জীবনোপায়'।[১৪৬]

এ প্রসঙ্গে কায়কোবাদের কবিতার কথা উল্লেখ্য (দেখুন ঃ পরিশিষ্ট)। সংবাদপত্রগুলিতে অবশ্য ইংরেজ রাজকর্মচারী ও অন্যান্যদের প্রচুর সমালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সামনে রেখে ইংরেজ শাসনের প্রতি ক্ষোভও প্রকাশ করা হয়েছে। এর প্রধান কারণ, উঠতি মধ্যশ্রেণী সমমর্যাদা চেয়েছিল ইংরেজদের সঙ্গে।[১৪৭] কারণ, এই বোধ তাদের জন্মেছিল, বিদ্যা, বুদ্ধি কিছুতেই তারা খাটো নয় সুতরাং কেন তারা অধস্তন শ্রেণী হিসেবে থাকবে? এ ভাবেই বোধ হয় বাঙ্গালী তথা ভারত-বাসীর মনে সৃষ্টি হয়েছিল এক ধরনের জাতীয়তাবোধের। 'ভারত মিহির' একবার লিখেছিল—

মাৎসিনি যেভাবে জাগ্রত করে তুলেছিলেন ইতালীকে আমরা তা চাই না। আমরা চাই না ওয়াশিংটনের মত প্রজাতন্ত্র স্থাপন করতে। কারণ স্বাধীনতা পেতে হলে যে সব গুণাবলীর দরকার তা'কি আছে আমাদের মধ্যে? আমাদের কি আছে এমন হৃদয় যা স্বাদেশিকতায়-পূর্ণ? আছে কি ঐ রকম ঐক্য যা মৃত্যুর মুখেও অটুট থাকবে?... স্বাধীনতাকামী আমরা নই বা ইংল্যাণ্ডের অধীনে আমাদের স্বাধীন পার্লামেন্টও চাই না কারণ আমাদের মধ্যে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, সম-বেদনা, আত্মসম্মান এবং সবচেয়ে বড় কথা দেশাত্মবোধ নেই। চাই না আমরা ভারতবর্ষের ভাইসরয়ের বা প্রাদেশিক গভর্ণরের পদ, তা ইংরেজদেরই থাকুক।

আমরা চাই ভারতবর্ষ শাসিত হোক তার দেশের লোকের স্বার্থে।

শাসনের মূল নীতি হওয়া দরকার দেশীয়দের মঙ্গল, ইংল্যাণ্ডের নয়। এবং সরকারী তৎপরতা বৈদিক সূত্রের মত দুর্বোধ্য হওয়া উচিত নয়। ...ন্যায় বিচার, তাও চাই না। আমরা চাই, যেন আমরা বিশ্বাস রাখতে পারি এবং আমাদেরও যেন বিশ্বাস করা হয়। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে কি দেশীয়দের একটি আসনও বরাদ্দ করা যায় না? আমরা জানি, মুসলমান শাসনামলে এ কথা অবান্তর শোনাতো, কিন্তু যে সরকার দাসপ্রথা অবলুপ্ত করেছে, স্বাধিকারের নিশান উড়িয়েছে তারা নিশ্চয় ঐ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিষয়টি বিচার করবেন না।[১৪৮] আসলে তারা চেয়েছে, ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড বা আয়ারল্যাণ্ডকে যে ভাবে দেখে ভারতকেও যেন সেভাবে দেখা হয়।[১৪৯]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুদ্ধিজীবীদের চাওয়া পাওয়ার চিত্রটি ফুটে উঠেছে। সমমর্যাদা না পাওয়ায় কিছু ক্ষোভ থাকলেও, স্টাবলিশমেন্ট প্রীতি, দাস সুলভ মনোভাবের ঘাটতি ছিল না বুদ্ধিজীবীদের। যে 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিল সে পত্রিকাই লিখেছিল, ভাইসরয় যেন একবার পূর্ববঙ্গ সফরে আসেন কারণ, তা'হলে এখানকার প্রজারা স্বচক্ষে একবার রাণীর প্রতিনিধিকে দেখতে পাবে।[১৫০] ভাইসরয় রিপন দেশে ফেরার পথে, পোড়াদহ স্টেশনে কিছুক্ষণের জন্যে থেমেছিলেন। তখন 'গ্রামবার্তা' সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার ও তাঁর দল, রিপনের জন্যে বিশেষভাবে রচিত গান গাইবার জন্যে স্টেশনে দাঁড়িয়েছিলেন।[১৫১] 'হিন্দুরঞ্জিকা' উল্লসিত হয়ে ঘোষণা করেছিল, ইংরেজ শাসনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।[১৫২] স্তরবদ্ধ সমাজে শোষণ ও শাসকের কেন্দ্রমূল কুয়াশাচ্ছন্ন রয়ে যায়। ফলে দূরবর্তী শাসক/শোষক, নিকটবর্তী শাসক/শোষক থেকে অধিকতর মহিমান্বিত ও মানবিক গুণ সম্পন্ন বলে প্রতিভাত হয়। সেই ঐতিহ্য এখনও আমরা কমবেশী বহন করছি।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটি এখন তোলা যেতে পারে তা'হলো সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক এখানে কেমন ছিল।

এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, পাশাপাশি বাস করার পরও হিন্দু মুসলমান ছিল দু'টি আলাদা সম্প্রদায়। উনিশ শতকের শেষের দিকে তাদের এ পার্থক্য আরো স্পষ্ট ও গভীর হয়ে ওঠে। ধর্ম যে এ দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং করছে

তা এ দুই সম্প্রদায়ই প্রমাণ করেছে। ঔপনিবেশিক শাসনে কেন ধর্মকে ঘিরেই সব যুক্তি আবর্তিত হয়। তবে একথা বলা যায়, নব্বই দশকের পূর্ব পর্যন্ত উভয়ের সম্পর্কই ভালো ছিল কিন্তু দু'পক্ষই আলাদা আলাদা ভাবে নিজেদের কথা চিন্তা করেছে এবং সভাসমিতি সংবাদপত্র ইত্যাদির ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু বোধ হয় এ কথাও সত্য যে, সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক নিয়ে শহরবাসীরাই মাথা ঘামিয়েছিল বেশী, গ্রামবাসীরা নয়।

আবদোস সোবহান লিখেছিলেন, 'হিন্দু মোসলমানে কোন বিষয়ই মিল নাই ; যেমন ঠিক অনল আর বারুদ। হিন্দু মোসলমানে একত্রে কি একঘরে বসিয়াও আহার করিতে পারে না...সুতরাং হিন্দু মুসলমানের একতা হওয়া অসম্ভব।'[১৫৩] মুসলমান এই বুদ্ধিজীবীর উক্তি চরম। কিন্তু এ ধরনের হিন্দু বুদ্ধিজীবীও বিরল ছিল না।

কিন্তু এর একটি বিপরীত দিকও আছে। একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান লিখেছেন, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ ক্বচিৎ দেখা গেছে। পরস্পর বাস করছে তারা শান্তিতে।[১৫৪] সিলেটের কথা লিখতে গিয়ে একজন দেশীয় কিঞ্চিৎ অবাক হয়ে লিখেছিলেন, সেখানে একই ফরাসে বসে হিন্দু মুসলমান পান তামাক খাচ্ছে এবং এতে কারো জাত যাচ্ছে না। শুধু তাই নয় একই হুকোতে তারা ধূমপান পর্যন্ত করে।[১৫৫]

সভাসমিতিগুলিতেও অনেকক্ষেত্রে হিন্দুমুসলমান একই সঙ্গে কাজ করেছিল। অনেক সভার সভাপতি ছিলেন হিন্দু, সম্পাদক মুসলমান। যেমন 'ত্রিপুরা হিতৈষিনী সভা'র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর এবং প্রেসিডেন্ট মৌলবী সিরাজুল ইসলাম। ময়মনসিংহের 'ইটনা ভিলেজ ইউনিয়নে'র প্রেসিডেন্ট ছিলেন, দেওয়ান মোহাম্মদ আফসার, সম্পাদক মহেশ চন্দ্র গুপ্ত।[১৫৬] এবং এ সভার উদ্দেশ্য ছিল দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির সৃষ্টি। কোন কারণে উত্তেজনার সূত্রপাত হলে দু'পক্ষই, দু'পক্ষকে 'ভ্রাতা' সম্বোধন করে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করতেন। গরু যবেহ নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে, মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকা 'সুধাকর' লিখেছিল—হিন্দুরা যেন সহযোগী ভাইদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না হানেন।[১৫৭]

কিন্তু এগুলি হচ্ছে উনিশ শতকের শেষ দশকের কথা এবং এ

সময় দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের বহুতর চেষ্টা আবার প্রমাণ করে যে দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল ধরেছিল। ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ ছিল সে সূচনারই বিস্ফোরণ।

আসলে এ ছিল বোধ হয় অনিবার্য বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শাসনে। বাহুকাল এক সঙ্গে বসবাস করলেও একথা মিথ্যে হয়ে যায়নি যে, মুসলমানরা এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী আর হিন্দুরা বহুতর দেবতায়। তারপর হিন্দু পুনর্জাগরণ এবং মুসলমান পুনর্জাগরণ ও দু'টি সম্প্রদায়ের সত্ত্বাকে পৃথক করে তুলেছিল। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য, সংবাদপত্র সবখানেই তা' ছায়াপাত করেছিল, 'কতক স্বেচ্ছায়, কতক অনিচ্ছায়, কখনো বা পরিবেশের প্রভাবে। এর সঙ্গে ধর্মপ্রচারকদের প্রচার আর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ইসলামী মূল্যবোধের পতাকাবাহীদের ঐতিহ্যগর্ব মিশ্রিত হল। হিন্দু পুনর্জাগরণবাদ আর মুসলিম পুনর্জাগরণবাদ পূর্ণোদ্যমে স্বতন্ত্র লক্ষ্যের পথে ছুটে গেল।'[১৫৮]

তবে এখানে আরেকটি কথা বলা যেতে পারে। যতদিন মুসলমানরা সম্প্রদায়গতভাবে নমিত ছিল ততদিন হিন্দু ধনী বা মধ্যশ্রেণীর মনে মুসলমানদের নিয়ে কোন প্রশ্ন জাগেনি। কিন্তু যখনই মুসলমান মধ্যশ্রেণীর বিকাশ শুরু হলো, গ্রামাঞ্চলে আঞ্জুমানগুলি মুসলমান কৃষকদের হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করলো,[১৫৯] এক কথায়, যখন সম্প্রদায়গত ভাবে মুসলমানদের মনে আলাদা চেতনা গড়ে উঠলো[১৬০] তখন অনিবার্য ভাবেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে ফাটল ধরলো। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীগত চেতনার বৃদ্ধি ঘটলেই আবার প্রবল শ্রেণীর মধ্যে বিরোধী চেতনাও সমান্তরালে বৃদ্ধি পেয়েছিল সম্প্রদায়গত বিভেদ বিদীর্ণ করে। এই সময়ে এটিও আমরা লক্ষ্য করি।

তথ্য নির্দেশ

১. Biman Behari Majumdar, *Indian Political Associations and Reform Legislature (1818-1917)*, Calcutta, 1965, p. I.

২. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ". (১৮১৮-১৮৭৮), কলকাতা, ১৯৭৭, পৃঃ ১।

৩. ঐ, পৃঃ ২-৩।

৪. আনিসুজ্জামান, "মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৮৩১-১৯৩০)", ঢাকা,

১৯৬৯, পৃঃ ২।

৫. Hemendra Prasad Ghose, *The Newspaper in India*, Calcutta, 1952, p. 1.

৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাংলা সাময়িকপত্র", প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৭৯ (বাংলাসন), পৃঃ ৬-৮।

৭. ঐ, পৃঃ ৯।

৮. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

৯. ঐ, পৃঃ ২৪।

১০. ব্রজেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭২।

১১. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।

১২. বিস্তৃত তালিকার জন্যে দেখুন, ব্রজেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, এবং ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৪।

১৩. বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত ও সংকলিত), "সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র", চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃঃ ২৪-২৫।

১৪. ব্রজেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪। বার্ত্তাবহ প্রকাশিত হত 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ যন্ত্র' থেকে। পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক। সম্পাদক ছিলেন নিলমনী মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত হত প্রতি মঙ্গলবার এবং সার্কুলেশন ছিল মাত্র ১০০ কপি। চাঁদা: বার্ষিক ছয় টাকা; অগ্রিম দিলে চার টাকা। Report of W. Dampier, S. P. 1853 in *Selections from the Records of the Bengal Government, No. XXII*, Calcutta, 1855, p. 112.

১৫. 'ঢাকা নিউজ' প্রথমে ছিল একপৃষ্ঠা। ১৩ নম্বর সংখ্যা থেকে পত্রিকার পাতা বৃদ্ধি পায় চার পৃষ্ঠায় এবং সঙ্গে থাকতো সাপ্লিমেন্ট যেখানে চলতি বাজারদরই ছিল মুখ্য বিষয়। দ্বিতীয় খণ্ড থেকে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আট পৃষ্ঠায়।

ঢাকা নিউজের প্রথম পৃষ্ঠায় থাকতো বিজ্ঞাপন (সংখ্যা অবশ্য ছিল খুবই কম)। শেষের দিকে 'কমার্শিয়াল' শিরোনামে থাকতো নীল, কুসুমফুলের চলতি বাজারদর।

ঢাকা নিউজের প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়েছিল ১৮. ৪. ১৮৫৬ সালে। প্রকাশিত হত প্রতি শনিবার। চাঁদা বার্ষিক: সাড়ে ছ'টাকা এবং তা দিতে হত অগ্রিম। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল দু'আনা। বিজ্ঞাপনের হার ছিল, প্রতি লাইন দু'আনা। এবং এক টাকার নীচে কোন বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হত না। পত্রিকার অধিকাংশ খবরের বিষয় বস্তু ছিল নীল এবং নীলকর। ঐ ছাড়া চিঠিপত্র, আঞ্চলিক কিছু খবরও থাকতো। ৩০. ১০. ১৮৫৮ সালে পত্রিকার প্রকাশের ব্যবস্থাপনা ভার পরিবর্তিত হয়েছিল। খুব সম্ভব ১৮৬৯ সালে 'ঢাকা নিউজ' প্রকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং ঐ পত্রিকার ব্যবস্থাপনা পরিষদই হয়ত 'বেঙ্গল টাইমস' প্রকাশ শুরু করেছিল।

ঢাকা নিউজ টিকে ছিল প্রায় তেরবছরের মত। 'সোমপ্রকাশ' যদিও উল্লেখ করেছিল : 'ঐ পত্রখানি থাকাতে অনেক কুক্রিয়াশীল ব্যক্তি দমনে ছিল। কিন্তু আসলে পত্রিকাটি সব সময় নীলকরদেরই সমর্থন করেছে বা তাদের স্বার্থ দেখেছে। এ জন্যে অনেক সময় পত্রিকাটিকে 'প্ল্যান্টার্স জার্নাল'ও বলা হত। দেখুন, আবদুল কাইউম, 'সাময়িকপত্রে সেকালের ঢাকা', "বাংলা একাডেমী পত্রিকা", বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৭, পৃঃ ৪২-৪৩।

১৬. সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা দু'টি ছিল—"কবিতা কুসুমাবলী" এবং "মনোরঞ্জিকা"। ঢাকার বাঙলাযন্ত্র থেকে কবিতা কুসুমাবলী ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। পদ্যবাহুল এই মাসিক পত্রিকার প্রথম দিকে আকার ছিল রয়েল একফর্মা, তৃতীয় সংখ্যায় দু'ফর্মা। এটি প্রকাশিত হয়েছিল কবি হরিশচন্দ্র মিত্রের উদ্যোগে। এবং প্রকাশকের মতে এর প্রচার সংখ্যা ছিল চারশো। মূল্য প্রতি সংখ্যা : দেড় আনা। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল : '...পূর্ব্বতন বঙ্গীয় কবিগণ যে সমস্ত কাব্য প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন তাহার অধিকাংশই উলঙ্গ আদিরস দোষে দোষিত। ...ফলত বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষ সাধন ও বিশুদ্ধ কাব্যকলা প্রচার দ্বারা জনমণ্ডলীর কল্যাণ বর্দ্ধনই এতৎপত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্যে।' বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দেখুন, কেদারনাথ মজুমদার, "বাংলা সাময়িক সাহিত্য", প্রথম খণ্ড, ময়মনসিংহ, ১৯১৭, পৃঃ ৩৫১-৩৬৫। মনোরঞ্জিকা সভার মুখপত্র ছিল 'মনোরঞ্জিকা'। ১২৬৬ (বাংলা সন) তে প্রকাশিত হয়ে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় ১২৬৭ সালে। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। ঐ পৃঃ ৩৪৯।

১৭. পত্রিকাটির নাম ছিল : "নবব্যবহার সংহিতা"(১৮৬০)। ঢাকা সদর আমীনের উকিল রামচন্দ্র ভৌমিক ছিলেন এর সম্পাদক। সরকারী গেজেট থেকে নানাবিধ আইন ও সার্কুলার প্রভৃতি অনুবাদ করে এখানে ছাপা হত, ব্রজেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৪।

১৮. কৈলাসচন্দ্র সরকারের উপদেশে ও তত্ত্বাবধানে, বিক্রমপুরের কুকুটিয়া জ্ঞান মিহির বিকাশিনীর সভার মুখপত্র হিসেবে প্রতিমাসে 'সংস্কার সংশোধনী' প্রকাশিত হত। কেদারনাথ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৬।

১৯. দেখুন, *The First Report of the East Bengal Missionary Society,* Dacca, 1849.

২০. 'বাঙ্গালা যন্ত্র'ই পরে ঢাকায় আরো প্রেস স্থাপনে উৎসাহ যুগিয়েছিল। ঢাকার এই প্রথম বাংলা মুদ্রণযন্ত্রটি কিন্তু স্থাপন করেছিলেন (১৮৬০) বেশ কয়েকজন মিলে। অংশীদাররা ছিলেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ব্রজসুন্দর মিত্র এবং ভগবান চন্দ্র বসু, বিদ্যালয়সমূহের ডেপুটি ইন্‌সপেক্টর দীনবন্ধু মৌলিক, কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র বসু, এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রামকুমার বসু। কেদারনাথ মজুমদার, মৌলবী আবদুল করিম নামে আরেকজন অংশীদারের কথা উল্লেখ করেছেন। শেষোক্তজন ছাড়া বাকী সবাই ছিলেন পূর্ববঙ্গের

ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এ ছাড়া ১৮৬৩-৬৪ সালের একটি সরকারী রিপোর্টে এই প্রেসের অংশীদার হিসেবে চারজনের নাম উল্লিখিত হয়েছে। তাঁরা হলেন—রামসুন্দর মৌলিক, মধুসূদন বিশ্বাস, কালীকান্ত মুখোপাধ্যায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বসু। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দেখুন, শ্রীমদ যোগাশ্রমী পণ্ডিত শিবেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী সাহিত্যাচার্য (সম্পাদিত) "বাংলা পারিবারিক ইতিহাস", ষষ্ঠ খন্ড, ঢাকা (দ্বিতীয় সংস্করণ, সন উল্লিখিত হয়নি), এবং Annual Return of Presses worked and Newspapers or periodical works published in Bengal during the official year 1863-64, *Proceedings of the Government of Bengal in the General Department*, Calcutta, January 1865.

২১. এ সময়ে প্রকাশিত ৬টি সাপ্তাহিকের মধ্যে ৫টি প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা এবং একটি বরিশাল থেকে। ঢাকার ৫টির মধ্যে দু'টি ছিল ব্রাহ্ম ও একটি গোঁড়া হিন্দু সমর্থক। মাসিক পত্রিকার অধিকাংশ ছিল সাহিত্য বিষয়ক। এবং ঢাকায় তখন প্রেসের সংখ্যা ছিল পাঁচটি।

২২. 'দুই পয়সা মূল্যের এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি ১লা বৈশাখ (১২৮০) হইতে বরিশাল, মাদারীপুরান্তর্গত গোপালপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ছৈয়দ আবদুল (র) রহিম মহাশয় প্রকাশ করিতেছেন। মুসলমানগণ পত্রিকা লিখিতে বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির জন্য লেখনী ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন অত্যন্ত সন্তোষের বিষয় ছৈয়দ সাহেব এই সৎকার্যে কৃতকার্য হন একান্ত প্রার্থনীয়। আমরা সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করি, গ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক বরিশাল নগরে যাইয়া পত্রিকার মূল্য এক পয়সা করুন। পত্রিকাখানি রেজেস্টারি করিয়া যাহাতে ১০ টিকেট চলিতে পারে তাহার চেষ্টা করুন। নগরে ভাল ভাল লেখক এবং উৎসাহশীল ধনিগনের আশ্রয় পাওয়া বিচিত্র নহে'। "ঢাকা প্রকাশ", ২৭. ৪. ১৮৭৩।

২৩. 'বেদ, পুরান, তন্ত্র, স্মৃতি, দর্শন, জ্যোতিষাদি যুক্তি আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিকপত্র ও সমালোচন।' সম্পাদক ছিলেন অন্নদাচরণ সরস্বতী। ব্রজেন্দ্রনাথ, "বাংলা সাময়িকপত্র", দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৩৪। পত্রিকাটি ছিল মাসিক।

২৪. সুসঙ্গদুর্গাপুর থেকে মহারাজ শিবকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের আনুকূল্যে ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত 'বিবিধ সঙ্গীত ও নানাবিষয়িনী কবিতা বিকাশিনী' মাসিক পত্রিকা ছিল 'কৌমুদী'। সম্পাদক ছিলেন, রুক্মিনীকান্ত ঠাকুর। ঐ, পৃঃ ২৬।

২৫. ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, 'বৈষয়িকতত্ত্ব'। 'এই মাসিক পত্রখানির ছয়খণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কৃষি, শিল্পাদি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকটন করিয়া দেশীয়গনকে বৈষয়িক ব্যাপারে প্রবৃত্তিমান ও দক্ষ করা এতৎ প্রচারের মুখ্যোদ্দেশ্য।' "ঢাকা প্রকাশ", ১২.৪ ১৮৮৩। ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন (প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৯), তাহিরপুর দাতব্য কৃষিকার্যালয় হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ বঙ্কবিহারী খাঁ। প্রথম ভাগ মাসিক আকারে অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত

হয়েছিল দ্বিতীয় বর্ষে 'বৈষয়িক তত্ত্ব' পরিণত হয়েছিল ত্রৈমাসিক পত্রিকায়।

২৬. মাসিক 'সুখীপাখী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৮ সালে। 'নীতি বিষয়ক বালকপাঠ্য' এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, সারদা প্রসাদ বসু। ব্রজেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৩।

২৭. নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৭৩ (বৈশাখ ১২৮০) সালে বাল্য-বিবাহ নিরোধ কল্পে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ।'

২৮. শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক সাপ্তাহিক সচিত্র পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন, ঢাকা কলেজের ল্যাবরেটরী এসিস্টেন্ট সূর্য নারায়ণ ঘোষ। প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮২ সালে।

২৯. *Proceedings of the Govt. of Bengal in the General Department*, January, 1865.

৩০. *RNP*. No. 24, 1884.

৩১. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, মুনতাসীর মামুন, "ঢাকা প্রকাশ ও পূর্ব-বঙ্গের সমাজ", ঢাকা, ১৯৭৬ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'ঢাকা প্রকাশ' এর প্রায় একশো বছরের ফাইল।

৩২. *RNP*, 1893.

৩৩. ব্রজেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৮১।

৩৪. ঐ, পৃঃ ২১৯।

৩৫. ঐ।

৩৬. ঐ, পৃঃ ১৮৩।

৩৭. ঐ। ১৮৮৪ সালের সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল ২৬৭ কপি। *RNP*, No. 24, 1884.

৩৮. "নবকান্ত চট্টোপাধায়", পৃঃ ৩৮।

৩৯. *RNP* নং ১, ১৮৮০।

৪০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার", কলকাতা, ১৩৭২ (বাংলা সাল) পৃঃ ১৮।

৪১. ব্রজেন্দ্রনাথ, "বাংলা সাময়িক পত্র", প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২০১।

৪২. ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে বেঙ্গল টাইমসের প্রায় সম্পূর্ণ ফাইল রক্ষিত আছে। সেখানে প্রথম যে সংখ্যাটি রক্ষিত হয়েছে তা ১৮৭৬ সালের জানুয়ারী, ৬ খণ্ড, সংখ্যা ৫১১। এ থেকে অনুমান করছি পত্রিকাটি ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

৪৩. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮।

৪৪. Uma Dasgupta, 'The Indian Press, 1870-1880', *Modern Asian Studies*, vol. II, Pt. 2, April 1977, pp. 216-17.

৪৫. যেমন, ঢাকা নিউজ বেড়িয়েছিল যৌথ উদ্যোগে, এ ছাড়া ঢাকার, মনোর-রঞ্জিকা, সংস্কার সংশোধনী, ঢাকা প্রকাশ, হিন্দু হিতৈষিনী শুভসাধিনী,

ইণ্ট, বঙ্গবন্ধু, সারস্বতপত্র, যুবক সুহৃৎ, সেবক, আরা, বা বরিশালের পরিমল বাহিনী অথবা ময়মনসিংহের, বাঙ্গালী, হরিভক্তি তরঙ্গিনী, পাবনার উদ্যোগবিধায়িনী, রাজশাহীর হিন্দু রঞ্জিকা প্রভৃতি ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সভার মুখপত্র।

৪৬. *Proceedings of the Government of Bengal in the General Department*, January 1865, pp, 4-5.

৪৭. Annual Report of the Vernacular Newspapers in Bengali during 1867, Home public Records Proceedings, উদ্ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১।

৪৮. *RNP*, নং ১, ১৮৮০ পত্রিকাগুলি ছিল—

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা (মাসিক)	৯৭৫ কপি
সংশোধনী	৬০০ ,,
রাজশাহী সংবাদ	৩১ ,,
ভারত মিহির	৬৭৯ ,,
ঢাকা প্রকাশ	৩৫০ ,,
হিন্দু হিতৈষিণী	৩০০ ,,
হিন্দু রঞ্জিকা	২০০ ,,
রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ	২৫০ ,,
সঞ্জিবিনী	২৬০ ,,
শ্রীহট্ট প্রকাশ	৪৪০ ,,

৪৯. *RNP*, নং ৫২, ১৮৯০, পত্রিকাগুলি ছিল—

আহমদী	৪৫০ কপি
হিতকরী	৬০ ,,
চারুবার্তা	৫০০ ,,
ঢাকা প্রকাশ	১২০০ ,,
হিন্দু রঞ্জিকা	৬০ ,,
সারস্বত পত্র	৩০ ,,

ঢাকা প্রকাশের প্রচার সংখ্যা কেন বেড়েছিল তার কারণ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫০. রমেশচন্দ্র মজুমদার, "জীবনের স্মৃতিদীপে", পৃঃ ১০।

৫১. "ঢাকা প্রকাশ", ৩০. ৪. ১৮৬৩। এটা ছিল বই ছাপার খরচ।

৫২. কেদারনাথ মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১০।

৫৩. W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal,* vol v. pp. 117-18.

৫৪. "ঢাকা প্রকাশ", ৮. ৮. ১৮৮৮।

৫৫. *RNP*, নং ১৭, ১৮৭৯।

৫৬. সালাহ উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪।

৫৭. কোন একটি বিষয় সম্পর্কে যে একটি সংবাদপত্রের মত নির্দিষ্ট ছিল তা' নয়। মতামত বদলেছে বিভিন্ন সময়। তবে উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সাধারণ মতামত কি ছিল উদাহরণ স্বরূপ সে জন্য নিম্নোক্ত পত্রিকাগুলি দেখা যেতে পারে—পূর্ববঙ্গ বিষয়ে ভারত মিহির, ৩. ৮. ১৮৭৬, *RNP*, নং ৩৩. ১৮৭৬ ; ঐ, ২১. ৬. ১৮৮১ ; ঢাকা প্রকাশ, ৩০. ৯. ১৮৬৬ ; ঐ, ৪. ৮. ১৮৭২ ; কৃষক, জমিদার, নীলকর, চা কর সম্পর্কে, গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, এপ্রিল, ১৮৭৩ ; হিন্দু হিতৈষিণী, ২০. ২. ১৮৭৫, *RNP*, নং ৯. ১৮৭৫ ; ঢাকা প্রকাশ, ১১ আশ্বিন ১২৬৮ ; ঐ, ৫. ৬. ১৮৬৩ ; গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, জুন ১৮৭২ ; হিন্দু হিতৈষিণী, ১৫. ৭. ১৮৭৬, *RNP*, নং ৩০. ১৮৭৬ ; সিভিল সার্ভিস বিষয়ে ঢাকা প্রকাশ, ৪. ৬. ১৮৬৩ ; গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, ১৯. ৬. ১৮৭৬, *RNP*, নং ২৫. ১৮৭৬ ; ভারত মিহির, ২৭. ৩. ১৮৭৮, নং ১১. ১৮৭৮ ; হিন্দু হিতৈষিণী, ১৩. ৪. ১৮৭৬, ঐ, নং ২০. ১৮৭৬ ; ঢাকা প্রকাশ, ২১. ৭. ১৮৬১। শিক্ষা, সমাজ সংস্কার সম্পর্কে, ঐ, ৩. ৯. ১৮৬৩ ; গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, ২০, ১৮৭৫ *RNP*, নং ৬. ১৮৭৫ ; চারুবার্তা, ১৪, ২. ১৮৮৭, ঐ, নং ৯. ১৮৮৭ ; গ্রামবার্তা, প্রকাশিকা, ডিসেম্বর, ১৮৬৯ ; ঐ, ৭/৪ ; হিন্দু রঞ্জিকা, ২৭. ৬. ১৮৭৭, *RNP*, নং ২. ১৮৭৭ ; ঢাকা প্রকাশ, ৭ পৌষ ১৯২৯ ; মধ্যশ্রেণী সম্পর্কে গ্রামবার্তা প্রকাশিকা ১৭. ২. ১৮৭৫, *RNP*, নং ৯. ১৮৭৫ ; হিন্দু রঞ্জিকা, ২৪.৭.১৮৭৮, ঐ, নং ১৩. ১৮৭৮ ; সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক পরিদর্শক, ২২. ৬. ১৮৮৪, *RNP*, ঐ, নং ২৯. ১৮৮৪ ; হিন্দু রঞ্জিকা, ২৭. ৮. ১৮৯০, ঐ, নং ০৬. ১৮৯০ ; ও চারু মিহির, ৩১. ১২. ১৮৯৫, ঐ, নং ১. ১২. ৯৪।

৫৮. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবন কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন ইন্দু প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, "কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুদারের জীবন চরিত", কলকাতা, ১৯১১, এবং রা. সে. (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার), "ইতিবৃত্ত", ঢাকা, ১৮৬৮।

৫৯. "ঢাকা প্রকাশ", ৬. ৯. ১৮৭০।

৬০. আদিনাথ সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০।

৬১. কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিকথায় লিখেছেন, তিনি, হরিশ চন্দ্র এবং প্রসন্নকুমার সেন এই তিনজনে মিলে কবিতাকুসুমাবলী প্রকাশ করেছিলেন এবং সদ্ভাবশতকের অধিকাংশ কবিতা এখানে ছাপা হয়েছিল। উদ্ধৃত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হরিশচন্দ্র মিত্র", পৃঃ ৪১-৪২। হরিশচন্দ্রের জীবনীর বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন ঐ একই গ্রন্থ।

৬২. চিত্তরঞ্জিকা, অবকাশ রঞ্জিকা, কাব্য প্রকাশ ও মিত্র প্রকাশ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে, ১৮৬২ (মে), ১৮৬২ (সেপ্টেম্বর), ১৮৬৪ (জানুয়ারী) এবং ১৮৭০ (মে) সালে।

৬৩. ব্রজেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০।

৬৪. কেদারনাথ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৬।
৬৫. ঐ, পৃঃ ৫৬৩।
৬৬. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, অনাথনাথ বসু, "মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ", কলকাতা, ১৩২৭ (বাংলাসন) এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "শিশির কুমার ঘোষ", কলকাতা, ১৯৬১।
৬৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "হরিনাথ মজুমদার", কলকাতা, ১৯৬১, পৃঃ ১৫।
৬৮. "ঢাকা প্রকাশ", ১. ৭. ১৮৮৮।
৬৯. ব্রজেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।
৭০. ঐ, ব্রজেন্দ্রনাথ, "কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার", পৃঃ ১৯।
৭১. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০।
৭২. *Administration Report of Bengal, 1872-73.*
৭৩. বিনয় ঘোষ, "বাংলার বিদ্বৎসমাজ", কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ৭৪।
৭৪. A. J. Turberville, ed. Johnsons England, An Account of Life and Manners of his Age, উদ্ধৃত, ঐ, পৃঃ ১৩৫।
৭৫. ঐ, পৃঃ ৫৮-৫৯।
৭৬. এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য উল্লেখ্য। ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে আগে তিনি লিখেছিলেন, 'সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজিকার দিনে বাঁচিয়া নাই; তাহা হইলে সভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। রায়তরঙ্গিনী, শ্যামতরঙ্গিনী, নববাহিনী, ভববাহিনী প্রভৃতি সভার জ্বালায় তিনি কলিকাতা ছাড়িতেন সন্দেহ নাই, কলিকাতা ছাড়িলেও নিস্কৃতি পাইতেন, এমন নহে। গ্রামে গেলে দেখিতেন. . . সভা সকল সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে।' বঙ্কিম রচনাবলী, বিবিধ খণ্ড, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবিতা সংগ্রহ, ভূমিকা ১২৯২, উদ্ধৃত, বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২।
৭৭. ঐ, পৃঃ ৭২ ও পৃঃ ৮১।
৭৮. Anil Seal, *The Emergence of Indian Nationalism,* Cambridge (U. K.) 1968, p. 194.
৭৯. টেম্পলের বক্তৃতা, উদ্ধৃত হয়েছে, ঐ, পৃঃ ২০৫।
৮০. *Address by the Hon'ible Sir George Campbell,* Calcutta, 1874, p. 4.
৮১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "সংবাদপত্রে সেকালের কথা", দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৪০, পৃঃ ৯০।
৮২. এ বিষয়ে, জুলাই ১৮৩১ সালে 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল' 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া'র জনৈক সংবাদদাতার সংবাদ উদ্ধৃত করে জানিয়েছিল,

'The formation of this and other similar societies show that India is making daily advancement in civilization and knowledge of political rights and few years ago many a

zamindar would tamely submit to orders, which although given by public authorities, have not the least stamp of legality, but at present we find them ready to oppose such measures with firmness. Like every other civilized nation, they are assiduously ascertaining legal demands of Government and respectfully petitioning the rulers for the modification and repeal of Public laws as are in—famous to them as a body.' উদ্ধৃত, Rajat Sanyal, *Voluntary Associations and the Public Life in Urban Bengal,* Calcutta, 1980, p. 208.

৮৩. "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়", ১৯.২.১৮৫১।

৮৪. "সংবাদ প্রভাকর", ৮ আশ্বিন ১২৫৮।

৮৫. "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়", ৪.৮.১৮৫২ ; এবং বেথুন সোসাইটির ওপর বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, যোগেশচন্দ্র বাগল, "বেথুন সোসাইটি", কলকাতা।

৮৬. "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়", ১৮৫৯ ও ২৯.২.১৮৫৩।

৮৭. এ উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে—
Report on the Administration of Bengal, 1870-71—1889-90.

৮৮. *Report on the Administration of Bengal,* 1871-72—1899-1900.

৮৯. ১৮৮২-৮৩ সালের সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় প্রচুর স্কুলে এ ধরনের সভা ছিল যারা সরকারের কাছে কোন রিপোর্ট দাখিল করেনি। ঐ, ১৮৮২-৮৩।

৯০. সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে উড্ডি লিখেছেন, ভারতীয় সংস্কারবাদীরা ছিলেন নতুন মধ্য শ্রেণীর (প্রফেশনাল এলিট) যার মধ্যে ছিল স্কুল কলেজের শিক্ষক, উকিল এবং আমলা, দেখুন—G. A Oddie, *Social Protest in India,* New Delhi, 1979, p. 6.

৯১. Anil Seal, *The Emergence of Indian Nationalism*, Cambridge, 1968, p. 194.

৯২. যেমন হিতেশ রঞ্জন স্যান্যাল লিখেছেন, আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সামাজিক মর্যাদার আশায় প্রচুর মন্দির নির্মাণ করেছিল যা এক ধরণের সামাজিক গতিশীলতা। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মনোগ্রাফে দেখিয়েছেন, আদম শুমারীর সময় দেখা গেছে, নিম্নবর্গের লোকেরা সম্মান বৃদ্ধির আশায়, নিজেদের ভিন্ন গোত্রের বলে পরিচয় দিয়েছে। এ মনোভঙ্গী তাঁর মতে, সামাজিক সচলতার লক্ষণ। বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন. Hitesh Ranjan Sanyal, 'Temple building in Bengal from the Fifteen to the Nineteenth Century' in Barun De (ed) *Perspectives in Social Science I,* Calcutta

1977 ; Sekhar Bandyopadhyay, *Caste, Class and Census : Aspects of Social Mobility under British Rule in the Late Nineteenth and Early Twentieth Century Bengal 1872-1931*, Calcutta, 1982.

৯৩. *Report on the Administration of Bengal 1877-78*, এ সভার উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানোন্নয়ণ। সভ্য সংখ্যা ছিল পুরুষ : ৮, কিশোর : ২৮, ধর্মস্বের পরিমাণ ছিল ৬ রুপি ১২ আনা।

৯৪. ঐ, ১৮৮১-৮২, সভার উদ্দেশ্য ছিল বক্তৃতাও রচনা লেখার অভ্যাস গড়ে তোলা।

৯৫. ঐ, ১৮৭৪-৭৫, সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০।

৯৬. ঐ, ১৮৭৫-৭৬, সভার উদ্দেশ্য ছিল ঢাকা জেলার মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার। সভ্য সংখ্যা ছিল পুরুষ : ৫৪, মহিলা : ৬।

৯৭. ঐ, উদ্দেশ্য ছিল মদ্যপান নিরোধ, মহিলাদের মধ্যে উচ্চ প্রচার, সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রচার, বিবাহ প্রথার সংশোধন। সভ্য সংখ্যা ছিল পুরুষ : ৯০০।

৯৮. কালী প্রসন্ন ঘোষ "নারী জাতি বিষয়ক প্রস্তাব", কলকাতা, ১৯২৬, পৃঃ ১০৮-১০৯।

৯৯. *Report of the Tenth National Social Conference held in Calcutta (January 1897)*, Poona, 1897, pp. 95-96.

১০০. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, "বিক্রমপুর হিতসাধিনী সভার কার্য বিবরণ", ১ম ভাগ, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৮৭২।

১০১. "ঢাকা প্রকাশ", ১৫. ৯. ১৮৭২। ঢাকায় এ সভার মূল বৈঠকটি হয়েছিল।

১০২. "নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়", পৃঃ ৯০।

১০৩. *Report on the Administration of Bengal*, 1884-85.

১০৪. *Bengal Times*, 31. 3. 1883.

১০৫. "গৈলা ছাত্র সম্মিলনী সভার প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের কার্যবিবরণ" (১২৮৭-৯৯), ঢাকা, ১৮৮২, পৃঃ ১।

১০৬. ঐ।

১০৭. ঐ।

১০৮. ঐ, পৃঃ ১৬।

১০৯. "কন্যাপন নিবারিণী সভার বিবরণ", বগুড়া, ১৮৮১, পৃঃ ৭-৮।

১১০. ঐ, পৃঃ ৮-১২।

১১১. ঐ. পৃঃ ৭-৮।

১১২. সারদাচরণ ঘোষ, (সম্পাদিত) "আরতি", দ্বিতীয় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, ময়মনসিংহ, মাঘ, ১৩০৮।

১১৩. শ্রীনাথ চন্দ, "ব্রাহ্ম সমাজে চল্লিশ বৎসর", ময়মনসিংহ, ১৯১৩, পৃঃ ৩৯।

১১৪. কালীকৃষ্ণ ঘোষ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫।
১১৫. *Report of the Tenth National Social Conference*, p. 91.
১১৬. ঐ।
১১৭. ঐ, পৃঃ ৯১-৯৩।
১১৮. ঐ, ৯১।
১১৯. ঐ, ৯৬।
১২০. "নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়", পৃঃ ১২।
১২১. আদিনাথ সেন, "দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ", কলকাতা, ১৯৪৮, পৃঃ ১৪৪।
১২২. রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাংলা সাময়িক পত্র", দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৩।
১২৩. Rafiuddin Ahmed, 'The Role of Associations and Anjumans in the Political Mobilization of the Bengali Muslims in the later Nineteenth Century, *Bangladesh Historical Studies*, Vol. IV, 1979, p. 41.
১২৪. ঐ, পৃঃ ৪২।
১২৫. "ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক কার্য বিবরণ১৮৮৩", ঢাকা, ১৮৮৪, পৃঃ ৫-৬।
১২৬. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী', মাহেনও, ১৯৭৪, উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, "উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা", ঢাকা, ১৯৮৩ পৃঃ ১৭৭।
১২৭. ঐ, ১৮৮৬-৮৭, পৃঃ ২।
১২৮. ওয়াকিল আহমদ, "বাংলার বিদ্বৎসভা ; ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ৭ম সংখ্যা, জুন, ১৯৭৮।
১২৯. দেখুন, সম্মিলনীর প্রথম ও তৃতীয় বর্ষের রিপোর্ট।
১৩০. "ঢাকা প্রকাশ", ২১.১২.১৮৮৫।
১৩১ ক. আবদুল কাইউমের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা, ঢাকা, ১৯৮৩।
১৩১. Ahmad Hasan Dani, '*Dacca*' Dacca, 1962, p. 123.
১৩২. ইসলাম প্রচারক, উদ্ধৃত, উশবামু।
১৩৩. উদ্ধৃত।
১৩৪. ইবনে মাযুদ্দিন আহমদ, "আমার সংসার জীবন", কলকাতা, ১৯১৪।
১৩৫. ঐ, পৃঃ ৪৩-৪৪।
১৩৬. ঐ, পৃঃ ১১৩-১৪৪।
১৩৭. ঐ।
১৩৮. ঐ, পৃঃ ১১৫।
১৩৯. ঐ, পৃঃ ১০৮।
১৪০. ঐ, পৃঃ ১১৫।

১৪১. আনিসুজ্জামান, "মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য" পৃঃ ৪৪৭।

১৪২. আনিসুজ্জামান, "মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র", পৃঃ ৪০।

১৪৩. "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা", ৩০. ১২. ১৮৭৪।

১৪৪. "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা", জুলাই, ১৮৬৯ (শ্রবাণ ১ম পক্ষ, ১২৭৬)।

১৪৫. কালীকৃষ্ণ ঘোষ, "সেকালের চিত্র", পৃঃ ৮৭।

১৪৬. শ্রীহট্টবাসি শর্ম্মন, "রামকুমার চরিত", কলকাতা, ১৩২৬, পৃঃ ১২৩।

১৪৭. এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬৬ সালে সরকারী অনুবাদকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—
In all matters political and social, the native Editors assent and claim a right to equality of privileges with Europeans, and it has not been a little gratifying to them to find that of late some of their fellow countrymen have had the courage to return a European blow for blow. Though timidity is still a prevailing characteristic, it is to be hoped that it will give place to boldness in action as well in speech. There are certain points on which they appear to be peculiarly sensitive, as where a European criminal has not been meted out a punishment similar to that which would have been expected to attend a Native guilty of a like crime. Any such apparent leniency is attributed to national feeling.
উদ্ধৃত, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৮।

১৪৮. ভারত মিহির, ২২. ৬. ১৮৮০, *RNP.* নং ২৭, ১৮৮০।

১৪৯. ঐ, ১৩. ৩. ১৮৭৮, ঐ, নং ৭, ১৮৭৮।

১৫০. "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা", ৩০. ২. ১৮৭৫, ঐ, নং ৭, ১৮৭৫।

১৫১. এ উপলক্ষে হরিনাথ রচিত গানটি বেশ দীর্ঘ। গানের প্রথম কয়েকটি চরণ ছিল এরকম—

'দেশে চলিলে মহামতি রিপন, রামরাজ্য সম প্রজা করিয়ে পালন।
সুশাসনে এ ভারতে, ছিল প্রজা নিরাপদে,
(তব ন্যায়পরতায়, সাম্যনীতি) তোমার বিরহে কাঁদে নরনারীগণ।
আমরা কাঙ্গাল, কাঙ্গাল বেশে এসেছি তব উদ্দেশে,
(হের কৃপা নয়নে, সাধারণ দেশের দশা)
দেশের দশা প্রকাশ বেশে কর নিরীক্ষণ।
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, জানাতে নাহি ক্ষমতা,
(জ্ঞান অর্থহীন হে, আমরা পল্লীবাসী, ধর চক্ষের জল হে, অন্য সম্বল নাই)
রাজভক্তি সরলতা ভারতবর্ষের ধন।'

"হরিনাথের গ্রন্থাবলী", কলকাতা. ১৯০১, পৃঃ ৩২৮।

১৫২. হিন্দু রঞ্জিকা, ২১. ৭. ১৮৭৫, *RNP.* নং ৬১, ১৮৭৫।

১৫৩. আবদোস সোবহান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬০।

১৫৪. ক্লে, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।

১৫৫. *A Summary of Reports from the Various Social Reform Association in India for the year 1900*, Bombay, 1900, pp. 95-96.

১৫৬. *A Summary of Reports from the Various Social Reform Association in India for the year 1900*, Bombay, 1900, pp. 95-96.

১৫৭. সুধাকর, ৭. ২. ১৮৯০, *RNP*, নং ১৮৯০।

১৫৮. আনিসুজ্জামান, "মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য", পৃঃ ৪৫৩।

১৫৯. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, রফিউদ্দিন আহমেদ. প্রাগুক্ত।

১৬০. এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ব্রাহ্ম কর্মী কৃষ্ণকুমার মিত্রের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর আত্মজীবনীতে, উনিশ শতকের শেষার্ধে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

'আমরা বাল্যকালে গ্রামস্থ মুসলমানদিগকে ভাই, কাকা ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করিতাম। হিন্দু মুসলমানে কোন প্রকার অসদ্ভাব ছিল না। মুসলমানরা হিন্দুদের বাড়ীতে আঙ্গিনায় পাত পাতিয়া আহার করিত এবং গোবর দিয়া আহারের স্থান পরিস্কার করিত। সেকালে মুসলমানেরা আপনাদিগকে নীচ মনে করিত . . , তবুও মুসলমানদের মনে অসন্তোষের উদয় হইত না। একালে অনেক মুসলমান শিক্ষিত হইয়াছেন, তাই তাঁহারা হিন্দুর অপেক্ষা আপনাদিগকে কোন মতে হীন মনে করেন না। মোল্লারা অশিক্ষিত মুসলমানদিগের মনে আত্মসম্মান জাগাইয়া দিতেছেন, সুতরাং হিন্দুদিগের ব্যবহারে তাহারা অসন্তুষ্ট হইতেছে.' কৃষ্ণকুমার মিত্র, "আত্মচরিত", কলকাতা, ১৩৮৯, পৃঃ ৩৫।

* সারণী ১৩ এবং ১৫ প্রস্তুত করা হয়েছে নিম্নলিখিত সূত্র সমূহ থেকে— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাংলা সাময়িক পত্র" (দু'খণ্ড), কলকাতা, ১৩৭৯, ১৩৮৪। "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ১৮৬৪-১৯০?। *RNP*, 1875-1905. 'Bengal Library Catalogue', *Appendix to Calcutta Gazette*, Calcutta, 1880, 1894-95, 1897-98. এ ছাড়া বেশ কয়েকটি আত্মজীবনী থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

উপসংহার

বর্তমান গ্রন্থের আলোচনায়, পূর্ববঙ্গের সমাজ ও ইতিহাসের তিনটি প্রধান সূত্র উন্মোচিত। সূত্র তিনটি হচ্ছে— ১. আঞ্চলিকতা, ২. শ্রেণী ও সম্প্রদায় বিন্যাস এবং ৩. গণমাধ্যমের ব্যবহার ও চেতনা।

আঞ্চলিকতা পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে। বর্তমানে জাতীয় চেতনার সৃষ্টি হলেও ইতিহাসের পরিসরে দেখা গেছে এ অঞ্চলে দু'ধরনের আঞ্চলিকতা সমান্তরালভাবে অবস্থান করেছে। সেই সমান্তরালতা এখনো অব্যাহত।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে প্রশাসন যন্ত্রের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন সম্পর্ক ছিল না বা তার কোন স্থানও ছিল না সেখানে। সাধারণ মানুষের জীবনধারার ওপর প্রশাসন চাপানোর ফলে গ্রামাঞ্চলে মানুষের মধ্যে তৈরী হয়েছে আত্মরক্ষার প্রবণতা এবং ক্রমান্বয়ে এ থেকেই তৈরী হয়েছে এক ধরনের আঞ্চলিকতা। গ্রামাঞ্চলে প্রবলশ্রেণীর একাংশের সঙ্গে প্রশাসনের সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ প্রশাসনে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। তার দরুন তারা অধস্তন থেকেছে অদ্যাবধি।

পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-৭১) এবং বর্তমান বাংলাদেশেও প্রশাসনের সংযুক্তিকরণের জন্যে নানারকম পরীক্ষা নীরিক্ষা চালানো হয়েছে, কিন্তু গ্রাম ও প্রশাসনের সংযুক্তিকরণ সম্ভব হয়নি। এ বিচ্ছেদ, এই অঞ্চলের একপক্ষে ইতিহাস ও সমাজ বিন্যাসের সূত্র।

একদিকে জনসাধারণ অন্তর্ভুক্ত হয়নি প্রশাসনে, অন্যদিকে, এ কৃষি নির্ভরতা যার বৈশিষ্ট্যগুলি এখনও বিদ্যমান এবং উৎপাদন পদ্ধতির নিশ্চলতার দরুন সমাজ বিন্যাসে সমান্তরালভাব থেকে গেছে বহু স্তর। এ কারণে, আঞ্চলিক চেতনার নানা উপাদান, যেমন, যোগাযোগ মাধ্যম,

স্হাপত্য বা লোকশিল্পের গড়নের পরিবর্তন হয়নি এখনও তেমন। উনিশ শতকে কেন্দ্র থেকে পূর্ববঙ্গের দূরে অবস্থান এবং প্রতিটি অঞ্চলের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা আবার এ অঞ্চলে সৃষ্টি করেছিল সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও সাংস্কৃতিক অসমতার যা বর্তমানেও দূর করা সম্ভব হয় নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দারা মনে করেন তারা অবহেলিত পূর্বাঞ্চলের তুলনায়, যেমন, উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের বাসিন্দারা মনে করতেন তাঁরা অবহেলিত পশ্চিমবঙ্গের তুলনায়। বর্তমানেও বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দারা উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্হাপনে অনীহা প্রকাশ করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আঞ্চলিকতার রেশ এখনও লুপ্ত হয়নি বরং বাংলাদেশের জনসমষ্টির চেতনায়, স্মৃতিতে, ব্যবহারে বহমান।

উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের কারণে, পূর্ববঙ্গে তৈরী হয়েছিল তিনটি শ্রেণী—জমিদার, মধ্যশ্রেণী ও সাধারণ মানুষ বা অন্য কথায়, প্রবল শ্রেণী যার অন্তর্গত ছিল প্রথমোক্ত দু'টি শ্রেণী এবং অধস্তন শ্রেণী যার অন্তর্গত ছিল সাধারণ মানুষ। শ্রেণীবিন্যাসে মধ্যশ্রেণী ছিল বলীয়ান। ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের মধ্যে ব্যক্তি একই সঙ্গে এবং সমান্তরালভাবে যুক্ত ছিল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের সঙ্গেঃ এই সমান্তরাল যুক্ততা তৎকালীন শ্রেণীবিন্যাস ও সম্প্রদায় বিন্যাসের ওপর তৈরী করেছিল প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া।

পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক সমাজ গঠনের মধ্যে গ্রামীণ বিন্যাস ছিল প্রবল। অপর পক্ষে, গ্রামীণ বিন্যাসের মধ্যে বাজার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার সীমাবদ্ধ ছিল বলে ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে এক ধরনের নিশ্চলতা বিদ্যমান ছিল যে ক্ষেত্রে শ্রেণীযুক্ততা ও সাম্প্রদায়িক যুক্ততার মধ্যে প্রবল কোন ভিন্নতা তৈরী হয়নি। কিন্তু, ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের পরবর্তী পর্যায়ে, একপক্ষে, বাজারের বিকাশ ও অপরপক্ষে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ও এর সঙ্গে সম্পর্কিত কৃষিজ পণ্যের বিস্তারের দরুন সমাজ বিন্যাসের মধ্যে শ্রেণীবিন্যাস ও সম্প্রদায়গত (কমিউনিটি) বিন্যাসের মধ্যে ভিন্নতার তৈরী শুরু হয়েছিল। সমাজবোধ। গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী ও সম্প্রদায় ছিল সম্পৃক্ত। সাম্প্রদায়িকতা যা উনিশ শতকের শেষার্ধ ও বিশ শতকের গোড়ার দিককার ফসল তা দেখা দিয়েছিল প্রশাসনের স্বার্থে।

গ্রামাঞ্চলে বা সাধারণ মানুষের পর্যায়ে, সাম্প্রদায়িক চেতনার মতাদর্শগত যুক্তি তৈরী করেছে ধর্ম ও এর সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠান। এ দুটোকে সমর্থন দিয়েছে প্রশাসন। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের মনে

ধর্মান্ধতা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি কারণ ধর্মের লোকজ ব্যবহার জন-সাধারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেছে। এ দ্বিত্বতা পূর্ববাংলার ইতিহাস ও পরিসরে কাজ করেছে। সে জন্যে প্রবল শ্রেণী বা মধ্য বা তার ওপরের শ্রেণীর পর্যায়ে ধর্মের এই দ্বৈততাবোধ থেকে তৈরী হয়েছে ধর্মান্ধতা বা ধর্মনিরপেক্ষতা যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন যোগ নেই। কারণ, গ্রামাঞ্চলে ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানাশ্রিত কোন স্পষ্টতা ছিল না, এখনো নেই। ফলে, উনিশ শতকে তো বটেই, বিশ শতকেও দেখি, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ, সংঘাতের কেন্দ্র প্রধানত শহর, গ্রাম নয়।

বর্তমানে জমিদার নেই, তার স্থান নিয়েছে নব্য ধনী কিন্তু ঔপনি-বেশিক সমাজ গঠনের দরুন সৃষ্ট সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় নি। নব্য পুঁজিপতিরা নির্ভরশীল ব্যবসায় এবং ফাটকাবাজীর ওপর। এর মাধ্যমে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত বিনিয়োগ করে সে ভোগবিলাসের জন্যে। মধ্যশ্রেণী এখনও বলীয়ান কিন্তু বুর্জোয়া বিকাশ সম্পূর্ণ হয় নি এখনও বরং তা আবার ক্ষয়ের পথে। সামাজিকভাবে, সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে তার যোগ নেই কিন্তু সামাজিক নেতৃত্ব তারই হাতে। উনিশ শতকে এ কারণে মধ্যশ্রেণীর রাজনীতি হয়ে উঠেছিল সমঝোতাপূর্ণ এবং বিকৃত। সে ধারা এখনও বহমান।

উনিশ শতকে সাম্প্রদায়িক বিন্যাসের ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভূমিকাই ছিল মুখ্য এবং সম্প্রদায় হিসেবে তারাই ছিল প্রবল। বর্তমানে, সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানরাই প্রবল। কিন্তু তাই বলে, সমাজের বিন্যা-সের মধ্যে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে যে সম্প্রদায়গত ভিন্নতা তৈরী হয়েছিল তা দূর হয়নি। সম্প্রদায়গত ভিন্নতার অন্যতম উপাদান ছিল ধর্ম এবং ধর্মবোধজনিত দূরত্ব। এর একটি উদাহরণ, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে একটি রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল কিন্তু নীতি হিসেবে পরবর্তীতে তা বহাল থাকে নি।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে, পূর্ববঙ্গে সংবাদপত্র ও সভাসমিতির উদ্ভব ও বিকাশ এক হিসাবে পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের সমান্তরালে হিন্দু সম্প্রদায় ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিকাশের ইতিহাস। আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর জাগরনের প্রধান উপাদান হিসাবে যদি উপরোক্ত দু'টি উপাদানকে ধরি, তা'হলেও দেখা যাবে, সংবাদপত্র ও সভাসমিতির উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের

জাগরণের উদ্ভব ও বিকাশ।

বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সংগঠন ছিল শহরাশ্রিত যা এখনও আছে। শহর, মফস্বল বা গ্রাম পর্যায়ে দেখি প্রধান প্রধান পেশার সঙ্গে বা অন্যকথায় প্রবল শ্রেণীর সঙ্গে এগুলি যুক্ত। ফলে, পূর্ববঙ্গে অধস্তন শ্রেণী নিজেদের সংগঠন ও গণমাধ্যম তৈরী করতে পারেনি। না পারার দরুন, প্রবল শ্রেণী অধস্তন শ্রেণীর মুখপত্র হিসেবে কাজ করেছে। ফলে, অধস্তন শ্রেণী প্রবলভাবে উপরোক্ত দু'শ্রেণীকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হয়নি, যে ধারা এখনও বর্তমান।

কিন্তু তার মানে কি অধস্তন শ্রেণী বিদ্রোহ বা আন্দোলন করেনি? উনিশ শতকের যে আন্দোলনগুলি আলোচনা করেছি তাতে দেখা গেছে সেগুলি ছিল মধ্যশ্রেণীর আন্দোলন যা নিয়ে অধস্তন শ্রেণীর কোন উৎসাহ ছিল না। কৃষকদের বিদ্রোহ নিয়েও মধ্যশ্রেণী আগ্রহ দেখায় নি। কৃষকরা বিদ্রোহ করেছে কিন্তু তাঁরা শত্রু নির্ণীত করতে সক্ষম হয় নি। নেতৃত্ব তৈরীর অক্ষমতার জন্যে তাদের অধস্তন থাকতে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। তা'ছাড়া উল্লেখ্য যে, কৃষক বিদ্রোহগুলির কোন ধারাবাহিকতা ছিল না। এগুলি ছিল নদীর তরঙ্গের মত, উঠেছে এবং তারপর মিলিয়ে গেছে। কিন্তু কৃষকদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারা এখনও বহমান, তার প্রমাণ, তে-ভাগা আন্দোলন, বৃটিশ ও পাকিস্তানী আমলে হাজং আন্দোলন, স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে আত্রাই আন্দোলন।

শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী, বুদ্ধিজীবীদের পরস্পর বিরোধী আচরণ ও আবেদন নিবেদনের রাজনীতির ঐতিহ্য এখনও লুপ্ত হয়নি তবে এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল ১৯৬৯ এর গণ আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে। কিন্তু ১৯৬৯ বা ১৯৭১ ব্যতিক্রম ধর্মী বলে চিহ্নিত হত না, যদি না অধস্তন শ্রেণীর ভূমিকা এসবে প্রবল হত। অধস্তন শ্রেণীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের দরুন এবং তাদের সন্তানসন্ততি ছাত্র সংগঠনে প্রবল ভূমিকা পালনের দরুন ১৯৭১ এর পর মধ্যশ্রেণী সংলগ্ন রাজনৈতিক দলগুলি সমাজতন্ত্রের কথা কোন না কোনভাবে উচ্চারণ করেছে। অন্যপক্ষে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দরুন, মধ্যশ্রেণীর একাংশ যুক্ত হচ্ছে অধস্তন শ্রেণীর সঙ্গে। তাই মনে হয়, ঔপনিবেশিক আমল থেকে এ পর্যন্ত, সমাজ গঠনের পরিসরে মধ্যশ্রেণী প্রধান ভূমিকা পালন করলেও অচিরেই তারা অধস্তন শ্রেণীর বহুমুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে।

পরিশিষ্ট ঃ ১

(১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ উপলক্ষে ইংরেজ পক্ষ সমর্থনকারী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ঢাকা নিউজ' এর একটি নিবন্ধ)

The Hero of Dacca

'We hear of natives being rewarded every where for the conduct during mutinies. As those who did their duty in Dacca, with the exception of Kajeh Abdool Gunny who subscribed a lakh of ropees to the 5 percent loan, were Europeans, Armenians and Eurasians, we do not wonder that no thanks or praise has been meted out to any one here. We are however anxious that we should have atleast one distinguished fellow citizen, and that at least a few drops from that river of bounty which the Gevernor General is causing to flow in the North-West, should trickle towards Dacca. We should therefore recommend to the Right Honorable the Governor-General, for a pensios of Four Rupees per mensem, Amdhoo, one of the Garrywans of the Municiple Committee, who, on the morning of the 21st of November last, drove his car laden with ammnunition for the sailors guns to the Lall Bagh, and when the fight there began, didnot only not run away as did his fellow Garrywan, but made himself extremely useful try carrying ammunition from

his cart to the guns. It must be remembered that this was a service of no slight danger, as our great loss of men was at the guns. We are assured that this poor fellow acted with the greatest coolness and self possession, and we do not see why he should not be made independant happy for his life at a ridiculously small expense to Government. The fact as to whether he acted or not as he is said to have done can easily be established by a reference to Mr. Lewis. Let us have at least one rewarded man in Daeca. The man we have recommended is in everyway qualified. He has acted well and is a native. We should have wished to say something about batta and prize money to our sailors, but as they are Europeans it would be but a waste of time to do so. They must be content with being branded as a set of blood thirsty ruffians by M. Layard.'

Source : *Dacca News*, 5. 7. 1858.

পরিশিষ্ট ঃ ২

পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের তালিকা ১৮৯২

অঞ্চলের নাম ঃ	স্থাপনের সময়
১। ঢাকা	১৮৪৬
২। কুমার খালী	১৮৪৮
৩। কুমিল্লা	১৮৫৪
৪। ময়মনসিংহ	১৮৫৪
৫। চট্টগ্রাম	১৮৫৫
৬। বিনলিয়া (রাজশাহী)	১৮৫৮
৭। পাবনা	১৮৫৭
৮। সিলেট	১৮৬১
৯। কিশোরগঞ্জ	১৮৬১
১০। রংপুর	১৮৬৪
১১। বাগ আঁচড়া (যশোর)	১৮৬৪
১২। ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া	১৮৬৩
১৩। দিনাজপুর	১৮৬৮
১৪। ফরিদপুর	১৮৫৭
১৫। ময়মনসিংহ (শাখা)	১৮৬৯
১৬। কাকিনিয়া (রংপুর)	১৮৬০
১৭। ঝিনাইদহ	১৮৭৬
১৮। নোয়াখালী	১৮৭৬
১৯। পিরোজপুর	১৮৭৮
২০। সৈয়দপুর	১৮৭৮
২১। সিরাজগঞ্জ	১৮৭৪

২২।	কুষ্টিয়া	১৮৭৯
২৩।	ময়মনসিংহ (নববিধান)	১৮৭৯
২৪।	কুড়িগ্রাম	১৮৮০
২৫।	ঢাকা (নববিধান)	১৮৮০
২৬।	মজিলপুর (কুষ্টিয়া)	১৮৮১
২৭।	মুরাদনগর (কুমিল্লা)	১৮৮১
২৮।	বরিশাল	১৮৮২
২৯।	বরিশাল (ব্রাহ্মিকা সমাজ)	
৩০।	রংপুর (ভারতবর্ষীয় সমাজ)	১৮৮৩
৩১।	মুন্সিগঞ্জ	১৮৮৬ (১৮৭৬ ?)
৩২।	বাগের হাট	১৮৮৩
৩৩।	ফেনী	১৮৮৪
৩৪।	নিলফামারী	১৮৮৫
৩৫।	চট্টগ্রাম (প্রার্থনা সমাজ)	১৮৮৭
৩৬।	বজ্রযোগিনী (ঢাকা)	১৮৮৭
৩৭।	টাংগাইল	১৮৮৭
৩৮।	তিলি (ঢাকা)	১৮৮১
৩৯।	সাতক্ষীরা	১৮৮৯
৪০।	নওগাঁ	১৮৯১
৪১।	নারায়নগঞ্জ	১৮৯১
৪২।	নাটোর	১৮৯১

উৎস : শিবনাথ শাস্ত্রীর, *History of the Brahmo Samaj* গ্রন্থের ১৮৯২ সালের ব্রাহ্মসমাজ সমূহের তালিকা থেকে উপরোক্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট ঃ ৩

(সহবাস সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে কায়কোবাদের কবিতা)

ভিক্টোরিয়ার প্রতি ভারত ললনা

কোথা গো মা ভিক্টোরিয়া, হের একবার
　　কোটি কোটি কন্যা তব করিছে রোদন।
সকলের মুখে আজি ঘোর হাহাকার,
　　যায় গো মা জাতি ধর্ম্ম, সতীত্ব রতন।
প্রানাধিক প্রিয় মাগো এ পবিত্র ধন,
যাহার অভাবে পৃথ্বী ঘোর অন্ধকার।
এ রত্নের কাছে মাগো ছার এ জীবন,
বুঝি মা অদৃষ্ট দোষে রহিল না আর।
রাজ প্রতিনিধি মাগো না বুঝিয়া হায়,
অই দেখ সমুদ্যত করিতে সংহার।
ভীষণ শানিত খড়গ হানিছে মাথায়,
কে রক্ষে মা এ সময়ে তুমি বিনে আর ?
লজ্জাবতী প্রায় যারা লাজে ঢলে পড়ে,
চন্দ্রসূর্য যাহাদের দেখিতে না পায়।
কোটি দর্শকের কাছে ডাক্তারের করে
কোন প্রাণে পরীক্ষিত হইবে মা হায় ?
নিরখি কন্যার সেই লাঞ্ছনা গভীর,
কেমন নির্ম্মম প্রাণে সহিবে বসিয়া ?
সেই রোদনের স্বর, নয়নের নীর
তোমার চরণ প্রান্তে মিশিবে যাইয়া।
বহুদূরে আছি বলে বেধেঁছ কি প্রাণ ?

ছিড়ে গেছে সেই মায়া ক্ষমতার ডোর।
শুধু কি বৃটেনবাসী তোমার সন্তান।
ক' মা স্পষ্ট করে আমরা কি কন্যা নই তোর ?
আজি এ বিপদে পড়ে ডাকি মা তোমায়,
কোথা তুমি এ সময় ? দেও গো "অভয়"।
তোমার একটি বাক্য, কোটি অস্ত্র পায়
রক্ষিবে দুঃখিনী দলে, করি পরাজয়
শত্রু পক্ষ, এস আর বিলম্ব না সয়,
নিরাশায় অর্দ্ধমৃত তব কন্যাগণ ;
এখনি বিপক্ষ, ধর্ম লুন্ঠিবে নিশ্চয়
তোমার ঘোষণা পত্র করিয়া লঙ্ঘন
স্বামী মম প্রেমাস্পদ কি আছে ধরায়,
সাক্ষাৎ দেবতা স্বামী, প্রাণ তুল্য ধন।
জন্ম শোধ কারাগারে পাঠাইয়া তায়,
বল কি মা ল'য়ে প্রাণ করিব ধারন ?
একসূত্রে যার মনে বাঁধা এ জীবন,
কেমন ত্যাজিয়া পরে বহিব ভুবনে ?
মা হয়ে, ছিড়িয়ে সেই স্নেহের বন্ধন,
কন্যার বৈধব্য তুমি হেরিবে কেমনে ?
কোন মা কন্যার দুঃখ করিয়া লোকন,
নাহি ফেলে একবার নয়নের জল।
কোন দোষে তুমি আজি বিদার এমন,
পাষানে বেঁধেছ কি গো হৃদয় কোমল ?
দয়াময়ী তুমি, মাগো হ'ওনা নির্দয়,
স্নেহের দুহিতাগনে রক্ষ এ বিপদে।
তব স্নেহময় ক্রোড়ে লইনু আশ্রয়,
ফেল না মা অবহেলে কলঙ্কের হ্রদে।

২রা চৈত্র। শ্রী কায়কোবাদ

উৎস ঃ "ঢাকা প্রকাশ," ২'৩ চৈত্র, ১২৯৭, ৩১ বর্ষ, ৪ সংখ্যা।

গ্রন্থপঞ্জী

১. সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

ক. আত্মজীবনী/জীবনী

অনাথ নাথ বসু, 'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ', কলকাতা, ১৩২৭ (১৯৩৯)।

অমরচন্দ্র দত্ত, 'শরচন্দ্র', ময়মনসিংহ, ১৯০৫।

অমৃতলাল সেনগুপ্ত, 'আচার্য প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী', কলকাতা, ১৯১৫।

আজহার উদ্দিন খান, 'মুহম্মদ শহীদুল্লাহ', (সাহিত্য সাধক চরিতমালা), কলকাতা, ১৩৮৮ (১৯৮১)।

আদিনাথ সেন, 'স্বর্গীয় দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ', কলকাতা, ১৯৪৮।

আবুল মনসুর আহমদ, 'আত্মকথা', ঢাকা, ১৯৭৮।

ইন্দু প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবন চরিত', কলকাতা, ১৯১১।

ইবনে মায়ুদ্দীন আহমেদ, 'আমার সংসার জীবন', কলকাতা, ১৯১৪।

কালীকৃষ্ণ ঘোষ, 'সেকালের চিত্র', কলকাতা, ১৯১৮।

কৃষ্ণকুমার মিত্র, 'আত্মচরিত', কলকাতা, ১৩৮১ (১৯৭৪)।

গিরীশচন্দ্র সেন, 'আত্মজীবন', কলকাতা, ১৯০৬।

গুরুচরণ মহলানবীশ, 'আত্মকথা', কলকাতা, ১৯৭৪।

জগবন্ধু মিত্র, 'প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী', কলকাতা, ১৯১১।

দীনেশচন্দ্র সেন, 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য', কলকাতা, ১৯৬৯।

দুর্গামোহন দাশ, 'জীবনলেখ্য', কলকাতা (প্রকাশকাল নেই)।

দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, 'আত্মজীবনী', (সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত), কলকাতা, ১৯৬২।

দেবেন্দ্রনাথ দে, 'ভাগ্যকূল রায় পরিবার', ঢাকা (প্রকাশকাল নেই)।

মানসী মুখোপাধ্যায়, 'অতুল প্রসাদ', কলকাতা, ১৯৭১।

মীর মশাররফ হোসেন, 'আমার জীবনী', (দেবীপদ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত),

কলকাতা, ১৯৭৭।
রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'জীবনের স্মৃতি দীপে', কলকাতা, ১৯৭৮।
রা. সে. (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার), 'ইতিবৃত্ত', ঢাকা, ১৮৬৮।
রেবতীমোহন দাস, 'আত্মকথা', কলকাতা, ১৩৪১ (১৯৩৪)।
(লেখকের নাম নেই), 'ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী', ঢাকা, ১৯০২।
'নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়', কলকাতা, ১৯২২।
'লক্ষ্মীমণি চরিত', ঢাকা, ১৮৭৭।
'সাধু অঘোরনাথের জীবনচরিত', কলকাতা, ১৩১৬ (১৯০৯)।
শরৎকুমার রায়, 'মহাত্মা অশ্বিনীকুমার', কলকাতা, ১৩৬৪ (১৯৫৭)।
শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', কলকাতা, ১৯৫৭।
শ্রীমতি রাস সুন্দরী, 'আমার জীবন', কলকাতা, ১৩০৫ (১৮৯৮)।
শ্রীমদ যোগাশ্রমী পন্ডিত, শিবেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী 'বাংলার পারিবারিক ইতিহাস', ষষ্ঠ খন্ড, ঢাকা
সাহিত্যাচার্য সম্পাদিত, (প্রকাশ কাল নেই)।
শ্রীনাথ চন্দ, 'ব্রাহ্ম সমাজে চল্লিশ বৎসর', ময়মনসিংহ, ১৯১৩।
শ্রীহট্টবাসি শর্ম্মন, 'রামকুমার চরিত', কলকাতা, ১৩২৬ (১৯১৯)।
সুদক্ষিনা সেন, 'জীবন স্মৃতি', কলকাতা, (প্রকাশকাল নেই)।
সুবলা আচার্য, 'ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য জীবন প্রসঙ্গ ও উপদেশাবলী', কলকাতা, ১৯৭৩।
হরসুন্দরী দত্ত, 'স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের জীবন কথা', [প্রকাশ স্থল ও তারিখ উল্লিখিত হয় নি।
হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, 'স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস', রংপুর, ১৩৩৩ (১৯২৬)।
হেমলতা সরকার, 'স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ববঙ্গে শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম্মান্দোলনের আংশিক চিত্র', কলকাতা ১৯১৫।
নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন' ''নবীনচন্দ্র রচনাবলী'', (সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত), দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা, ১৩৬৬ (১৯৫৯)।
প্রকাশচন্দ্র রায়, 'অঘোর প্রকাশ', কলকাতা ১৯০৭।
প্রমোদাকিশোর সরকার, 'মহর্ষি ভুবনমোহন', ঢাকা, ১৯২৩।
বঙ্গচন্দ্র রায়, 'আত্মজীবনী', [প্রকাশ স্থল ও তারিখ উল্লিখিত হয় নি]।
বংকবিহারী কর, 'মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনবৃত্তান্ত', ঢাকা, ১৩১৭ (১৯১০)।
বংকবিহারী কর, 'স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেনের জীবনবৃত্তান্ত', কলকাতা, ১৩২৫ (১৯২০)।

বঙ্কবিহারী কর, 'ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্তের জীবনবৃত্তান্ত', কলকাতা, ১৯২৪।
বঙ্কবিহারী কর, 'ব্রহ্মার্পিত চিত্ত স্বর্গীয় নবদ্বীপচন্দ্র দাসের জীবনবৃত্তান্ত', ঢাকা, ১৯৩৩।
বামাসুন্দরী গুপ্ত, 'বামাচরিত', ঢাকা, ১৮৯৫।
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, 'ব্রাহ্ম সমাজের বর্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্ম সমাজের পরীক্ষিত বিষয়', কলকাতা, ৫৬ ব্রাহ্ম সংবৎ।
বিপিনচন্দ্র পাল, 'সত্তর বছর', কলকাতা, ১৩৬২ (১৯৫৫)।
বৈকুন্ঠনাথ ঘোষ, 'আমার জীবন কথা', কলকাতা, ১৩৩০ (১৯২৩)।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, 'মহাত্মা শিশরকুমার ঘোষ', (সাহিত্য সাধক চরিতমালা), কলকাতা, ১৯৬৫।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, 'কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হরিশচন্দ্র মিত্র', (সাহিত্য সাধক চরিতমালা), কলকাতা, ১৯৬৫।
ভবরঞ্জন মজুমদার, 'আচার্য্য গিরিশ্চন্দ্র মজুমদার', কলকাতা, ১৯১৩।

খ. উপন্যাস/কবিতা

অদ্বৈত মল্লবর্মন, 'তিতাস একটি নদীর নাম', কলকাতা, ১৩৬৩ (১৯৫৬)।
গোপাল হালদার, 'ভাঙনী কূল', ঢাকা, ১৯৭৬।
গোপাল হালদার, 'স্রোতের দীপ', ঢাকা, ১৯৭৬।
জীবনানন্দ দাশ, 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যে সম্ভার', (রনেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত), ঢাকা, ১৩৮১ (১৯৭৪)।
মানিক বন্দোপাধ্যায়, 'পদ্মা নদীর মাঝি', কলকাতা, ১৩৭৯ (১৯৭২)।
(লেখকের নাম নেই) 'আদর্শ পরিবার', ঢাকা, ১৮৯৪।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, 'কাঁদো নদী কাঁদো' ঢাকা, ১৯৬৮।
'হরিনাথের গ্রন্থাবলী', কলকাতা', ১৯০৯।

গ. অন্যান্য

অমলেন্দু দে, 'বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ', কলকাতা, ১৯৭৪।
অমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায়, 'বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি', কলকাতা, ১৩৮৬ (১৯৭৯)।
আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম বাংলা সামরিকপত্র (১৮৩১-১৯০৪)', ঢাকা, ১৯৬৯।
আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস', ঢাকা, ১৯৭৪।
আহমদ শরীফ, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ঢাকা ১৯৭৮।
ওয়াকিল আহমদ, 'উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা', ঢাকা, ১৯৮৩।

ইন্দুনীভূষণ দেবী, 'আইন ! আইন !! আইন !!!' ঢাকা, ১৮৯০।
কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাংলার জাগরণ', কলকাতা, ১৯৫০।
কালীপ্রসন্ন ঘোষ, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', কলকাতা ১৯১০।
কালীপ্রসন্ন ঘোষ, 'নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব', কলকাতা, ১৯২৬।
কেদারনাথ মজুমদার, 'ময়মনসিংহের ইতিহাস', কলকাতা, ১৯০৬।
কেদারনাথ মজুমদার, 'বাংলা সাময়িক সাহিত্য', (প্রথম খন্ড), ময়মনসিংহ, ১৯১৭।
গোপাল হালদার (সম্পাদিত), 'সোনার বাংলা', (প্রথম খন্ড)', কলকাতা, ১৯৫৬।
জলধর সেন, 'কাঙ্গাল হরিনাথ' (দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা, ১৩২১ (১৯১৪)।
দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'হিন্দু ধর্মের আন্দোলন ও সংস্কার', কলকাতা, ১৮১৫।
নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, 'বাংলার অর্থনৈতিক জীবন', কলকাতা, ১৯৬৭।
নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', (আদিপর্ব), প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা, ১৯৮০।
পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ', (১৮১৮-১৮৭৮)। কলকাতা, ১৯৭৭।
পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, 'বাংলা ভাষা', কলকাতা ১৯৭৬।
পিয়ের ব্যাসানেত, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি', (সুফিয়া খান অনূদিত), ঢাকা, ১৯৭৭।
পূর্ণচন্দ্র সরকার, 'হাল আমলের সভ্যতা', ঢাকা, ১৮৮৫।
প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'আত্মীয় সভার কথা', কলকাতা, ১৯৭৫।
প্রমথ চৌধুরী, 'রায়তের কথা', কলকাতা ১৯৪৪।
প্রমোদ সেনগুপ্ত, 'নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ', কলকাতা, ১৯৭৮।
প্রমোদ সেনগুপ্ত, '"ভারতীয় মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭", কলকাতা, ১৯৫৭।
বঙ্কবিহারী কর, 'পূর্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত', কলকাতা।
বদরুউদ্দীন উমর, 'পূর্ব বাঙ্গালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি', প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা, ১৯৭০ ও ১৯৭৫।
বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত ও সংকলিত), 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র', দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা, ১৯৬৩, চতুর্থ খন্ড, কলকাতা, ১৯৬৬।
বিনয় ঘোষ, 'বাঙ্গালী সামাজিক ইতিহাসের ধারা', (১৮০০-১৯০০)। কলকাতা, ১৯৭০।
বিনয় ঘোষ, 'বাংলার নবজাগৃতি', কলকাতা, ১৯৭৯।
বিনয় ঘোষ, 'বাংলার বিদ্বৎসমাজ', কলকাতা, ১৯৭৮।
বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'স্বদেশ ও সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৯।

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'বাংলাদেশের লোকশিল্প', ঢাকা, ১৯৮২।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', দুই খন্ডঃ কলকাতা, ১৩৭৭ (১৯৭০), ১৩৮৪ (১৯৭৫)।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 'বাংলা সাময়িকপত্র', কলকাতা, প্রথম খন্ড, ১৩৭৯ (১৯৭২), দ্বিতীয় খন্ড, ১৩৮৪ (১৯৭৪)।
মীর মশাররফ হোসেন, 'মশাররফ রচনার সম্ভার', (কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত), প্রথম খন্ড, ঢাকা, ১৯৭৬।
মুনতাসীর মামুন, 'ঢাকা প্রকাশ ও পূর্ববঙ্গের সমাজ, ঢাকা, ১৯৭৬।
মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত) 'বঙ্গ ভঙ্গ', ঢাকা, ১৯৮১।
মুনতাসীর মামুন, ''উনিশ শতকের ঢাকার থিয়েটার'', ঢাকা. ১৯৭৯।
মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ', ঢাকা, ১৯৭৫।
মোহাম্মদ মোহসেন উল্লাহ, 'বুড়ীর সুতা', কলকাতা, ১৩১৭ (১৯১০)।
রতনলাল চক্রবর্তী, 'সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ,' ঢাকা, ১৯৮৪।
রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস', প্রথম ও তৃতীয় খন্ড, কলকাতা, ১৯৫৭ ও ১৯৭১।
রমেন্দ্র বর্মণ, 'মহাবিদ্রোহ বিদ্রোহ ও বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, ১৩৮৭।
রাজেশ্বর মুখোপাধ্যায়, 'ভারত সৌভাগ্য এবং চট্টগ্রাম ব্রাহ্ম সমাজের, ইতিবৃত্ত', কলকাতা, ১৮৭৭।
রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 'বিশাল বাঙ্গলা', কলকাতা, ১৩৫২ (১৯৪৫)।
রাধা রমন সাহা 'পাবনা জেলার ইতিহাস', তৃতীয় খন্ড, পাবনা, ১৩৩৩ (১৯২৬)।
রামধন তর্ক পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, 'বিধবা বেদন নিষেধক পুস্তক', (বোয়ালিয়া, ১৮৬৭।
(লেখকের নাম নেই) 'পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের বিগত আন্দোলন', ঢাকা, ১৮৭৯।
(লেখকের নাম নেই) 'বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ', প্রকাশস্থল উল্লিখিত হয় নি), ১৩৩৪ (১৯২৭)।
(লেখকের নাম নেই) 'উনবিংশ শতাব্দীর প্যাগম্বর', ঢাকা, ১৮৮০।
সতীশচন্দ্র মিত্র, 'যশোর খুলনার ইতিহাস', প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা, ১৯৬৬।
সত্যেন সেন, 'শহরের ইতিকথা', ঢাকা, ১৯৭৪।
সিরাজুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা', ঢাকা, ১৯৮১।

সুকুমার মিত্র, '১৮৫৭ ও বাংলাদেশ', ১৯৬০।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে', কলকাতা, ১৯৭৫।
সুশোভন সরকার, 'সমাজ ও ইতিহাস', কলকাতা, ১৩৬৪, (১৯৫৭)।
সুপ্রকাশ রায়, 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', কলকাতা ১৯৭২।
সেখ আবদোস সোবহান, 'হিন্দু মোসলমান', প্রথম খন্ড, ঢাকা, ১৮৮৯।

২. বিবরণ

'ইস্ট বেঙ্গল মার্কেন্টাইল কোম্পানি লিমিটেড সংসৃষ্টির নিয়মপত্র,' ঢাকা, ১৮৭৭।
'কন্যাপেন নিবারিণী সভার বিবরণ', বগুড়া, ১৮৮৯।
'কৌলীন্য প্রথা সংশোধিনী ও কন্যাবিক্রয় নিবারণী সভার কার্য্যবিবরণ ও উক্ত বিষয় সম্বন্ধে দুইটা প্রবন্ধ', (কালিদাস বন্দোপাধ্যায় সংকলিত ও বিরচিত) কলকাতা, ১৮৭১।
'গৈলা ছাত্র সম্মিলনী সভার প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্যবিবরণ (১২৮৭-৮৯)' ঢাকা ১৮৮২।
'চট্টগ্রাম ব্রাহ্ম সমাজের বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব', ১৮৭৫।
'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ,' ১৮৮৩, ঢাকা ১৮৮৪।
'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর ১৮৮৬-৮৭ সনের অনুষ্ঠান পত্র', ঢাকা ১৮৮৮।
'পূর্ব্ব বাঙলা ব্রাহ্ম সমাজের ১২৮৯ সনের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ', ঢাকা, ১২৯০, '১২৯০ ও ১২৯১ সনের কার্য্যবিবরণ', ১২৯১ ও ঢাকা ১২৯২।
'বগুড়া ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড আর্টিকেলস অব এসোসিএসন অর্থাৎ নিয়মপত্র', কলকাতা, ১৮৭৭।
'বিক্রমপুর হিতসাধিনী সভার কার্য্যবিবরণ, ১ ভাগ, ১ খন্ড, ঢাকা ১৮৭২।
'ময়মনসিংহ লোন অপিস লিমিটেডের আর্টিকেলস অব এসোসিএসন অর্থাৎ নিয়মপত্র', কলকাতা, ১২৮০।
'সহর ময়মনসিংহ গ্রেট ইস্টারণ বেঙ্গল একচেঞ্জ কোম্পানী লিমিটেড আর্টিকেলস অব এসোসিএসেন অর্থাৎ নিয়মপত্র,' ময়মনসিংহ, ১৮৭৪।
'সিলেট কলটিবেটিং কোম্পানি লিমিটেড সংসৃষ্টির নিয়মপত্র,' কলকাতা, ১২৮১ (১৮৭৪)।

৩. সংবাদপত্র/সাময়িকপত্র

'আরতি,' ময়মনসিংহ, খন্ড, ১৯০১-১৯০৩
'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা', কুমারখালী, ১৮৬৯-৭০, ১৮৭২-৭৪।
'ঢাকা প্রকাশ', ঢাকা, ১৮৬৪-১৯০৫।
'বঙ্গবন্ধু,' ঢাকা, ১৮৮৬।
'সংবাদ পূর্ণচন্দোদয়,' কলকাতা, ১৮৫০-১৮৫৩।
'সংবাদ প্রভাকর', কলকাতা, ১৮৪৭-১৮৫৬।
'সোমপ্রকাশ', কলকাতা, ১৮৬৩-৬৪, ১৮৬৭-৬৮, ১৮৮২-৮৩।

৪. সহায়ক বাংলা প্রবন্ধ (সাময়িকপত্রে প্রকাশিত)

আনিসুজ্জামান 'মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দীন', "সাহিত্য পত্রিকা" ৪র্থ বর্ষ ২ সংখ্যা, ঢাকা, শীত, ১৩৬৭।
আবদুর রাজ্জাক 'উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মন' (মাহমুদ রশীদ অনুদিত), "বক্তব্য," ২ সংখ্যা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭।
আবদুল মওদুদ 'আঠারো শতকের বাঙলাদেশের বিচার ও শান্তি রক্ষা,' "ইতিহাস", ১ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ঢাকা, ভাদ্র-অগ্রহায়ন, ১৩৭৪।
আহমেদ মুসা ও ইকবাল হোসেন, 'চরের জমি জোতদারের দখলে', "বিচিত্রা," ৯ম বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ঢাকা, ১০.১০.১৯৮০।
ওয়াকিল আহমদ, 'বাংলার বিদৎসভাঃ ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী,' "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা," ৭ সংখ্যা, ঢাকা, জুন, ১৯৭৮।
ডেভিড ম্যাকচ্চন, 'পূর্ব পাকিস্তানের মন্দির' (অনুবাদ) "ইতিহাস," ২ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ঢাকা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৭৫।
রনজিৎগুহ, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস,' "এক্ষণ", কলকাতা, বর্ষা, ১৩৮৯।
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'বাংলাদেশে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ', "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা," ৫ সংখ্যা, ঢাকা, জুন, ১৯৭৭।
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'মসজিদ, বাংলাদেশে,' "বক্তব্য", ২ সংখ্যা ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭।
মমিনুল মউজদীন (সংগৃহীত), 'দেওয়ান গনিউর রাজার রোজনামচা থেকে', 'বিচিত্রা', ৭ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ঢাকা, ২২.৯.১৯৭৮।
মুনতাসীর মামুন, 'ব্রেনান্ড সাহেবের রোজনামচা ও ১৮৫৭ সনের ঢাকা,' "বিচিত্রা", ৬ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ঢাকা, ২৩.৯.১৯৭৭।
মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, 'সাময়িকপত্রে সেকালের ঢাকা', "বাংলা একাডেমী পত্রিকা", বৈশাখ-আষার, ঢাকা, ১৩৭৭।

সফিউদ্দিন জোয়ারদার, 'উনিশ শতকের শেষার্ধ রাজশাহীতে শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা,' "সমাজ নিরীক্ষণ/১," ঢাকা, নভেম্বর, ১৯৭৮।

৫। ঔপনিবেশিক সরকারের ইংরাজী প্রকাশনা ঃ

Address by the Hon'able Sir George Compbell, Calcutta, 1874.

Allen C. G. H, *Final Report of the Survey and Settlement of the District of Chittagong, 1888 to 1898*. Calcutta, 1900.

Aunual Report of the College of Hadji Mohammad Mohsin with its Subordinate Schools, and of the Colleges of Dhaka, Kishnaghur for 1847-48, Calcutta, 1845 ; *for 1847-50*, Calcutta, 1850 ; *for 1850-51*, Calcutta, 1851 ; *for 1851-52* Calcutta 1852 ;

Bell. F. O., *Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of Dinajpur, 1934-1940*, Calcutta 1942.

Bentley. C. A. *Malaria and Agriculture im Bengal*, Calcutta 1925.

Beverly. H. *Report on the Census of Bengal for 1872*, Calcutta, 1876.

Bourdillon, J. A., *Report on the Census of Bengal, 1881, Vol. V*. Calcutta, 1883.

(Clay, A. L.), *Principal Heads of the History and Statistics of Dhaka Division*, Calcatta, 1868.

Donnel, C. J. O., *Census of India, 1891, Vol. III. The Provinces of Bengal andtheir Feudatories*, Calcutta, 1893.

Further Papers Relationg to the Reconstitution of the Provinces Bengal and Assam, London, 1905.

Grierson, G. A., *Linguistic Survey of India, Introductory*, Vol. I Pt. I, Calcutta, 1927.

Gupta, J. N., *Bogra (District Gazetters of* Eastern Bengal and Assam). Allahabad, 1910.

Halliday, F. J., *Minute by Lt. Governor of Bengal on the Mutineers as they affected the Lower provinces under the Government of Bengal*, Calcutta, 1858.

Hamilton-Walter, *The East India Gazetter*, London, 1815.

Hartley Coulton, Arthur, *Final Report of the Rangpur Survey and Settlement Operations*, 1931-38. Caleutta, 1940.

Hunter, W. W., *A Statistical Account of Bengal,* Vol.V. (Reprint) Delhi, 1975; Vol. IX, London, 1876.

Malley, L. S. S. O., *Chittagong* (Eastern Bengal District Gazetteers), Calcutta, 1908.

Paper Relating to East India Affairs, 1802.

Proceedings of the Government of Bengal in the General Department, 1865. Calcutta 1865.

Proceedings of the Lieutenant Governor of Bengal, (Judicial Dept.) *1869-1879,* Calcutta.

Report on the Administration of Bengal, 1871-72 to 1899-1900, Calcutta.

Report of the Government of Bengal to Revise the Salaries of Ministerial Officer, and to Reorganise the System of Business and Executive Offices (1885-16) Calcutta, 1886.

Report on Native Papers (*1875-1905*), Calcutta.

Sachse, F. A., *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Mymensingh,* 1908-1919, Calcutta, 1920.

Sen, A. C. *Agricultural Report of the Dacca District, Calcutta, 1889.*

Selections from the Records of the Bengal Government. No.XXII. Calcutta, 1855.

Skrine, F. H. B. *Memorandum on the Material Condition of the Lower Orders in Bengal during the ten years from 1881-82 to 1891-92,* Calcutta, 1892.

Taylor, James, *Sketch of the Topography and Statistics of Dacca,* Calcutta, 1840.

৬. সহায়ক ইংরেজী গ্রন্থ :

A Short Sketch of the Lakhutia Roy Family, Calcutta, 1896.

Achary, Keshub Churder, *Strike but Hear,* Mymensingh, 1881.

Ahmed, A. F. Salahuddin, *Social Ideas and Social Change in Bengal, 1818-1835,* Calcutta, 1976.

Ahmed, Nafis, *An Economic Geography of East Pakistan,* London, 1968.

Ahmed, Rafiuddin, *The Bengal Muslims (1871-1906) A Quest for Identify*, New Delhi, 1981.

Ahmed, Sufia, *Muslim Community in Bengal (1884-1912)* Dhaka, 1974.

Bennerji, Tarini Das, *The Zemindar and the Ryot in Bengal*, Calcutta, 1883.

Barrier, N. Gerald (ed)., *The Census in British India*, New Delhi, 1911.

Basu, C. N., *The Partition Agitation Explained*, Calcutta, 1906.

Bessaignet, Pierre (ed)., *Social Research in East Pakistan*, Dhaka 1961.

Bhattacharyya, Amitabha, *Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal, Calcutta*. 1977.

Braudel, Fernand, *The Mediterranean and the Mediteranean World in the Age of Philip II*, Glasgow, 1978.

Broomfield, J. H. *Elite Conflict in a Plural Society*, Berkely 1968.

Buckland, C. E., *Bengal under the Lieutenant Governors*, Vol. I. and II New Delhi. 1976.

Chakravorty. Usha, *Condition of Bengali Women*. Calcutta, 1963.

Chatterton, C. J· *Railway Business and Jute Trade*, (Date of publication aud place not mentioned).

Chaudhury, S. B., *Civil Rebelion in the India Mutinies* Calcutta, 1957.

Choudhury, S. B., *Theories of the India Mutiny*. Calcutta 1965.

Choudhury, S. B., *English Historcal Writings on the Indian Mutiny 1859-59*, Calcutta, 1971.

Chowdhury, Kalimohon, *The Traditional History of my Family*, Rajshahi, 1913.

Cronin, Richard Paul, *British Policy and Administration in Bengal*, (1905-1912), Calcutta, 1977.

C. S. (A. L. Clay), *Leaves from a Diary in Lower Bengl*, London, 1869.

Dani, Ahmad Hasan, *Muslim Architecture in Bengal,* Dhaka, 1961.

Datta Aswini Kumar *Rejoicing in the Brahmo Samaj or the Silver Weeding of East and West,* Barisal, 1880.

Datta, K, K. *Reflections on Mutiny,* Calcutta, 1967.

Desai, A. R. *Social Background of Indian Nationalism,* Bombay, 1976.

Day, Shumbho Chunder *Sylhet : What I have Seen, Read, and of it,* Calcutta, 1880.

Fraser,Lovat, *India under Curzon and After,* London, 1912.

Ghose Hemandra Prosad, *The Newspaper in India.* Calcutta 1952.

Gopal, S. *British Policy in India, 1858-1905.* Cmmbridge, 1965.

Gramsci, Antonio, *Selection from the Prison Note books* (Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowel Smith), London, 1976.

Greenhill, Basil, *Boats and Boatmen, of Pakistan.* London, 1971.

Heber, Reginald, *Narrative of a Journey through the upper Provinces of India, From Calcutta to Bombay, 1824-1825, with Notes upon Ceylon, An Account of a Journey to Madras and the Southern Provinces, 1826 and Letters Written in India.* London, 1827.

Hornell, James, *The Boats of the Ganges* (*Memoirs* of the Asiatic Society of Bengal) Calcutta, 1924.

Islam, Sirajul, *The Permanent Settlement in Bengal, A Study of its Operation, 1790-1819,* Dacca, 1979.

Joll, James, *Gramsci,* Glasgow, 1977.

Joshi, P. C. (ed), *The Rebellion 1857,* New Delhi, 1957.

Kabeer, Rokeya Rahman, *Administrative Policy of the Government of Bengal* (1870-1890). Dacca, 1965,

Karim, Abdul, *Social History of the Muslims in Bengal* (Down to A. D. 1538) Dacca, 1959.

Karr, Walter Scot Seton, *A Short Account of Events during the Sepoy Mutiny of 1857-80 in the Districts of Belgaum and of Jessore* (Printed for private Circulation) London, 1894.

Khan, Muinuddin Ahmed, *History of the Faraidi Movement in Bengal,* Karachi, 1965.

Kling, Blair B, *The Blue Mutiny,* Philadelphia, 1966.

Lothbridge, Roper *The Mischief Threatened by the Bengal Tenancy Bill.* London, 1883.

Majumdar, Biman Behari, *Indian Political Associations and Reform Legislature,* (1818-1917), Calcutta 1965.

Majumdar, Hridaynath, *Reminicences of Dhaka,* Calcutta, 1926.

Majumdar, R. C., *The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857,* Calcutta. 1957.

Mallick, Azizur Rahman, *British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856)*, Dhaka, 1971.

Marx, Karl, *A Contribution to the Critique of Political Economy,* London, 1971.

Metcalf, Thomas R., *The Aftermath of Revolt in India (1857-1870)*, Newjersey, 1964.

Mookerjea, Ashutosh, *An Examination of the Principles and Policy of the Bengal Tenancy Bill,* Calcutta, 1884.

Mookerjea, Peary Mohun (Compiled), *Opinion of Mofussil Land holders on the Bengal Tenancy Bill,* Calcutta 1883.

Mukherjee, Radha Kamal, *The Changing Face of Bengal,* Calcutta, 1938.

Oddie, G. A., *Social Protest in India,* New Delhi, 1979.

Pal, Bipinchardna, *Brahmo Samaj and the Battle of Swaraj in India,* Calcutta, 1926.

Palit, Chittabrata, *Tension in Bengal Rural Society (Land holders Planters and Colonial Rule 1830-1860)* Calcutta, 1975.

Palit, Chittabrata, *Perspectives on Agrarin Bengal,* Calcutta, 1982.

Philips. C. H. (ed), *Select Documents on the History of India Pakistan, and Ceylon,* Vol. IV, Oxford, 1962.

Rahim, Abdur, *Social and Cultural History of Bengal,* Karachi, Vol. I, 1963 ; Vol. II, 1967.

Rahman, Hossainur, *Hindu-Muslim Relations in Bengal,* (1905-47), Bombay, 1974.

Rashid, Haroun Er, *Geography of Bangladesh,* Dhaka, 1977.

Roy, Parbati Charan, *The Rent Question, Calcutta,* 1881.
Razzak, Abdur, *Bangladesh : state of the Nation*, Dhaka, 1981.
Sanyal, Rajat, *Voluntary Association and the Public Life in Urban Bengal*, Calcutta, 1980.
Sarkar, Sumit, *The Swadeshi Movment in Bengal.* New Delhi, 1973.
Sastri, Sivnath, *History of the Brahmo Samaj*, Calcutta, 1911.
Seal, Anil, *The Emergnce of India Nationalism,* Cambridge, 1968.
Sen, Surendra Nath *Eighteen Fifty Seven,* Calcutta, 1958.
Sengupta, Kalyan Kumar, *Recent Writings on the Revot, of 1857t A Survey,* New Delhi, 1975.
Simson, Frank B, *Letters on Sport in Eastern Bengal, London* 1885.
Sinha, Pradip, *Nineteenth Century Bengal, Aspects of Social History,* Calcutta, 1961.
Stokes, Eric, *The English Utilitarions and India,* Oxford 1959.
Wise, James, *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal,* London, 1885.
Wolpert, Stanley A, *Tilak and Ghokhall,* California, 1962.

৭. সহায়ক ইংরেজী প্রবন্ধ (গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত)

Addy, Premen and Azad Ibne, *'Politics and Society in Bengal,* Robin Blackburn (ed), *Explosion in a Subcontinent*, London, 1975.
Alavi, Hamza, 'India and the Colonial Mode of Production', Ralph Miliband and John Saville (eds) *The Socialist Registrar* 1975, London 1975.
Bennet, Lucien, 'Ethnic Groups of Chittoagong Hill Tracts', Pieree Bessaignet (ed) *Social Research in East Pakistan.* Dacca, 1961.
Bessaignet, Pierre, 'Tribes of the Northern Border of East Pakistan', Pierre Bessaignet ((ed) *Social Research in East Pakistan*, Dacca 1961.
Chowdhury, Benoy K, 'Agrarian Economy and Agrarian

Relations in Bengal, 1869-1855', N. K. Sinha (ed) *History of Bengal* Calcutta, 1966.

Das, Jogananda, 'The Brahmo Samaj', A. C. Gupta (ed), *Studies in Bengal Renaissassce,* Calcutta, 1957.

De, Barun, 'Susobhan Sarkar' Barun De (ed) *Essays in Honour of S. C. Sarkar,* New Delhi. 1976.

Guha, Ranajit ; 'On Some Aspects of the Historiography of Colonial India' Ranajit Guha (ed) *Subaltern Studies I: Writings on South Asian History and Society,* Delhi, 1982.

Hoberle, Rudolf, Types and Functions of Social Movements', D. L. Sills (ed). *International Encyclopaedia of the Social Sciences,* Vol. XIII and XIV, London, 1972.

Hecht, Jean, 'Social History' David, L. Sills (ed) *International Encyclopoedia of Social Science,* Vol. V and VI, New York, 1972.

Hobsbawm, E. J., 'From Social History to the History of Society'. F. Gilbert and S. R. Grambard (ed). *Historical Studies Today,* New York, 1972.

Houghton, Catherine, 'East Bengali Language and Political Development in Sociolinguistic Perspective', John, R. Mclane (ed), *Bengal in the Nineteenth and Twentieth Centuries,* Michigan, 1975.

Islam, Sirajul, 'Life in the Musfassal Town of Nineteenth Century Bengal'. Kenneth Ballhatchet and John Harrison (eds). *The City in South Asia : Pre Mordern and Modern,* London, 1981.

Kopf, David, 'The Brahmo Idea of Social Reform and the Problem of Female Emancipation in Bengal', John R. Mclane (ed) *Bengal in the Nineteenth and Twentieth Centuries,* Michigan, 1975.

Laslett, Peter, 'History and the Social Sciences' David Sills (ed), *International Encyclopaedia of Social Science,* Vol. V and VI, New York, 1972.

Lacquer, Walter, 'Revolution' *International Encyelopacdia of Social* Science, Vol. 13, 14, London 1972.

Mclane, John R, 'Bengal's pre-1905 Congress Leadership and

Hindu Society', Barbara Thomas and Spencer Lavan (ed), *West Bengal and Bangladesh : Perspectives from 1872*, Michigan, 1972.

Mukherjee, Nilmani 'Foreign and Internal Trade 1833-1905' N. K. Sinha (ed) *History of Bengal*, Calcutta, 1966.

Owen, Roger. 'Imperial policy and Theories of Social Change : Sir Alfred Lyall in India', Talal Asad (ed), *Anthropology and the Colonial Encounter*, London 1973.

Rao, M S A, 'Conceptual Problems in Study of Social Movements' M. S. A. Rao (ed) *Social Movement in India*, Vol I New Delhi, 1978.

Sanyal, Hiteshranjan, 'Temple building in Bengal from the Fifteenth to the Nineteenth Century.' Barun De (ed), *Prespectives in Social Sciences* I, Calcutta, 1977.

Sarkar, Susobhan, 'View on 1857', Susobhan Sarkar, *On the Bengal Renaissance*, Calcutta, 1977.

Stokes, E. T., 'The Administrations and Historical Writings of India', C. H. Philips (ed), *Historians of India, Pakistan and Ceylon*, London, 1961.

৮. সহায়ক ইংরেজী প্রবন্ধ : (সাময়িক পত্রে প্রকাশিত)

Ahmed, Rafiuddin, 'The Role of Associations and Anjumans in the political Mobilization of the Bengali Muslims in the later Nineteenth Century, *Bangladesh Historical Studies*, Vol. IV, Dhaka, 1979.

Alavi, Hamza, 'Structure of Colonial Formation' *Economic and Political Weekly (Annual Number)*, Bombay, March,1981.

Alavi, Hamza,, 'The Colonial Transformation in *Ind'ia*', *The Journal of Social Studies*, No. 7 and No. 8, Dacca, Jan 1980 and April 1980.

Anderson. Perry, 'The Antinomies of Antonio Gramsci', *New Left Review*. No. 100. London, Nov. 1976-Jan. 1977.

Brennand, 'Echoes of the Indian Mutiny of Dacca', *The Dacca Review*, Vol, V No. 7 and 8 Dacca. 1915.

Das Gupta, Uma, 'The Indian Press, 1870-1880', *Modern Asian Studies*, Vol. II Pt. II April 1977.

Guha, Ranajit, 'Neel-Darpan', The Image of a Peasant Revolt in a Liberal Mirror', *Journal of Peasant Studies*, Vol. II No. 1I London, Oct. 1974.

Hashim, Wan, 'The Political Economy of Peasant Transformation, Theoretical Framework and a Case Study, *The Journal of Social Studies,* No. 10 Dacca, Oct, 1980.

Hussain, Muhammad Delwar, 'Some Aspects of Henry Beveridges History of Bakargong', *Bangladesh Historical Studies,* Vol. IV, Dacca, 1979.

'Life and Works of Sir William Wilson Hunter (1840-1900), *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Vol. XXI No. 11, Dacca, August. 1977.

Khan, Muinuddin Ahmed, 'The Sepoy Mutiny and the Muslims Society of Bengal', *Journal of the Bangladesh Itihas Samiti*. Vol. 11. Dacca, 1973.

Kopf, David, 'The Brahmo Awakening in East Bengal and the Orthodox Hindu Reaction 1866-1872', *Bangladesh Historical Studies*, Vol· II Dacca 1977.

Molla, M. K. U., 'Keir Hardie and the First Partition of Bengal', *Rajshahi University Studies*, Vol. III. Rajshahi, January, 1970.

Murshid, Ghulam, 'Co-existence in a plural Society Under Colonial Rule, Hindu-Muslim Relations in Bengal 1757-1972,' *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol. I, Rajshahi, 1976.

Sanyal, Hitesranjan, 'Regional Religious Architecture in Bengal', *Marg*, Bombay, March 1974.

৯· ইংরেজী বিবরণী

A Summary of Reoports from the Various Social Reform Associations in India for the year 1900, Bombay, 1900.

Appendix to Calcvtta Gazette (Bengal Library Catalogue) Calcutta, 1894-95, 97-98, 1880.

Report of the Tenth National Social Conference held in Calcutta, Poona, 1897.

The First Report of the East Bengal Missionary Society, Dacca, 1849.

১০. বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশনা

Statistical Pocket Book of Bangladesh 1978. Dacca, 1977.

১১. অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

Khan, Misbahuddin, *The Port of Chittagong 1880-1890.*

Sen, Amiya Prasad, *Hindu Revivalism in late Nineteenth Century Bengal*, (Unpublished Ph. D. thesis) Delhi University, 1980.

১২. সংবাদপত্র

Dacca News (1856-1858) Dacca *Bengal Times* (1875-1905) Dacca.

১৩. মনোগ্রাফ

Bandyopadhyay, Sekhar, *Caste, Class and Ceneus : Aspects of Social Mobility under British Rule in the Late Nineteenth and Early Tweentieth Century Bengal 1872-1931*. (Mimec, Centre for Southeast Asian Studies, University of Calcutta), 1981.

Bandyopadhyay, Sekhar, *Caste Politics in Eastern Bengal : The Namasudras and the Anti-Partition Agitation 1905-1911* (Mimeo, Centre for Southeast Asian Studies, University of Calcutta). 1981.

Guha, Amalendu, *The Indian National Question : A Conceptual Frame* (Mimeo, Occassional Paper No. 45 of the Centre for Studies in Social Science) Calcutta, April, 1982.

নির্ঘণ্ট

অক্ষয়দত্ত ১৮৪, ১৯৩
অঘোরকামিনী ১৮৮
অঘোরনাথ গুপ্ত ১৭৯, ১৮০
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৬
'অনিল শীল' ২৬৪
'অন্তপুর স্ত্রী শিক্ষাসভা' ১৮৫
অন্নদাচরণ খাস্তগীর ১০২, ১৭১
'অবকাশ রঞ্জিকা' ২৫৬
'অবলা বান্ধব' ১৮৬
অভয়কুমার দত্ত ১৬৭
অভয়চন্দ্র ১৮৯
'অমৃত প্রবাহিনী' ২৫৬
'অমৃত বাজার' ২৫৬
অলিওর রহমান ২৭৬
অশোক মেহতা ১৪৯

আজাদ আলী ২৭৬
আজিজুর রহমান মল্লিক ৭৭, ৭৯
আঠারো'শ সাতান্ন সালের বিদ্রোহ ১৪৮-১৫৯
'আত্মীয় সভা' ১৫৯, ২৬০
আদি ব্রাহ্ম সমাজ ১৬১
আধিপত্যবাদ, ভাবনার জগতে ১১৮-১২৯
অনিন্দচন্দ্র রায় ১০৪
আনন্দমোহন বসু ১৬২, ১৮৩, ১৮৪
আনিসুজ্জামান ৭৭, ৮২, ২৩৮
আঞ্চলিকতা ৬-১০
আবদুর রহিম ২৪২, ২৫৪
আবদুল ওয়াজিদ ২৭৬
আবদুল হাকিম ৫২
আবদুস সালাম ২৭৬
আবদুস সোবহান চৌধুরী ১৯৮
আবদোস সোবহান ৯৫, ২৮৬
আবুল কালাম আজাদ ১৪৯
আমাজ্ঞান ২০
আমীর আলী ২৭৪
আরমানি টোলা ১৬৫, ১৬৭
আসাদ আলী মৌলভী ১৫৭
আসাম ৯, ২১, ২০৩, ২০৫
আহসান উল্লাহ ১৯৯
আয়ারল্যান্ড ২৮৫

ইলবার্ট বিল ১৯৬, ২০১
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ২৭, ৩৪, ৭৩, ১৪৮, ২৩৭
'ইসলামের জয়' ১২৬
ই, সি, কেম্প ২০১, ২৪৮, ২৫৪
ইথর বেঙ্গল ৮০
ইংল্যান্ড ২০৫

ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস ১৬৯
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৭, ১৯৪, ২৩৭
ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ১৫৫
ঈশ্বরচন্দ্র সেন ১৮৭

উইলিয়াম বোল্টস ২৩৭
উদয়চন্দ্র আঢ্য ১৬৪
উদাসীন পথিকের মনের ব্যথা ১২২-২৩, ১২৫-২৬
উপযোগবাদ ১৯৩
উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ২৭০
উমাদাশ গুপ্ত ২৪৯
উড়িষ্যা ৯

'ঋষিতত্ত্ব' ২৪২

এ ও হিউম ১৯৩
এন্ড্রু স্কোবল ১৯০
এরিক স্টোক্স ১৯১-১৯২
এলেন বোরো ১৯২
এ, সি, সেন ১০৭, ১১১, ১১৩, ১১৭
'এ হিস্ট্রি অফ দি ইন্ডিয়ান মিউটিনি' ১৪৯
'এ হিস্ট্রি অফ দি সিপয় ওয়ার ইন ইন্ডিয়া' ১৪৯
'এংলো-ইন্ডিয়ান হিন্দু ? সোসিয়েশন' ২৬০

ওয়াজিদ আলী খান পন্নী ৯৭
ওয়ালের স্টাইন ৮৬

কপোতাক্ষ ২২
'কবিতা কুসুমাবলী' ২৪২, ২৫৬
কমিটি অফ সেফটি ১৫২
কর্ণওয়ালিস ৮৮, ৯৩
কলকাতা ১০৭, ১৪৪, ১৬২, ১৬৩, ১৭৫, ১৮২, ১৮৫, ২৩৯, ২৪৫, ২৪৯, ২৫০, ২৬১, ২৬৬
কল্যাণ কুমার সেনগুপ্ত ১৪
কাঙ্গাল হরিনাথ ২৪৬
কাছাড় ৯
কাজিমুদ্দিন আহম্মদ সিদ্দিকী ২০৫, ২০৬
কাটক্লিফ ৩৮
'কাব্য প্রকাশ' ২৫৬
কামরূপ ২১
কামিনী রায় ১৮৬
কার্জন লর্ড ২০২, ২০৩, ২০৮
কার্লমার্কস ১৫০
কালিমারা ২৪
কালীকুমার বসু ১৭০
কালী কৃষ্ণ ঘোষ ১৮৮, ২৮৩
কালী চন্দ্র রায় চৌধুরী ২৪০
কালী নারায়ণ গুপ্ত ১৬৩,১৬৬, ১৭৭, ২৭৩
কালী প্রসন্ন ঘোষ ১২৬, ১৬৭, ১৮৫, ১৮৯, ২৩৯, ২৫৪, ২৬৬
কাশীমোহন দাস ১৬৫
কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ২৪৭, ২৭৩
কাশীশ্বর দাস ১৭১
কাসিমপুর ১১৪
কায়কোবাদ ১৯৮
কায়ামারাং ২৫
কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর ৯৭
কিশোরগঞ্জ ৩৯, ১৭২
কিশোরী মোহন চক্রবর্তী ১৭০
কুতুবদিয়া ৩৩
কুঞ্জলাল নাগ ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০১
কুমারখালী ২৪৬
কুমিল্লা ২৬, ২৭, ৩১, ৩৭, ৩৯, ৫৪, ১৫৫, ১৭২, ১৯৮, ২৪৩, ২৪৪
কুশিয়ারা ২৪
কুষ্টিয়া ২৬, ১৮৬, ২৪৩, ২৪৪
কুড়িগ্রাম ১৭২
কৃষ্ণকুমার মিত্র ১৫৫, ১৬৯
কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত ১৬৭, ১৭৭
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ১৬৫, ২৪২,

২৪৫, ২৪৮, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৮, ২৬৯
কে ১৪৯
কে, কে, নালকর ১৯৫
কেদার নাথ ২৪৭
ক্লে ২৮, ৩৭, ১৮০
কেশব চন্দ্র ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৮, ১৭৮, ১৮৪, ২৩৩, ২৭৩
কেশব চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ৯৭
ক্ষেত্র মোহন দত্ত ১৭৯
কোচবিহার ২০৫
কোটচাঁদ পুর ৩২
'কৌমুদী' ২৪২

খলিলুর রহমান আবু জাইগম মাবির ২০৫
খাজা হাবিবুল্লাহ ৯৭
খাদ্য ও পোষাক ৪৯-৪৯
খাসিয়া ৯
খুলনা ৩২, ৩৬, ৪৩, ৫০, ১৭২, ১৯৮, ২০৫, ২৪৩, ২৪৪

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯৭
গঙ্গা ২২
গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য ২৩৮
গড়াই ২২
গারো ৯
'গাঁজী মিয়ার বোস্তানী' ৫১, ১২৬
গিরিশ চন্দ্র মজুমদার ১৭১, ১৭৮, ১৮৬
গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী ২৪৮
গুরু প্রসাদ সেন ১৬৫
গোকুল মুন্সী ২৭৩
গো-জীবন ১২৬
গোপাল ১৫১
গোপালগঞ্জ ২৪
গোপাল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১৬৯
গোপাল হালদার ১৮৯
গোপীনাথ রায় ১৭১
গোবিন্দ চন্দ্র গুহ ১৬৯
গোবিন্দ চন্দ্র বসু ১৬৪
গোবিন্দ দাস ৫১
গোবিন্দ লাল বসাক ২০৫
গোয়ালন্দ ৩৩
'গৌরব' ২৫২
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা ৩১, ১০৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৫২, ২৫৭, ২৮৩, ২৮৫
গ্রামসীর ১১৯, ১২০, ১২১
গ্রীয়ারসন ৫০

ঘোষ লাইব্রেরী ১৮৮

চট্টগ্রাম ৯, ২৮, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪২, ১১৬, ১৫১, ১৫৭, ১৭২, ১৭৮, ২০৩, ২০৫, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৭১
'চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি' ২৭৩
চণ্ডীচরণ সেন ১৮৬
চন্দ্র কিশোর ১৭৭
'চিত্ত প্রকাশ' ২৫৬
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৮১, ৮৮, ৮৯, ৯৩, ৯৫, ৯৬, ১০৩
চেম্বার অফ কমার্স ১০৬

'ছাত্র সমাজ' ১৮৭

জগৎবন্ধু লাহা ১৭২
জগদীশ চন্দ্র ১৬৯
জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী ১৬৯
জগন্নাথ কলেজ ১৯৭, ২০১, ২০৮
জন ষ্টুয়ার্ট ১৯১
'জনসাধারণ সভা' ২০৪
'জমিদার দর্পণ' ৫১, ১২২, ১২৩, ১২৬
জলপাইগুড়ি ১৫২, ১৫৬, ২০৬
জলাঙ্গী ২২
জসীমউদ্দিন ৫২
জয়দেবপুর ২৬
জয়ন্তিয়া ৯
জয়পুরা ১১৫
জানকী নাথ রায় চৌধুরী ৯৭
জামালপুর ৩৯, ১৫৫
জালালউদ্দিন মিয়া ১৬৭, ১৭৭, ১৮১
জীবনানন্দ দাশ ১৮৬
জেমস অগাষ্টস হিকি ২৩৭
জেমস ওয়াইজ ১৭৬
জেমস মিল ১৯১, ১৯২
জ্যাক ৩৩

ঝিনাইদহ ২২, ৩২, ১৭২

টিচার্স সোসাইটি ২৬০

ডব্লিউ এন. লিস ৩৫
ডব্লিউ ক্লেস ১৯৫
ডাঃ শহীদুল্লাহ ৫২
ডালহৌসী লর্ড ১৫৬, ১৯২
ডি মানুক ২০৫

ঢাকা ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৪২, ৪৩, ৯০, ৯৩, ১৫১, ১৫২, ১৫৭, ১৬২, ১৬৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৯, ১৮০, ১৮২, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৯, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৭, ২০৮, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৮, ২৫০, ২৫৪, ২৬১, ২৬২, ২৬৮, ২৭০, ২৭৩, ২৭৬
ঢাকা কলেজ ১০২, ১৫৩
ঢাকা কলেজ ১০২, ১৫৩
'ঢাকা গেজেট' ১৯৯
ঢাকা জেলা ১১১, ১১৩, ১১৬
'ঢাকা দর্পন' ২৫০, ৫৬৬
'ঢাকা নিউজ' ১৬, ২৪০, ২৪১, ২৫০, ২৫২
ঢাকা নিউজ প্রেস ২৪১, ২৪৬, ২৪৭, ২৫০ ২৫১, ২৫২, ২৫৪, ২৫৫
'ঢকা প্রকাশ' ১৬, ৯৬, ১২৮, ১৮৭, ১৯৫, ১৯৬, ২০৩, ২১৯, ২৪৫, ২৫০, ২৫৫, ২৫৭
ঢাকা ব্রাহ্ম স্কুল ১৮৪
ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজ ১৬৪
ঢাকার পৌরসভা ১০৪

'তত্ত্ববোধিনী ১৬০
তমলুক ২২
তাঁতিয়া তোপী ১৫৯
তাম্রলিপ্ত ২২

তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৭১
তারিকায়ে মুহম্মদীয়া ৭৮, ৭৯
ত্রিপুরাশংকর গুপ্ত ১৬৯
তেজচন্দ্র বাহাদুর ৯৩

থমাস সিসন ৪০

দক্ষিণ ইতালী ১১৯
দক্ষিণ লুসাই ২০৩
দয়াল শিরোমনি ১৬৫
দাউদ কান্দি ২৮
দার্জিলিং ২০৫
দ্বারকা নাথ গাঙ্গুলী ১৮৩, ১৮৪
'দি ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইন্ডি-পেন্ডেন্স' ১৪৯
'দি ইংলিশ ইউটিলিটারিয়ান্স' ১৯১
'দিগদর্শন' ২৩৮
দিনাজপুর ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৩২, ৩৬, ৩৯, ৪৪, ৯৮, ১৭২, ২৮৩, ২৪৪
দিল্লী ১৪৮
দীননাথ মুন্সী ২৭৩
দীননাথ সেন ১৬৫, ১৮৯, ২৭৩
দীনবন্ধু ১২৩
দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ১৭১
দীনবন্ধু মিত্র ২৪১
দীনবন্ধু মৌলিক ১৬৫
দীনেশ চন্দ্র রায় ২০৫
দীনেশ চন্দ্র সেন ৩০
দুবল হাটী ১১০
দুর্গামোহন দাস ১৬৫, ১৭১, ১৭৮, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৭
দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায় ১৬৩
দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ১৬০, ১৬১, ১৬৩, ১৬৫

'ধর্মরক্ষিণী সভা' ২৭১
ধলেশ্বরী ২৬
ধামরাই ১১২

নওয়াবগঞ্জ ৩৯
নদী, পূর্ববঙ্গের ২০-২৪
নদীয়া ৯৮
নন্দকুমার গুহ ২৫৫
নন্দকুমার সেন ১৭১
নফিস আহমদ ২৬, ৩৯
নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ১৬৩, ১৬৬, ১৬৮, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৯, ২৫৪
নববিধান ১৬২, ১৭৩
নবাব আবদুল গনি ৯৪, ১৫৭
নবাব সলিমুল্লাহ ২০৫, ২০৮
নবীন চন্দ্র সেন ২০, ৩৭
নর্থব্রুক হল ২০৬, ২০৭
নর্মাল স্কুল ১৮৪
নরোত্তম মল্লিক ১৬৪
নড়াইল ২২
নড়াইলের জমিদার ৯৩
নানা সাহেব ১৫৯
নারায়ণগঞ্জ ৩৯, ১০৬, ১০৭
নাসিরুদ্দীন ১৫৭
নিশিকান্ত ১৭৯
'নীল দর্পন' ১২৩, ২৪১
নীল বিদ্রোহ ১৪, ১৫৯
নীহার রঞ্জন রায় ১৯
নেপাল ৯

'নোটস অন ইনফ্যান্ট ম্যারেজ এণ্ড এনফোর্সড উইডোহুড' ১৯৪
নোয়াখালী ৯, ২৯, ৩৬, ১১৬, ১৫৫, ১৭২, ১৭৬, ১৯৮, ১৯৯, ২৪৩, ২৪৪, ২৬২, ২৭৬

পত্তনী ৯৩
পদ্মা ২০, ২৬
'পল্লী বিজ্ঞান' ২৫১
পশ্চিম বঙ্গ ১২, ২৪৯
পাথারিয়া ২৪
পাবনা ২৬, ২৮, ৩৬, ৯৬, ৯৮, ১৭২, ২৪৩, ২৪৪, ২৭১
পাবনার কৃষক বিদ্রোহ ১৪
পার্থ চট্টোপাধ্যায় ২৩৭, ২৪৯, ২৫১
পার্বতীচরণ রায় ২৫৫
পার্বত্য অঞ্চল ও সমতলভূমি, পূর্ববঙ্গের ২৪-২৮, ৩৩-৩৬
পি, পি, হ্যাচিনস ১৯৫
পিরোজপুর ১৭২
পি, সি, যোশী ১৪৯
পুন্ড্রবর্ধন ২১
পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজ ১২৬, ১৬৮, ১৮৫
প্রকাশ চন্দ্র রায় ১৮৮
প্রমথ চৌধুরী ৯৮
প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ৯৭
প্রমথ ভূষণ দেব রায় ৯৭
প্রমদানাথ রায় বাহাদুর ৯৭
প্রসন্ন কুমার রায় ২৭৩
প্রসন্নকুমার সেন ১৬৭
প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার ১৬৬
প্রাইস ২৯

ফটিকছড়ি ২৫
ফরিদপুর ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৩, ৪২, ৪৩, ৯৬, ১৭২, ১৯৮, ২৪৩, ২৪৪, ২৬৭, ২৭০, ২৭১, ২৭৬
ফারায়েজী ৭৭, ৭৯
ফারায়েজী আন্দোলন ৮২
ফিমেল স্কুল ১৫২
ফুলমনি বাঈ ১৯১
ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল ২৩৭
ফ্রান্স ২৪৮
ফ্রেজার ২০২
'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' ১৯৩
ফ্রেন্ড লায়াল ৭৫

বগুড়া ২৬, ৯৮, ১৭২, ২৪৩, ২৪৪, ২৬৪, ২৬৮
বঙ্কিম চন্দ্র ৯৬, ১২২, ২৩৭
বঙ্গচন্দ্র রায় ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ২৫৭, ২৫৩
'বঙ্গদর্শন' ১২২
'বঙ্গবন্ধু' ১৮৮
'বঙ্গবাসী' ১৯৫
বঙ্গভঙ্গ ৬, ৮৩, ১৪৬, ১৪৭
বঙ্গভঙ্গ ২০২-২১৬
বন্য, পূর্ববঙ্গে ২৯
বরকল ২৫
বরদা কান্ত ১৮৬
বরদা চারণ হালদার ১৮৪
বরিশাল ২৬, ৩১, ৩৯, ৪৩, ১৫৬, ১৬৩, ১৬৭, ১৭১,

১৭২, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৮, ১৮০, ১৮৩, ১৮৬, ১৮৭ ১৯৮, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৬৭, ২৭০, ২৭৬
'বরিশাল ধর্মরক্ষিণী সভা' ১৯৮
বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজ ১৭০, ১৮৬
বরেন্দ্র ২৬
বসন্ত কুমার ২৫৬
বাখরগঞ্জ ২৬, ২৮, ২৯, ৩৬, ৯৬
বাগের হাট ২২, ১৭২
'বাঙ্গাল গেজেটি' ২৩৮
'বাঙ্গালা যন্ত্র' ২৪১, ২৪৫, ২৫৫
'বাঙ্গালী' ১৮৮
বাটি-মইন ২৫
বানাজী ৮৭
'বামা বোধিনী' ১৮৫
বামা সুন্দরী ১৮৯
বালগঙ্গাধর তিলক ১৯৩, ১৯৫
'বালারঞ্জিকা' ২৪২
বালিয়া কান্দি ৩৩
'বাল্য বিবাহ নিবারণী সভা' ১৮৭, ১৭২'
বাসি তাং ২৪
বাংলা বাজার ১৫২, ১৬৭
বিক্রমপুর ২৪০
বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭৯, ১৮২, ১৮৩, ১৮৭
'বিজ্ঞাপনী' ১৮৮, ২৪৮, ২৫৫, ২৫৮
বিধমুখী ১৮৬
বিধানচন্দ্র রায় ১৮৮
বিনয় ঘোষ ২৩৭
বিনোদ বিহারী চৌধুরী ৯৭
বিপিন চন্দ্র পাল ১৮৩
বিবি আসান্নিসা ১৫৭
বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০
বিনাই ছড়ি ২৫
বিশ্বম্ভর দাস ১৬৪
'বিষাদ সিন্ধু' ৫১
বিহার ৯
বীরেন্দ্র কুমার রায় ৯৭
বুকানন হ্যামিল্টন ২১, ৭৪
'বেঙ্গল গেজটে অব ক্যালকাটা জেনারেল এডভার্টাইজার' ২৩৭
'বেঙ্গল টাইমস' ১৬, ১৯৮, ১৯৯, ২০১, ২৩৯, ২৪৮, ২৫২
বেন্টিংক, লর্ড ১৯১, ১৯২
বেন্হাম ১৯১
ব্লেয়ার ক্লিঙ্গ ১৪
বেহরামজি মেরওয়ানজি মলিকারি ১৯৪
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ৪৫
বৈকুন্ঠ নাথ ঘোষ ১৭০, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮৫
বৈদ্যনাথ রায় ১৭১
ব্যারাক পুর ১৪৮
ব্রজ সুন্দর ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৭২, ১৭৭, ১৭৯, ১৮৫
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ২৩৭ ২৩৯, ২৪৭, ২৬৬
ব্রডেল ২৫, ৫৭
ব্রহ্মপুত্র ৯, ২৬, ২৮

'ব্রহ্মবন্ধু সভা' ১৮৭
ব্রাহ্ম আন্দোলন ১১, ১২৬, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৯-১৯০
ব্রাহ্ম দোকান ১৮০
ব্রাহ্ম নেটিভ ম্যারেজ ১৯০
'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' ১৬২
ব্রাহ্ম বিদ্যালয় ১৮৪
ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া ৩৭, ৩৯, ১৭২
'ব্রাহ্মিকা সভা' ১৮৫, ২৭২
ব্রেনান্ড ১৫৪, ১৫৫

ভগবানচন্দ্র বসু ১৬৯, ১৭২
ভাগ্যকুলের বার পরিবার ৯৩
ভাঙ্গনীকুল ১৮৯
ভাঙ্গামুরা ২৫
ভারত বর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ ১৬১
'ভারত মিহির' ২৮৪
ভারতীয় কংগ্রেস ১৯৩
ভাষা ৪৯-৫৩
ভুবন মোহন সেন ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭২, ২৭৩
ভুটান ৯
ভূপতি মজুমদার ১৪৯
ভূষনা ৩৩
'ভ্রাতৃসমাজ' ১৬৫
ভৈরব ২২

মকবুল আলী ১৯৮
মঙ্গল পান্ডে ১৪৮
'মদিনার গৌরব' ১২৬
মধুগঞ্জ ২৪
মধুপুর ২৬
মধুসূদন ভট্টাচার্য ২৪৫
মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ১২৭
মনীন্দ্রনাথ নন্দী ৯৭
মনোরঞ্জিকা সভা ২৭০, ২৭১
মনোরমা মজুমদার ১৮৬
মল্লিক ৭৮
'মহাপাপ বাল্য বিবাহ' ২৪২
মহামারী পূর্ববঙ্গে ২৯
'মহাম্মদীয়ান ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন এসোসিয়েশন' ২০৬
মহারাজ ৯৪
মহেন্দ্র নাথ বসু ১৭৯
ময়মনসিং ইনিসটিটিউশন ১৮৪
ময়মনসিং ব্রাহ্মসমাজ ১৬৯,১৮৬
ময়মনসিংহ ২৫, ২৬, ২৮, ৩০, ৩৩, ৩৪, ৩৯, ৯৬, ১৫১, ১৫৫, ১৬৩, ১৭২, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৮, ১৮০, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৮, ১৯৮, ১৯৯, ২০৮, ২৪২, ২৪৮, ২৬২, ২৭০, ২৭৬,
'ময়মনসিংহ সাহিত্য সভা' ২৬৯
মাগুড়া ২২
মাতাঙ্গী ১৮৫
মাথাভাঙ্গা ২২
মাদারী পুর ৩৭
মানকুমারী বসু ১৮৬
মানিকগঞ্জ ৩৯
মারাঙ্গা ২৫
মাস্টার হেদায়েত বক্স ২০৭
'মাসিক দ্বৈভাষিকা' ২৫৫
মাহমুদ গাজী চৌধুরী ১৫৭
মিটফোর্ড হাসপাতাল ১৬৫
'মিত্র প্রকাশ' ২৫৬
মিরাট ১৪৮
মিল ৭৩

মিশেল ৩৬
মিঃ হিচিন্স ১৫৩
মীর মশাররফ হোসেন ১৩, ৫১, ১২২, ১২৪, ১২৬, ১২৭
মীরাট ১৫২
মুক্তাগাছা ৩৪
মুঘল ৯৩
মুন্সী নন্দজী ১১০
মুন্সী বজলুর রহমান ১৯৮
মুন্সী মহিউল্লাহ ১৯৮
মুর্শিদ কুলী খাঁ ৩৪
মুর্শিদাবাদ ৯৮
মুহম্মদপুর ৩০
মেঘনা ২০, ২১, ২৬, ৪৪
মেজর স্মিথ ১৫৩
মেদেনী পুর ২২
'মোস্লেম বিজয়' ১২৬
মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী ১২৭
মৌলবী শামসুল হক ১৯৮
'মৌলুদ শরীফ' ১২৬
ম্যালেসন ১৪৯

যদুনাথ চক্রবর্তী ১৭৯
যমুনা ২১, ২২, ২৬
যশোধর কুমার পাইন ১৫৭
যশোর ২৬, ৩০, ৩৩, ৪২, ৪৪, ৫০, ১৫১, ১৫৬, ১৭২, ১৭৮, ১৭৯, ১৯৮, ২০৬, ২৪০, ২৪২, ২৪৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৭৭
'যশোর হিন্দুধর্ম রক্ষিনী' সভা ১৯৮
যাদবচন্দ্র বসু ১৬৪
যোগাযোগ ব্যবস্থা ৪২-৪৫
যোগেন্দ্র নাথ রায় ৯৭

রঘুনন্দন ২৪
'রঙ্গপুর দিক প্রকাশ' ২৪০, ২৪৫
'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' ২৪০, ২৪১
রজনীনাথ রায় ১৮৬
রনজিৎগুহ ১০৪, ১০৮
রমেশ চন্দ্র মজুমদার ৪২, ১৪৯, ১৫০, ২৫১
রমেশ চন্দ্র মিত্র ১৯৫, ১৯৮
রংপুর ২৬, ২৭, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৯, ৪০, ৯৮, ১৯৮, ২৪১, ২৪৩, ২৪৪, ২৬২
'রংপুর ইউনাইটেড সোসাইটি' ২৬২, ২৬৩
'রংপুর সুনীতি সঞ্চারিনী সভা ১৯৮
রাইস হোমস ১৪৯, ১৭২
রাও সাহেব রতনমনি গুপ্ত ২০৫
রাখাল চন্দ্র রায় ১৭১, ১৮৬
রাজকান্দি ২৪
রাজ কিষেণ রায় ১৫৭
রাজকুমার চক্রবর্তী ২০৫
রাজশাহী ২৬, ২৮, ২৯, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৪২, ৫৪, ৯৮, ১০৭, ১০৯, ১১১, ১১৬, ১৫৬, ১৯৮, ২০৫, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪. ২৬৮. ২৭২
'রাজশাহী সমাচার' ২৫১
রাজা প্রতাপচন্দ্র ১৫৫
রাজিউদ্দিন আহমদ ২০৫

রাণী ভিক্টোরিয়া ১১, ২৮৩, ২৮৪
রাধানাথ চৌধুরী ১০১
রাধা বল্লভ দাস ২০৫
রামকুমার নন্দী ২৮৪
রাম কুমার বসু ১৬৪
রামকুমার বেদপঞ্চানন ১৬৪
রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১৬৯
রামতনু লাহিড়ী ১৭০
'রামধনু' ২৪২
রামপুর বোয়ালিয়া ৩৮
রাম প্রসাদ ১৮১
রাম মোহন রায় ৮০, ১৫৯, ১৬০
১৯২, ১৯৩, ২৩৭, ২৬০
রাসসুন্দরী ৩২
রায়পুরা ১১২
রিজলী ২০২, ২০৩
রূপনারায়ণ ২২
রেজিন্যাল্ড হেবার ৩৭
রেনেল ২১
রেয়াজ আল-দিন আহমদ মাশহাদি ১২৭

লক্ষীকান্ত মুন্সী ২৭৩
লক্ষীমনি ১৮৭
লন্ডন ২৪৮
লর্ড ওয়েলসলি ২৩৭
লর্ড ক্যানিং ১৪৮
ললিত মোহন রায় ১৭০
ললিত মোহন সেন ১৭১
লালবাগ ১৬৭
লাল মাই ২৬
লায়াল ৭৩
লাংলা ২৪
লেডী ক্যানিং ১৫৬
লেফটেন্যান্ট লুইম ১৫৩, ১৫৪
লোক শিল্প ৫৩-৫৭

শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী ২৪৫
শক্তি ১৯৭
শরচন্দ্র রায় ১৭০, ১৮০
শরদিন্দুনাথ রায় ৯৭
শরিয়তুল্লাহ ৭৯
শশীভূষণ চৌধুরী ১৫০
শহর ও গ্রাম পূর্ববঙ্গ ৩৬-৪২
শাখা সমাজ ১৬৯
শাঁখারি বাজার ১৬৪
শিবচন্দ্র নাগ ১৬৬
শিবজয় উজির ১৫৭
শিবনাথ শাস্ত্রী ১৬২, ১৬৩, ১৭২, ১৭৪, ২৩৭
শিশির কুমার ঘোষ ২৫৪, ২৫৬
'শুভকরী ২৭৭
'শুভ সাধিনী' ২৫১, ২৫৭, ২৬৬ ২৭৯
'শুভ সাধিনী সভা' ১৮৭, ২৬৫
শ্যামাকান্ত ২৪৭
শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী ৩৪
শ্রীনাথ চন্দ ১৬৯, ১৭৬, ১৮৪, ১৮৭, ১৮৮, ২৭০
শ্রীনাথ দত্ত ১৭৭
শ্রীপুর ২৬
শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্টভিশন ২৩৮
শ্রী শচন্দ্র দাস ১৬৪
শ্রীহট্ট ১৯৭, ২৭৬,
শ্রী বিন্যাস পূর্ববঙ্গ ৯৩ ১১৮

স্টাটিসক্যাল রিপোর্ট অব বেঙ্গল ১০৯
'সঙ্গত সভা' ১৮৭

সতীশ চন্দ্র ২৩
সতীশ চন্দ্র চৌধুরী ৯৭
সন্তোষ ১৭৮
সপ্তগ্রাম ২২
সফিউদ্দিন জোয়ারদার ১০৭
১০৮, ১১১-১১৩, ১১৬
'সম্ভাবশতক' ২৫৪, ২৫৫
'সমাচার দর্শন' ২৩৮
সমাচার সভারাজেন্দ্র' ২৩৮
সম্রাট বাহাদুর শাহ্ ১৪৮
সমাজ কাঠামো, পূর্ববঙ্গের ৮৮-৯৩
সমাজ গঠন ৮৪-৮৮
সরোজিনী নাইড ১৮৬
সহবাস সম্মতি আইন ১৯০-২০২
সহবাস সম্মতি আন্দোলন ১৪৬
'সংগত সভা' ১৬৬, ২৭২
'সংবাদ প্রভাকর'। ২৩৮
স্বপন আদনান ৪০
স্বর্ণময়ী ১৮৬
সাতগাও ২৪
স্থাপত্য ৪৬-৪৮
সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ১৬২, ১৪৩
সাধু অঘোরনাথ ১৬৬, ১৬৭
সাভার কার ১৪৯
সামাজিক আন্দোলন ১৪৪-৪৮
সামাজিক ইতিহাস ১-৬, ৭১-৮৪
সালাহউদ্দিন আহমদ ৭৯, ৮০, ৮১, ২৫৩
সারদাকান্ত ১৮৬
সিকিম ৯
সিতানাথ তত্ত্বভূষণ ১৮৩
সিতা পাহাড় ২৫
সিভিল ম্যারেজ অ্যাকট ১৬১
সিমসন ২৮
সিরাজগঞ্জ ৩৯
সিরাজুল ইসলাম ৯৫
সিলেট ৯, ২৪, ২৬, ৩৯, ১৫৬, ১৫৭, ১৭২, ১৮৩, ১৯৮, ২৮৪
'সিলেট ইউনিয়ন' ১৬৬
সিলেট জেলা ১৫২
'সুখীপাখী' ২৪২
সুফিয়া আহমেদ ৭৭, ৮৩
সুরমা ২৪
সুরেন্দ্রনাথ সেন ১৪৯
সুলভযন্ত্র ২৫৬
সুশোভন ১৫০
সেটনকার ১৫৬
'স্টেটসম্যান' ১৯৩
সৈয়দ আওলাদ হোসেন ২৭৬
সৈয়দ গোলাম মোস্তাফা ১৯৭
২০৮
সৈয়দপুর ১৭২
'সোম প্রকাশ' ৩৯, ২৩৯, ২৪৫
স্কোবল ১৯৫
স্ত্রাইন ১১১
হরচন্দ্র রায় ১৭০
হরমোহন ১৯১
হরমোহন বসু ১৭০
হরিনাথ মজুমদার ২৪৬-৪৭, ২৪৭ ২৮৫
হরিমাইতি ১৯৪
হরিশচন্দ্র মজুমদার ১৭১
হরিশচন্দ্র মিত্র ২৪৭, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৯
হাজী বখত ১৫৭
হাতিয়া ২৮

হান্টার ৭৩, ৭৪, ৭৮, ১০৯
হাফেজ আবদুল্লাহ ২৭৬
হামজা আলাভী ৮৫, ৮৭
হাসড়া ২৬৫
হিউম ১৯৫
হিউয়েন সাং ২১
হিতকরীর ২৫১
'হিতকরী সভা' ১৮৫
'হিন্দু ধর্মরক্ষিনী সভা' ১৮৩, ২৪৭, ২৭১, ২৭৩
'হিন্দু রঞ্জিকা' ১২৮, ২৫৬, ২৭১, ২৮৫
'হিন্দু হিতৈষিনী' ১০৫, ২৫০ ২৫২, ২৫৬, ২৭১, ২৭৩
'হিষ্ট্রি অফ দি ইন্ডিয়ান মিউ-টিনি' ১৪৯
'হিষ্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' ১৯২
হৃদয়নাথ মজুমদার ১৫৪
হেইলবেরি ১৯১
হেনরী বেভারেজ ৭৩
হেরম্বনাথ চৌধুরী ৯৭
হ্যামিলটন ৭৪
ষ্ট্যাটিসক্যাল রিপোর্ট অফ বেঙ্গল ১০৯।